দুই শতকের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক

অমনিবাস

(দুই শতকের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক গল্প)

ভূমিকা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

পরিবেশক :

গ্রন্থনা

৮বি কলেজ রো

কলিকাতা-৯

প্রকাশক : অন্বেষা

৫২/১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৯

মুদ্রাকর :

হরিমোহন জানা, শ্রীকালি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯ এণ্টনি-বাগান লেন, কলিকাতা-৯

সুবোধচন্দ্র ঘোষ, গোবর্ধন প্রেস, ২০৯ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

॥ সূচীপত্র ॥

আধুনিক যুগ লেখক জন্ম (১৮৯৮ - ১৯৩০)

অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশীর
ভূমিকা

নব্য বাংলা সাহিত্যের বয়সের তুলনায় তার সম্পদ বড় কম নয়; নব্য বাংলা সাহিত্য বলতে বুঝি বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ। তার একদিকের সীমানা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যান্ত। কাজেই সবশুদ্ধ মিলিয়ে একশো বছরের সামান্ত কম। এই সময়ের মধ্যে একটা সাহিত্য চারদিকে ডালপালা মেলে ফুল-ফল ফুটিয়ে এমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে তেমন দৃষ্টান্ত অন্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। ইংরাজী সাহিত্যের কথাই ধরা যাক, ড্রাইডেনকে ইংরাজী সাহিত্যের বিদ্যাসাগর বলা যেতে পারে। তার সময় থেকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লিরিক্যাল ব্যালাড প্রকাশ পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের অনেক বেশী। এই সময়ের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। বাংলা সাহিত্যে যে এরকম অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারলো তার দুটি প্রধান কারণ। বাংলা ভাষাটা প্রধানতঃ সংস্কৃতভাষা ভিত্তিমূলক। এটা গেল ভাষার অবস্থা। আর এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের জন্ম, স্বয়ং বিদ্যাসাগর, তারপরে মধুসূদন, তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। এরাই এসময়ে প্রধান ও প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। এটি দ্বিতীয় কারণ, নব্য বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মানের প্রমাণ। কিছুকাল হলো নানা শ্রেণীর সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যের সমৃদ্ধি না হলে গ্রন্থাবলী ও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না। আজকাল যে কোনো বিজ্ঞাপনের

দিকে তাকালে এই দুটি শ্রেণীর গ্রন্থের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে যে গ্রন্থটি আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটিও একটি সংকলন গ্রন্থ। প্রকাশক এর নাম দিয়েছেন 'দুই শতকের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্পের অমনিবাস'। সোজা কথায় ভূতের গল্পের সংকলন।

ভূত সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। আর তার ফলেই অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটেছে ভূতের গল্পের পরিবর্তন। ঠাকুমার ঝুলি জাতীয় [illegible] জাতীয় গ্রন্থে ভূতের যে মূর্তি পাওয়া যায় এখন তা অচল।

সেসব গ্রন্থে ভূত প্রেত, দত্যি দানা অত্যন্ত স্থূল, এখনকার অধিকাংশ গল্পে প্রত্যক্ষত ভূত প্রেত, দত্যি দানা থাকে না। আর যেখানে যা আছে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সে সব চর্ম চক্ষের চেয়ে মর্মচক্ষে দর্শনীয়। এইজন্যই আধুনিককালে ভূতের গল্প লেখা অতিশয় কঠিন হয়ে পড়েছে। বাস্তবিক এগুলিকে ভৌতিক গল্প না বলে অলৌকিক গল্প বললে সমীচীন হয়।

রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে নয়টি রসের উল্লেখ আছে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্ম উদ্‌ঘাটনে তা যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্ম হচ্ছে ঐতিহাসিক রস। এটি নবরসের উপরি একটি রস যার প্রয়োজন প্রাচীনকালে ছিল না। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখবার রেয়াজ ছিল না। কাজেই ছিল না ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা। এখন যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস দেখা দিয়েছে, সেই সঙ্গে দেখা দিতে বাধ্য এই ঐতিহাসিক রচনা। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অনুসরণ করে অনায়াসে বলতে পারি যে শ্রেণীর রচনাকে ভৌতিক গল্প বলে (যদিচ এখন আর ভৌতিক গল্প বলা উচিত নয়) তার জন্য একটি নতুন রসের প্রয়োজন। তাকে বলা যেতে পারে অলৌকিক রস। আর এখনকার ভৌতিক গল্পকে ভৌতিক না বলে অলৌকিক বলা উচিত। এসব শ্রেণীর গল্পে কোথাও বাহ্যত ভূতের দেখা পাওয়া যাবে না। তবে মানুষের মনে ভূত সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে তার প্রতিক্রিয়া এইসব গল্পে লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের এক প্রাচীন বন্ধু ছিলেন, তিনি পরিসংখ্যান বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। যতক্ষণ না কোনো বস্তু বা বিষয়কে পরিসংখ্যানের ছকে ফেলতে

না পারতেন ততক্ষণ তার শান্তি ছিল না। এমনকি ভূতের ওজন, দৈর্ঘ্য তিনি নির্ণয় করেছিলেন। ভূতের গল্পের ওস্তাদ ছিলেন ৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর মতে মানুষ মরে ভূত হয়, ভূত মরে মার্বেল হয়। এ অবশ্য রসিকতা। আর ভূত প্রেত সম্বন্ধে আর একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ। তাঁর মুখে শুনেছি ভূতআর প্রেত এক জাতীয় সত্ত্বা নয়; প্রেত হচ্ছে প্রয়াত মানুষের আত্মা। কিছুকাল নিরালম্ব বায়ুভূত থেকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। আর ভূত হচ্ছে সেই জাতীয় সত্ত্বা যার জন্ম মৃত্যু নেই। তাকে বলা যেতে পারে ভৌতিক জগতের আদিবাসী। যেমন, প্রেত হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাসিন্দা। আমার নিজের ধারণা বর্তমান যুগে ভূতের সংখ্যা কমে গিয়েছে। কেননা, বিদ্যুতের আলো ভূতের প্রধান শত্রু। আগেকার দিনে প্রাচীন কলকাতা শহরে অনেক পুরনো বাড়ীতে ভূতের উৎপাত হতো বলে শোনা যায়। দুটি কারণে প্রধানত উৎপাত প্রায় বন্ধ হয়েছে, একটি হলো সে সব বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো জ্বলেছে, দ্বিতীয়, হঠাৎ কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাসযোগ্য বাড়ীর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় খালি বাড়ীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। ভূত প্রেতেরা খালি বাড়ী পছন্দ করে, মানুষের সঙ্গে বাস করতে তারা চায় না। ভূতের সংখ্যা তত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে আমার এক রসিক বন্ধু বলে ছিল যে, ভূতের সংখ্যা কমেছে ঠিকই, কিন্তু কারণটা যা বলছো তা নয়। প্রয়াত মানুষের আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডি না দেয়া পর্য্যন্ত তারা যত্র তত্র অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো পরোক্ষে মানুষকে ভয় দেখায়। হয়তো ঠিক ভয় দেখানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন, তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড না দান পর্য্যন্ত তার প্রেতজন্ম ঘুচছে না। আগেকার কালে এই প্রেতের সংখ্যা এখনকার থেকে অনেক বেশী ছিল; তার কারণ তখনকার দিনে রেল ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি না থাকায় দুরস্থ আত্মীয় স্বজনের পক্ষে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান সহজ ছিল না। এখনকার কালে রেলগাড়ীর দিনে গয়া আর দুর্গম নয়। ইচ্ছে করলে সামান্য খরচে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করা যেতে পারে। করছেও তাই। কাজেই মুক্তিপ্রাপ্ত প্রেতাত্মা আর মানুষকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দেখা দিতে আসে না। এটা অবশ্য রসিকতা।

মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, ভূত-প্রেত সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন

হওয়ায় ভৌতিক গল্পের স্বাদে পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আগে বলেছি আজকাল-কার ভৌতিক গল্পকে ভৌতিক না বলে অলৌকিক গল্প বলা যেতে পারে। অলৌকিক রসের নানা রূপ। রহস্য রোমাঞ্চ, দুঃস্বপ্ন, night mare, বিভীষিকা বা ভুলোয় পাওয়া, কানাওয়ালায় প্রভৃতি নানা সংস্কার এখন অলৌকিক গল্পের উপাদান। আরো একটি কথা, আমাদের প্রধান লেখকগণ কেউ বড় ভৌতিক গল্প লেখেন না। বঙ্কিমচন্দ্র একটা গল্প লিখতে গিয়ে অসমাপ্ত রেখে দিয়ে ছন। সেটা সম্পূর্ণ হলে তাঁহার পদচিহ্নিত একটা রাস্তা পাওয়া যেত, যাতে পরবর্তী লেখকরা চল বার পথ পেতেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প গুচ্ছের চুরাশিটি গল্পের মধ্যে 'মাষ্টার মশাই' গল্পের ভুমিকা অংশটুকুকে মাত্র ভৌতিক পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। অনেকে 'ক্ষুধিত পাষাণ' কে ভৌতিক বলতে চান; কিন্তু আসলে ওটা অলৌকিক রসের গল্প। নানা কাহিনী কিংবদন্তী জড়িত ঐ প্রাচীন প্রাসাদ তুলোর মাশুল আদায়-কারী সাহেবের মনে তার অগোচরে যে একটি সংস্কার সৃষ্টি করে তুলেছিল, কাহিনী টি তারই লীলা। 'মনিহারা' গল্পটি আদৌ ভৌতিক নয়। পাঠকের মনে এরকম একটা ধারণা জন্মালেও লেখক শেষ কয়েকটি ছত্রে তাকেও ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। 'নিশীথে' গল্পটিও অলৌকিক রস সঞ্জাত। এগুলোকে রহস্য রসের পর্যায়ে ফেলা উচিত। শরৎচন্দ্রের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল, তাতে ইচ্ছে করলে তিনি জমিয়ে ভুতের গল্প লিখতে পারতেন। শ্রীকান্তের প্রথম পর্যায়ে ভুত দেখবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিশীথ রাত্রে শ্মশানে গিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন ভুত বলে কিছু নেই আর একজন সাহিত্যিক যাঁকে প্রধান লেখক বলতে বাধা নেই, সেই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভুত প্রেত নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি রহস্য রোমাঞ্চ বা অলৌকিক রস সৃষ্টি করতে যাননি। ভুত ও মানুষকে নিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে ব্যঙ্গ ছলে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা বলেছেন। এবারে বর্তমান গ্রন্থের গল্পগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদের অলৌকিক রসের (ভৌতিক রস আর বলবোনা) গল্প লিখতে গেলেই কলকাতা থেকেই দূরে চলে যান। সাধারণতঃ বিহারের অন্তর্গত সাঁওতালপরগনা, হাজারীবাগ ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে। এসব স্থানে

বাঙালীরা সাধারণত যায় স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে। ভূতেরাও কি সেই উদ্দেশ্যে যায়?) কিংবা কোনো অনির্দ্দিষ্ট দূরবর্তী যুগের পটভূমিকে অবলম্বন করতে হয়। বনফুলের 'ভূতে প্রেম' গল্পটি একেবারে ত্রেতা যুগে নিয়ে যায়। নায়ক ভুজঙ্গ ধরের পত্নীর নাম ইন্দুমতী এই ইন্দুমতী আবার রামচন্দ্রের পিতামহ মহারাজ অজের পত্নীর নামও বটে। কলকাতা থেকে দূরে সে যুগের স্বামী অকারণে উপস্থিত হয়ে ইন্দুমতীকে তার পত্নী বলে দাবি করে ইন্দুমতীকে গভীর রাত্রে একটা অতি সেকেলে চার ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে চলে যায়। এর মধ্যে ভূত নেই। আছে? আছে অলৌকিক রস। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিশাচর' গল্পটিকে একটি দাম্পত্য কলহের নিদারুণ পরিসমাপ্তি বলা চলে। চক্রধরপুর থেকে অন্ধকার রাত্রে মোটর চালিয়ে ঘাটশিলা আসতে গিয়ে একটি খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলো। মনোজ বসুর 'ছায়াময়ী' গল্পটি এক প্রবাসী সাবরেজিষ্টারের নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী। ঘটনাস্থল কলকাতা থেকে অনেক দূরে এক পুরনো নীলকুঠিতে। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন প্রতিবেশীর যে মেয়েটি তাকে সেবা শুশ্রূষা করেছিল, তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। বিবাহের প্রস্তাব করতে গিয়ে মেয়েটি জানায় যে, তার বয়স প্রায় দেড়শো বছর। কীভাবে যে লাবণ্যময়ী মূর্তি ধারণ করলো, (তার নামও লাবণ্য) সে রহস্য লেখক ভেদ করার চেষ্টা করেননি। এ রহস্যটুকুই গল্পের প্রাণ।

বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্র লিখিত গার্ষ্টিন প্লেসের সাহেব ভূত। কলকাতা বেতারের প্রথম আড্ডা গার্ষ্টিন প্লেসের প্রাচীন এই বাড়ীটি। এ বাড়িতে যে ভূত আছে তা অনেকেই শুনেছে। যখন লালদীঘি অঞ্চলে ঘন ঘন জাপানী বোমা পড়ছিল অতি প্রকাণ্ড এই বাড়ীতে কোন দিন বোমা পড়েনি। সবাই বলতো কোনো একজন মহাপুরুষ এই বাড়ীর রক্ষক। বীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই বাড়ীর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ট পরিচয়। সেই মহাপুরুষ যে একজন সাহেব, এই গল্পে তা বিবৃত হয়েছে। মৃতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটনাটি একটি সত্যকার অভিজ্ঞতা। দিল্লীর এক হোটেলে তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে তাঁর ছোড়দার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সুমথ ঘোষের 'বিয়ে' গল্পটি এক ব্যক্তির পূর্ব নির্ধারিত স্ত্রীর তার ছোট ভায়ের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়।

সব ঘটনা জানবার পরে নতুন বৌটি' বৈধব্য জীবন যাপন করতে মনস্থ করে। গজেন্দ্রমিত্র রচিত 'শাঁখের আংটি'র সহিত একটি রহস্য ঘনীভূত আংটিটি কখনো আঙুল থেকে খসতে চায় না। কিন্তু যখন খসে, তখন কোনা না কোনো দুর্ঘটনার সূচনা করে। এর মধ্যে লৌকিকত্বের ভুত নেই; কিন্তু ভৌতিক আবহাওয়া আছে।

সূর্য্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে যেমন বিভিন্ন রং দেখা যায়, আলৌকিক রসকে বিশ্লেষণ করলে সেইরকম উপাদান বা সংস্কার আছে দেখা যায়। রহস্য রোমাঞ্চ গা-ছম-ছম ভাব বিভীষিকা প্রভৃতি সমস্তই কখনো স্পষ্টভাবে কখনো অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'বিকেল সাড়ে চারটার' পটভুমি একটি উৎকৃষ্ট গল্প। এর উৎকর্ষের মুলে আছে রহস্যময় ভাব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আদর্শগত কারণে ডিভোর্স যখন আসন্ন, স্বামী মহাদেব সাঁওতাল পর গনার বাড়ীতে বিশ্রাম করতে যায়, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পায় তার মৃতা স্ত্রী প্রতিভা স্বামীকে দিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কতগুলি স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়। সে বিকেল সাড়ে চারটের কথা। সন্ধ্যা নাগাদ সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে, তখনো সে জানতো না ডিভোর্সের পরে যে মেয়েকে সে বিবাহ করবে বলে স্থির করেছিল, কলকাতাতে ঠিক একই সময়ে তার মৃত্যু ঘটেছে। প্রতিভা, মনিমালা ও মহাদেব এই তিনজনের মৃত্যুকে জড়িয়ে একটা জটিল রহস্য পাঠকের মনকে খোঁচা দিতে থাকে। 'মতিবিবির দরগা' ও 'অশান্ত কবরের বিভীষিকা' গল্প দুটিকে বিভীষিকা পর্যায়ে ফেলা উচিত। 'মানুষ মারার ট্যাক' ও মাউন্ট আবুর পথ প্রদর্শক' এ দুটি বিভীষিকা পর্যায়ের গল্প। হরিতকী গল্পটির কিন্তু মুন্সীয়ানা আছে। হরিতকী'র ক্রিয়া সম্বন্ধে বাস্তিক রচনাটিকে অলৌকিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

অয়স্কান্তের অন্তিম ইতিহাস এবং ছোবল' গল্প দুটি খুব সম্ভব এই সংকলনের দুটি শ্রেষ্ঠ গল্প। অয়স্কান্তের অন্তিম ইতিহাসের রহস্য কেন্দ্র এক টুকরো কালো সুতো। এই কালো সুতোর টুকরো। নানারকম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে অয়স্কান্তের জীবনে। এবং শেষ পর্য্যন্ত এ সুতোর টুকরোই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

'ছোবল' গল্পটির লেখক অদ্রীশ বর্ধন। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প লিখে ইতিমধ্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। এই গল্পটি একটি প্রেতচক্র। ইংরেজীতে যাকে সেয়াজ

বলে। প্রেতচক্র অবলম্বন করে গল্পটি সংগঠিত হয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত দারুণ পরিণামের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এই দুটি গল্প পাঠকদের অবশ্য পঠনীয়। দুটোতেই আছে রোমাঞ্চ ভরা রহস্য যা অলৌকিকের প্রধান উপাদান। আর দুটিতেই আছে নাটকীয় পরিস্থিতি যা নাকি গল্পে অপরিহার্য্য। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে সেই রহস্য রোমাঞ্চ ও নাটকীয় পরিস্থিতির রং ফিকে করতে চাইনে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে তুষারকান্তি পাণ্ডে বাঙ্গালী পাঠকের রসের রসদ জুগিয়েছেন বলে তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

অলৌকিক গল্পের পটভূমিকায়

বিজ্ঞানের আলোর ঔজ্জ্বল্য যত তীব্র হচ্ছে আধুনিক মন হতে ভূতের ভয়ও ততই হ্রাস পাচ্ছে। কমে আসছে। ভয়, ভগবান ও ভূত এই তিনটি শব্দ যেন অনাদি অনন্তকাল হতে আমাদের মনের গহনে বিচরণ করছে। আর এই ভয়কে কেন্দ্র করেই ভূত ও ভগবানের সাথে আমাদের চিরায়ত অবস্থান। তবে যে ভয় মানুষের যুগ যুগান্তরের সংস্কার আর বিশ্বাসের সাথে অস্থি মজ্জাগত হয়ে আছে তা আজকের বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানিতে অপস্রিয়মান ছায়ার মত কিছুটা দূরগামী হয়ত একঅর্থে অস্তাচলগামীও। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অনেক। তবে বঞ্চিত করেছে হয়ত তার থেকেও অনেক বেশী। বিজ্ঞানের অগ্রগতির গতির সাথে তাল রাখতে মনের বেগের আবেগ যেন ক্রমে হোঁচট খাচ্ছে। তবে বিংশশতাব্দীতে মানব মনে ভূতের ভয় যতই হ্রাস পাচ্ছে ভূতের গল্প শোনার প্রবনতা ঠিক সেই পরিমাণেই বৃদ্ধিপাচ্ছে—বেড়ে চলেছে।

লোক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারের ফলে আমাদের চোখের সামনে হতে ভূত প্রেত, দৈত্য, দানো, ক্রমে ক্রমে অপস্রিয়মান। আস্তে আস্তে সব সরে যাচ্ছে। তবে একটি কথা ঠিক যে মনের গহনে এসম্বন্ধে যুগ যুগান্তর ধরে যে জট জমে আছে তা ভূতের ভয়কে অন্তর্হিত করলেও ভূতের গল্প শোনার প্রবনতাকে প্রবলতর করেছে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তৎকালীন সাহিত্যের পাতায় পাতায় যা সবচেয়ে বেশী ছড়িয়ে আছে তা অলৌকিক তথা ভৌতিক দৃশ্যপট। শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট হতে ডিকেন্সের ক্রিশ্চিয়ান ক্যারল। সব লেখাতেই ভৌতিক ও অলৌকিক দৃশ্যপট এক অনাস্বাদিতপূর্ব আকর্ষণ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হতে বিংশশতকের আজকের দিন পর্যন্ত মার্কিন তথা ইংরাজী সাহিত্যের ছোট গল্পের ফল্গু ধারাটিতে ভূতের গল্প নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ যোগ্য স্থান অধিকার করেছে। তাই রুডিয়ার্ড কিপলিং হতে স্টিভেনসন, আর এডগার অ্যালেনপো হতে কোনান ডয়েল প্রমুখ কেউই ভূতের গল্পে কম অনুরাগী ছিলেন না। তবে মার্কিন সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা পুরুষ এডগার অ্যালেনপো অলৌকিক গল্প ও রহস্য গল্পকেই তার গল্পের অন্যতম মূল উপজীব্য করে তোলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপ হতে নবাগত অভিযাত্রী দলের পশ্চিমাভিমুখী যাত্রায় (Westward Expansion) দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, দুস্তর মরুভূমি ও দুরধিগম্য বিপদসঙ্কুল অজানা অচেনা নিঃসীম নিসর্গ প্রকৃতি এক হিমালয় প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর এই বাধা অতিক্রম করতে এই সমস্ত স্বর্ণসন্ধানী ভাগ্যান্বেষী শ্বেতাঙ্গকুল নানা অলৌকিক ব্যাখ্যাতীত ঘটনার সম্মুখীন ও শিকার হন। ফলে তাঁদের বিশ্বাস আর বেদনাভরা নানা অলৌকিক গল্প কাহিনীর কথামালায় সেদিনের মার্কিন সাহিত্য ভরে উঠে।

ফলে গত শতকের প্রথমার্দ্ধে এডগার অ্যালেনপো ভৌতিক ও রহস্য গল্পকে নানা বিচিত্রতায় প্রস্ফুটিত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নতুন মহাদেশ আমেরিকায় যে নতুন সমাজ, নতুন জনজীবন গড়ে উঠল তাতে সেই অজানা দেশের বিপুল বিস্তৃতি ও জন বিরল জনজীবনকে ঘিরে এক বিরাট অলৌকিক সাহিত্য গড়ে উঠে। আর এডগার অ্যালেনপোর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ভৌতিক গল্পের পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার ফলে মার্কিন সাহিত্যে ভৌতিক সাহিত্যের এক জোয়ার বয়ে গেল। অজানা অচেনা মার্কিন নিসর্গ প্রকৃতির (Ranch) ক্রোড়ে বিহারী মানুষ,

মানুষকে ভয় করল যত নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে ভয় করল তার থেকেও অনেক বেশী। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে অতিপ্রাকৃত গল্প কথায় ভরে উঠল সাহিত্যের অঙ্গন।

পরবর্তীকালে এডগার অ্যালেনপোর অনুসরণে মার্কিন সাহিত্যে রহস্য রোমাঞ্চ ও অলৌকিক কাহিনী এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে এডগার অ্যালেনপো অলৌকিক ও রহস্য সাহিত্যের যে উজ্জ্বল ধারা সৃষ্টি করে গেলেন তা তাঁর স্বল্পায়ু চার দশকের জীবনে এক অসামান্য কীর্ত্তি। তবে আমাদের ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রোগজর্জর দারিদ্র্য তাড়িত এক সহায় সম্বলহীন মার্কিন সাহিত্যিক তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে ছোট গল্পের যে ধারা সৃষ্টি করলেন সম-সাময়িক কালে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যেও ঠিক সমমর্যাদায় কোন ছোট গল্প বিশেষ করে অলৌকিক কাহিনী রচিত হয়নি। গত শতকের শেষের দশকে অর্থাৎ অ্যালেনপোর মৃত্যুর কয়েক দশক পর রুডিয়ার্ড কিপলিং, কোনানডয়েল ও আগাথা ক্রিষ্টিপ্রমুখ লিখিয়েদের লেখায় অলৌকিক কাহিনী এক অনাস্বাদিত পূর্ব সাহিত্যিক উপাদান ও ভোজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

তবে আমাদের সাহিত্যে বিদ্যাসাগর (অকুতোভয়তা) ও বঙ্কিমচন্দ্র (নিশীথরাক্ষসীর কাহিনী) জীবন সায়াহ্নে যে ভৌতিক গল্প লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন তা সম্ভবতঃ সমসাময়িক কালে অ্যালেনপোর সম্বন্ধে তাঁদের পরিচিতির ফলশ্রুতি।

বিদ্যাসাগর ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন একথা লিখে জানাবার প্রয়োজন নাই। আর বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজী সাহিত্য ছাড়াও কনটিনেন্টাল সাহিত্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই এঁদের নিকট পোর লেখা নিশ্চয় পরিচিত ছিল। এ ছাড়া প্যারীচাঁদ মিত্রও ভৌতিক সাহিত্যে পদচারণ করেন।

এডগার অ্যালেনপোর জন্ম ও মৃত্যু কালের সাথে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মমৃত্যু ও কর্ম জীবনের সমকালীন অবস্থিতি আমাদের ভাবিত করে।*

---

* এডগার অ্যালেনপো জন্ম ১৮০৯	বিদ্যাসাগর জন্ম ১৮২০
প্যারীচাঁদ মিত্র জন্ম ১৮১৪	বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম ১৮৩৮

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত ভৌতিক কাহিনীটি জীবন সায়াহ্নে মেদিনীপুরে নেগুয়াতে থাকা কালের অভিজ্ঞতায় লিখেছিলেন।

এছাড়া বঙ্কিম পরিবর্ত্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় কল্পনা শক্তির দুরন্ত আবেগ থাকা সত্বেও ভৌতিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এক চমকপ্রদ ঘটনা। পরশুরাম, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীও এ বিষয়ে তাঁদের স্বকীয়তার সাক্ষর রেখে গেছেন। এছাড়া এডগার অ্যালেনপোর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এদেশে ক্ষীরোদচন্দ্র তর্কালঙ্কার অলৌকিক রহস্য পত্রিকা পরিচালনা করে ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে ছোটগল্পে ভৌতিক অবস্থিতির সূচনা হয় কিপলিং এর লেখায়। কিপলিং সাহেব দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে ও আফ্রিকায় বসবাস করেন। তাই তাঁরলেখায় ঔপনিবেশিক ভারতের মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্ত্তে ঘেরা জীবনের সংস্পর্শে শ্বেতাঙ্গ সমাজেও ভৌতিক অস্তিত্বের আবির্ভাব এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। লেখকের অশরীরী নামক গল্পটি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত এক সার্থক ইংরাজী ভৌতিক গল্প।

এছাড়া লেখক আফ্রিকায় নানা যুদ্ধে সেনানী হিসেবে ব্যাপৃত থেকেছেন। বুয়র যুদ্ধেও অন্যতম সেনানী ছিলেন Lord Kipling, আর এই যুদ্ধে নিহত শত সহস্র তাজা ইংরাজ তরুণের মধ্যে ছিলেন তাঁর নিজ পুত্রও। তাই তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বিধৃত যুদ্ধ কাহিনীগুলিও নানা অলৌকিক ঘটনার প্রবাহে ভরপুর। বুয়র যুদ্ধের অবসানে কিপলিং সাহেব আফ্রিকায় Commissioner of war Graves (যুদ্ধে নিখোঁজ ও মৃত মানুষের কবরের পরিদর্শক) মনোনীত হন। তাই তাঁর এই কাজের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান হিসাবে বহু ভৌতিক গল্পও লিপিবদ্ধ হয়। বুয়র যুদ্ধে আফ্রিকায় জাঙ্গলাকীর্ণ বনভূমিতে হাজার মৃত মানুষের হাহাকার ইংলণ্ডস্থিত পুত্রহারা মাতা, স্বামী হারা স্ত্রী, প্রেমিকহারা প্রেয়সীর মনে এক বিষাদ ক্লিষ্ট বেদনা সৃষ্টি করে ফলে বিষদাক্রান্ত ইংলণ্ডীয় জনজীবনে পরজন্ম চর্চ্চা ও ভৌতিক প্রজন্মের এক মহাপুনরুত্থান দেখা দেয়। ফলে তৎকালীন ইংলণ্ডে মিডিয়াম, তন্ত্রসাধনা ও নানা ভৌতিক ও অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তথা প্লানচেট ইত্যাদির এক ব্যাপক ও বিস্তৃত জনপ্রিয় ব্যবসার প্রসার লাভ ঘটে। ফলে সমকালে কিপলিং এর লেখা ছাড়াও আরও বহু কথা সাহিত্যিকের লেখায় এর প্রতিফলন অনিবার্য ভাবে দেখা দেয়।

তবে ওয়ালটার ডিলা মেয়ারের লেখায় বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও গল্পে যে ফ্যান্টাসী, যাদুও অনির্দেশ্যতন্ময়তা (Love for unknown) তা ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেও স্থূল অর্থে ভৌতিক নহে। ডিলামেয়ারের লেখায় অতিপ্রাকৃত এক শৈল্পিক কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

যুদ্ধাবসানে যে সমস্ত ভৌতিক কাহিনী লেখা হয় তাতে ওয়ালটার ডিলা মেয়ার অনন্যতার দাবী রাখলেও তাঁর লেখায় স্কট, ডিকেন্স, লেফার্ম ও হেনরী জেমসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলেছি কিপলিং সাহেবের নাম এদেশে খুবই পরিচিত। তাঁর সার্থক ভৌতিক কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত (Swept and Garnished) ১৯১৫ সালে ও 'A' Diversity of Creature, ১৯১৭ সালে রচিত হয়।

পরবর্ত্তী কালে শার্লক হোমসের স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডয়েল সাহেবও ভৌতিক অস্তিত্বের এক উজ্জ্বল প্রবক্তা। কোনান ডয়েলের লেখায় ক্ষুরধার বিচার বিশ্লেষণের প্রাখর্য্য থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে অতিপ্রাকৃত ও আলৌকিক কাহিনী তাঁর কর স্পর্শে সার্থকতায় মণ্ডিতহয়ে ইংলণ্ডীয় ছোট গল্পের অঙ্গনকে সমৃদ্ধকরেছে। এছাড়া ভিক্টোরিয় ইংলণ্ডের রহস্য গল্পের অন্যতম পথিকৃৎ ষ্টিভেনশন, হার্ডি প্রমুখের লেখায় ভৌতিক পরিমণ্ডল এক অনাস্বাদিত পুর্ব রস সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়।

এধারে ভিক্টোরিও সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ ডিকেন্স সাহেবের ক্রিসমাস ক্যারলেও অলৌকিক ঘটনার ঘনঘটা আমাদের ভৌতিক ভীতি মিশ্রিত এক দৈবরসানুভূতির আস্বাদন দান করে।

অপর পক্ষে কনটিনেন্টাল সাহিত্যের জন সিলার, ডুমা, মঁপাসা, বালজাক প্রমুখের লেখায় অলৌকিক কাহিনীর অনুবর্তন দেখা যায়। আলেকজাণ্ডার ডুমার 'Corsican Brothers' এ ব্যাপারে উল্লেখ যোগ্য সৃষ্টি।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ভৌতিক গল্পের সার্থক গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহ এক স্মরণীয় নাম। তবে পূর্বেই বলেছি বিদ্যাসাগর মশাই তার অকুতোভয়তা গল্পে ও বঙ্কিমচন্দ্র নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী লিখে বাঙ্গলা ভৌতিক কাহিনীতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

তবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্পের বৈঠকী মেজাজের সাথে

রূপকথার কল্প কাহিনীর এক আস্বাদ্যরসরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর গল্পের আঙ্গিক দুর্ব্বল ও ত্রুটিপূর্ণ হলেও প্রখর কল্পনা শক্তির দুরন্ত আবেগে রস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

লেখকের লুল্লু, কঙ্কাবতী সার্থক ভৌতিক কাহিনী। আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথে বিপথের মোহিনী গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত এক সুস্মিত শিল্প দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে। ভিক্টোরিয় ওয়ালটার ডিলা মেয়ারের লেখায় যে ভূতহীন ভৌতিক গল্পের সার্থক বিন্যাস আমাদের রবীন্দ্রনাথের নিশিথে ও প্রভাত কুমারের রসময়ীর রসিকতায় অনুরূপ ভৌতিক মনস্কতার সার্থক অনুবর্ত্তন লক্ষনীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মনিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ ছাড়াও মাষ্টার মশাই গল্পে অংশ বিশেষ ভৌতিক অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভায় প্রভাবিত।

তবে আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে ভৌতিক অস্তিত্বের অবির্ভাব হয় বৈদিক যুগ হতে। অথর্ব্ববেদে বেশ কিছু ভূত তাড়ান ছড়া পাওয়া যায়। এছাড়া আমাদের গ্রামে গঞ্জে যে ভূত দেখা যায় তাতে ভূতের পা উল্টো বলে যে বিশ্বাস আছে আসলে তা হয়ত অথর্ব্ববেদের ভৌতিক বর্ণনার হুবহু অনুকরণ। কিংবদন্তী হিসাবে আজও ভূতের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। এছাড়া আমাদের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ভাজ গুহায় উৎকীর্ণ পেত্নীর মূর্ত্তিতেও ভূতের পা উল্টো দৃষ্ট হয়।

এছাড়া আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বেতালপঞ্চবিংশতির গল্প মালায় ভৌতিক অস্তিত্বের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের পর বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর, ভূতের গল্প মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কায়াহীনের কাহিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পরবর্ত্তী কালে পরশুরামের ভূষণ্ডীর মাঠে নিশ্চয় এক সার্থক শিল্প কর্ম যা ভৌতিকতা আশ্রিত হয়েও জীবনের বৃহত্তর রূপরঙ্গের রূপক হিসাবে বিধৃত ওসার্থকতায় মণ্ডিত। বিভূতি ভূষণের অনেক গল্পে অনির্দ্দেশ্য তন্ময়তা ও প্রকৃতি তন্ময়তা একাকার হয়ে এক বিদেহী জগতের দিশারী অতিপ্রাকৃতের সন্ধান পিয়াসী শিল্পসৌকর্য সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। লেখকের তারানাথ তান্ত্রিক ছাড়াও রঙ্গিনী দেবীর খড়্গ; মশলাভূত ইত্যাদি পূর্ণ মাত্রায় অলৌকিক গল্পের লক্ষণাক্রান্ত।

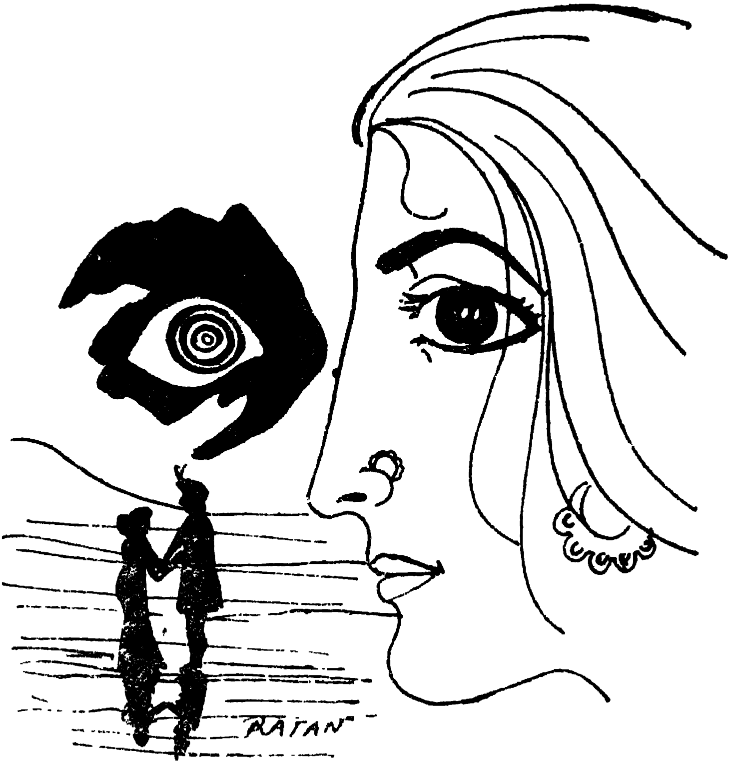
আর রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা গল্পের অন্যতম সার্থক রূপকার শরদিন্দু

বন্দ্যো: তার ভৌতিক কাহিনীতে জীবন মৃত্যুর রহস্যের দোলাচল এক অস্তিত্বের প্রবক্তা। লেখকের কল্প কুয়েলী ইত্যাদি গ্রন্থ সার্থক ভৌতিক গল্পের নিদর্শন।

বাঙলা ভৌতিক গল্পের পটভূমিকায় যে কথা অত্যন্ত পরিতাপের তা হচ্ছে বাঙালা সাহিত্যের অধিকাংশ সার্থক গল্পকারদের এবিষয়ে এক অনির্দেশ্য অনীহা। সাহিত্যের যে ধারা বিশ্বসাহিত্যের এডগার অ্যালানপো, কোনান ডয়েল, ডিকেন্স, বালজাক, ডুমা এমনকি একদা স্কট, সেক্সপিয়র প্রমুখের লেখনী সঞ্চালনে ধন্য হয়েছে। আমাদের সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র হতে রবীন্দ্রনাথ। ত্রৈলোক্যনাথ হতে প্রভাত কুমার প্রমুখ লেখকদের লেখনী, যে অলৌকিক গল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে তা পরশুরাম ও বিভূতি ভূষণের পর আর সার্থক ভাবে অধিক অগ্রসর হয় নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ কিছু সার্থক ভৌতিক কাহিনী রচনা করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর অলৌকিক নামক গল্প গ্রন্থটি একদা কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করলেও আধুনিক বাংলা গল্পে সার্থক ভৌতিক গল্পের একান্তই অভাব আমাদের ব্যথিত করে। আধুনিক কালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু,আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখো:, সুমথ ঘোষ, তারাপ্রণব, সুনীল গঙ্গো:, মুস্তাফা, শীর্ষেন্দু ও অদ্রীশ প্রমুখ লেখকগণের তন্নিষ্ঠ সাধনায় ও মনোযোগে অলৌকিক গল্প ধন্য না হলেও মাঝেসাঝে এঁরা মুখবদলানোর প্রয়োজনে অথবা বৈচিত্রের খোঁজে এক বা একাধিক উপাদেয় ভৌতিক গল্প লিখেছেন। এসবকেই পাথেয় করে আমাদের এই সংকলনের পদ যাত্রার আয়োজন আমার এই নাতিদীর্ঘ ভূমিকার নীরস প্রান্তর পার হয়ে পাঠক পাঠিকাগণ সেই রোমাঞ্চকর অতিপ্রাকৃত জগতের হারান পথে বিচরণের উত্তেজনায় আবিষ্ট হলে আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত লেখকদের ও গল্পের সত্ত্বাধিকারীদের সংকলন প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয় যে মূল্যবান পরামর্শ ও পথনির্দেশ দান করে ও মূল্যবান ভূমিকা লিখে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তা স্মরণ করি।



ভূতের প্রেম

—বনফুল

'এই দেখ ইন্দুর ডায়েরী। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি পড়ে দেখ দিকি, কিছু মানে বার করতে পার কিনা।'

বলিষ্ঠকায় ভুজঙ্গধর মরক্কো-চামড় দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিল।

'উনত্রিশ তারিখে যেটা লিখেছে সেইটে পড়। আরও পাতা উলটে যাও—হাঁ, ওইমাস থেকে পড়।'

পড়িতে লাগিলাম। ভুজঙ্গধর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভুজঙ্গধর আমার বাল্যবন্ধু এবং ইন্দুমতীর স্বামী।

ইন্দুমতী লিখিয়াছেন, 'কাল রাত্রে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে তা এতই অসম্ভব যে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কাউকে বলিওনি, এমন কি মাণিককেও না। মাণিককে বলতে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে পাছে সে আমাকে ভীতু বলে ঠাট্টা করে। তার চক্ষে নিজেকে ভীতু প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে নেই। সত্যি সত্যি ভীতু আমি নইও। ভীতু হলে জনমানব বর্জ্জিত এই পোড়ো বাড়িতে এসে থাকতেই রাজি হতাম নাকি? ঘটনাটা তবু লিখে রাখছি। লিখে রাখবার মতো ঘটনা ক'টাই বা ঘটে জীবনে! ভবিষ্যতে, কোনও পাঠক বা পাঠিকা হয়তো এটা পড়ে পাগল ভাববেন আমাকে; কিংবা হয়তো কোনও উৎসাহী মনস্তাত্ত্বিক এর থেকে কোনও তথ্য উদ্ধার করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবেন আমার স্বামীকে। সত্যই অদ্ভুত ঘটনাটা।'

কাল রাত দশটার সময় মাণিক হঠাৎ বলল—'ওহে, একটা বড় ভুল হয়েছে, পেট্রোলটা কেনা হয়নি। চল কিনে আনি গিয়ে। দশ মাইল যেতে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে।

আমার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, কোমর ব্যথা করছিল সন্ধ্যে থেকেই। তাছাড়া আগাথা ক্রিষ্টির একখানা বই এমন পেয়ে বসেছিল আমাকে যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

বললাম, 'আমি আর যাব না, থাক না কাল কিনলেই হবে।'

মাণিক বললে, 'ওটা হল স্ত্রীবুদ্ধি। আমরা যেরকম অবস্থায় আছি তাতে মোটরে সদাসর্বদা পুরো পেট্রোল থাকা চাই।'

'তাহলে তুমিই গিয়ে নিয়ে এস।'

'তুমি থাকতে পারবে একা? ভয় করবে না তো!'

'আমি যদি ভীতু হতাম তাহলে যা করছি তা করতে পারতাম নাকি!'

মাণিক হঠাৎ ঝুঁকে আমার গালে চপাৎ করে চুমু খেল একটা এমন দুষ্টু, আর অসভ্য হয়েছে আজকাল!

'আমি পেট্রোলটা নিয়ে আসি তাহলে। যাব আর আসব।'

মাণিক চলে গেল। আমরা যে বাড়িটাতে এসে ছিলাম সেটা কোন এক মৈথিল জমিদারের বাগান বাড়ি। যদিও এমন পোড়ো বাড়ির মতো হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন যে এর মহিমা ছিল তা এক নজরেই বোঝা যায়। জমিদারের বংশধর জীমূতবাহন সিংয়ের সঙ্গে মাণিকের বন্ধুত্ব আছে বলেই বাড়িটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাড়ির চাবিটা মাণিককে দিয়ে জীমূতবাহন লণ্ডনে পাড়ি দিয়েছেন সম্প্রতি। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। আমরা দোতলার যে ঘরখানা নিয়ে আছি, তার ঠিক সামনেই গাড়িবারান্দা, গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সুবিস্তৃত বাগানটা। বাড়ির সামনেই বাগান। এখন অবশ্য বাগানের পূর্বশ্রী নেই। ফাঁকা মাঠের মতো খানিকটা জমি পড়ে আছে খালি। বাগানের ওপারে গেট। গেটেরও ভগ্নদশা। কপাট নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম দুটো দাঁড়িয়ে আছে কেবল। সেদিন জ্যোৎস্না উঠেছিল খুব। ফিনকি ফুটছিল যেন চতুর্দিকে! ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম মাণিক মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কতক্ষণ কেটেছিল, আমার মনে নেই ঠিক। আমি তন্ময় হয়ে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হল ঘোড়ার পায়ের শব্দ, অনেকগুলো ঘোড়া যেন টগবগ করে ছুটে আসছে। মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে, কেন জানি না হঠাৎ মনে হল অনেকদিন ধরে আসছে! শব্দটা প্রথমে ক্ষীণ ছিল, তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খটবট্ খটবট্ খটবট্ খটবট্—ক্রমশই যেন এগিয়ে আসছে। আমি বইটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম কিন্তু পড়ছিলাম না। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। কার বা কিসের, তা জানি না, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল চরাচরও যেন অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। কি হয় তা দেখার জন্য সবাই উৎসুক। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপ ধ্বনি সবাই যেন শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। এগিয়ে আসছিল শব্দটা ··কাছে· আরও কাছে গেট দিয়ে ঢুকল। তারপরই আমি ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলাম! মনে হল ঘোড়াগুলো

বুঝি হুড়মুড় করে আমার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র শব্দটা কিন্তু থেমে গেল। হঠাৎ। হলের দরজাটা খোলা ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা লোক।

'আমি তোমাকে নিতে এসেছি ইন্দুমতী।'

'কে' ?

ঘরের ভিতর ঢুকল এসে। শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা। মাথায় স্বর্ণমুকুট, অঙ্গে কারুকার্য খচিত অঙ্গচ্ছদ, কর্ণে মণিকুণ্ডল, বাহুতে কেয়ুর। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। কুচকুচে কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। আমি তো অবাক।

'কে আপনি— ?'

'অয়ি মানস-সরোবর-বিহারিনী রাজহংসি, তুমি কি সত্যিই চিনতে পারছ না আমাকে!'

আমি নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কোথাও একে দেখেছি কি না। সে বলতে লাগল—'একটু ভেবে দেখ মনে পড়বে। নারদের বীণাচ্যুত মালার আঘাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে তো একদিনের জন্যও ভুলিনি। বারবার এসেছি তোমার কাছে। নানা-রূপে এসেছি। তুমিও তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করনি আমি অয়ি রম্ভোরু, অয়ি অনবদ্যা ভোজনন্দিনি, ভুলে গেছ কি সব ? অর্জুনরূপে এসেছিলাম সুভদ্রার কাছে, পৃথ্বীরাজরূপে এসেছিলাম সংযুক্তার কাছে ···আমাকে তো তুমি প্রতিবারই চিনেছ··· ।'

আমি তখন আত্মস্থ হয়েছি।

বললাম, 'ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। স্পষ্ট করে বলুন আপনি কে ?'

'আমি অজ।'

'অজ ?' সে আবার কে!

'মহারাজ রঘুর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ—'

'কি চান আপনি—'

'তোমাকে চাই। তুমি আমার। স্বয়ংবর সভায় মলরাজের যে ঐশ্বর্য তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত করেছিল তা আমি আহরণ করেছি ইন্দুমতী। অয়ি মত্ত-চকোর-লোচনে, নিতম্ব-গুবি, আমিও তোমার জন্য তাম্বুললতা পরিবৃত, পূগতরুশোচিত, এলালতালিঙ্গিত, চন্দনবৃক্ষ সুরভিত, তমালমালা—আকীর্ণ মনোরম কানন নির্মাণ করে রেখেছি নিষ্কলুষ মানসলোকের উত্তুঙ্গ মলয়-শিখরে। চল সখি সেখানে। আমি রথ এনেছি তোমার জন্যে। চল…'

লোকটা ঘরে ঢুকে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমিও মন্ত্রমগ্ধবৎ তার অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি সত্যিই চতুরশ্ববাহিত বিরাট এক রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচে। ও রকম বলিষ্ঠ ঘোড়া আমি আর দেখিনি এর আগে। যেন মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী!

'আর বিলম্ব কোরো না চল।'

লোকটা আমার হাত ধরতে যাচ্ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম। মাণিকের কথা মনে পড়ল আমার!

'ভয় পেয়ো না, আমি ভদ্রবংশজাত, আমি বলাৎকার করব না।'

যাবে না তুমি আমার সঙ্গে?'

'না—'

'কেন—'

'আমি মাণিককে ভালবাসি।'

'মানিক? সে কে!'

'আমাদের মোটর ড্রাইভার ছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু এখন সে-ই আমার সব—'

'ও। আচ্ছা আমি অপেক্ষা করব। একটা কথা শুধু বলে যাচ্ছি, আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। আবার আসব আমি…'

পরমুহূর্তেই সব অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এই খানেই ডায়েরি সমাপ্ত হইয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ভুজঙ্গধর তখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইন্দুকে তুমি ফিরিয়ে এনেছ?'

'হ্যাঁ, চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে ফিরিয়ে এনেছি—'

'আর মাণিক?'

'তাকে গুলি করে ওই খানকার একটা ইদারায় ফেলে দিয়েছি।'

'কি সর্বনাশ!'

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ভুজঙ্গধর বলিল—'ইন্দুকে সত্যিই আমি ভালবাসি ভাই। ওর জন্য ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই।'

'এত রাত্রে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন বল তো?'

'পরামর্শ করতে। ইন্দুকে কি লুম্বিনী পার্কে পাঠাব?'

'ডায়েরিটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে।'

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল ভুজঙ্গধরের চাকর ঘনাই। বোঝা গেল ঘনাই উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়াছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, 'বাবু মাঠান আবার বেরিয়ে গেলেন—'

'সে কি রে।'

হ্যাঁ বাবু। প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, কি বড় বড় ধবধবে সাদা ঘোড়াগুলো। গাড়ির ভিতর থেকে চোগোপ্পা একটা লোক মুখ বার করে বললে—ইন্দুমতী, এস। মা ঠাকরুণ ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন, আর টগবগ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে!'

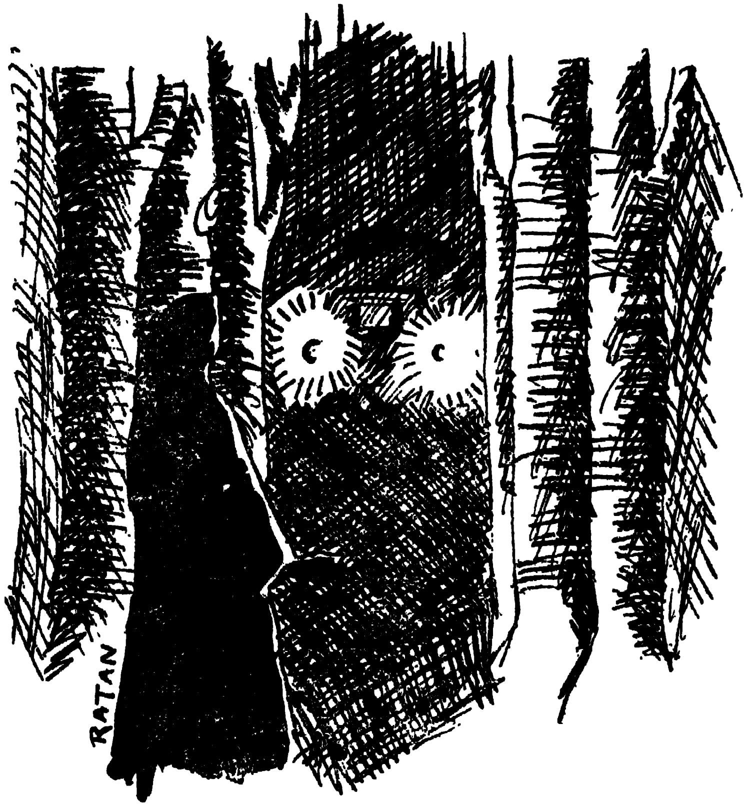
'তাই নাকি!'

আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কোথাও নাই। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ইন্দুমতী আর ফেরে নাই।

॥ **বনফুল** ॥ জন্ম ১৮৯৮ সাল বিহারের মণিহারি গ্রামে। আদি নিবাস হুগলী জেলার শিয়াখালা গ্রামে।

বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) নেশা সাহিত্য কিন্তু পেশা ছিল ডাক্তারী। প্রথিতযশা চিকিৎসক বিজ্ঞানের অনুশীলনের সাথে সাথে সাহিত্যের বাসরকেও সজীব রেখেছেন তাঁর অনমুকরণীয় লেখনী সঞ্চালনে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, ভাষায় প্রাঞ্জলা ও গল্প বুননের অপরিসীম দক্ষতা রবীন্দ্র সমকালে ও রবীন্দ্রোত্তর কালের বাঙলা ছোট গল্পে বনফুলকে এক অনন্যতা দান করেছে। বাঙলা সাহিত্যে প্রকৃত ছোট গল্প তাঁর হাতের যাদুস্পর্শে ছোট পরিধির মধ্যেও সার্থক-রূপে ফুটে উঠেছে। তবে ছোট গল্পের বাহিরেও উপন্যাস, নাটক ও কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের সকল দিকেই তাঁর লেখনী সচল ও সক্রিয় ছিল। বহু খ্যাতনামা কথা শিল্পীর ন্যায় বনফুলও কাব্যচর্চার মাধ্যমেই প্রথম সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনের প্রারম্ভেই মালঞ্চ তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে শনিবারের চিঠিতে তাঁর গল্প, উপন্যাসের সাথে বহু সরস ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

বিন্দুবিসর্গ, তৃণখণ্ড, স্থাবর, জঙ্গম, ইত্যাদি বহু গল্প গ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর লেখা শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের জীবন অবলম্বনে সফল ও উপাদেয় নাটক বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন। তাঁর শেষতম রচনা "লী"। তার স্ত্রীর নাম লীলা মুখোপাধ্যায়। বন্ধুবৎসল, পত্নীপ্রেমিক, ভোজন রসিক ও পরিশীলিত রুচি বনফুলের মহাপ্রস্থান বাঙলা সাহিত্যের এক নিদারুন ও অপূরনীয় ক্ষতি।



নিশাচর

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

দশ বৎসর আগে বাঙলার দুটি স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ একটি দাম্পত্য কলহের যে নিদারুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কথাই বলি।

বাড়িটি তেমন ভালো নয়—অত্যন্ত জীর্ণ, সংস্কার অভাবে তাহার চারিধারের দেওয়াল নানা জায়গাতেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সুদূর নীল পাহাড় আর শালের জঙ্গল যখন চোখে পড়ে, তখন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়।

ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়িটির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া কতদিন অমলা দূরের নীল পাহাড়-শ্রেণীর দিকে চাহিয়া আর চোখ

ফিরাইতে পারে নাই। এমনটি আর সে কখনও দেখে নাই, বাঙলার সমতল আগাছা-আচ্ছন্ন পল্লীর সে মেয়ে। পৃথিবী যে এত বিশাল, এমন সুন্দর—এ ধারণাই তাহার ছিল না। কাজ করিতে করিতে দিনে অতন্তঃ একশতবার সে বারান্দায় খানিকক্ষণের জন্ত দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বামীকে অন্ততঃ একশতবার দিনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই এক কথাই বলে, 'ভারী সুন্দর দেশ, না গা?'

বিভূতি ভূষণের অত উৎসাহ নাই। সে শুধু সংক্ষেপে 'হু' বলিয়া সায় দেয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই, তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়, এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে, কিন্তু মনিবেরা আর গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা একমাসে কিই বা এমন সারিবে। দিন কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর তো এখন ও আসিতেছে। এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিনমাস ছুটি যদি বা মিলে, এখানকার খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসের ও একটা সীমা আছে, চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়িটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পই যে তাহার কাছে খুবই বোঝা।

অমলা ইতিমধ্যে আর একটা কি মন্তব্য করে, সে শুনিতে পায় না।

অমলা একটু গলা চড়াইয়া বলে, 'হাঁ গা', কালা হয়েছ নাকি? অত কি ভাবছ বলো দেখি?

বিভূতি একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'তোমার ও একঘেয়ে এ সুন্দর তা সুন্দর শুনতে আর ভালো লাগে না বাপু। সুন্দর দেখে ত আর পেট ভরবে না।'

অমলা উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাধা পাইয়া লজ্জিত হইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণও হয়। স্বামীর ভাবনা যে কি তাহা সে জানে না,

এমন নয়; কিন্তু স্বামী নিজেই তাহাকে বারবার সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। চেঞ্জে আসার কথায় খরচের কথা ভাবিয়া সে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু স্বামী নানাভাবে বুঝাইয়া তাহার সে আপত্তি দূর করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কথা পাড়িলে স্বামী বলিয়াছে, 'ভাবনা-টাবনা ছেড়ে তুমি শুধু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার চেষ্টা করো দেখি।'

প্রথম প্রথম তাহাদের কি সুখেই কাটিয়াছে! নূতন দেশের সৌন্দর্য ও বিস্ময় মুগ্ধ চোখে শুধু দেখিয়া নয়, পরস্পরকে বলিয়া যেন তারা ফুরাইতে পারে নাই। কিন্তু গত কয়দিন হইতে স্বামীর ভাব যেন কেমন বদলাইতে সুরু করিযাছে, অমলাব মনে হয়, অবশ্য দোষ তাহারই। চেঞ্জে আসিয়া ও তাড়াতাড়ি না সারিয়া ওঠা তাহার অন্যায়! না সারিলে এত টাকা খরচ বৃথাই হইবে।

তবু স্বামীর এ বিরক্তি সে আশা করে তাই। মুখখানি ম্লান করিয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। ভাবে, স্বামীব এ বিরক্তি নিশ্চয়ই ক্ষণিকের; এখনি সে অনুতপ্ত হইয়া হয়ত ক্ষমা চাহিতে আসিবে। না, রাগ করিয়া সে থাকিবে না, কিন্তু একটা মজা কবিবে। শুধু সৌন্দর্য দেখিয়াই একদিন সে সব ভুলিত, পেট ভরাইবার জন্য ব্যস্ত হইত না, তাহাই স্মরণ কবাইয়া দিবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে ও বিভূতির আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অমলা রাগ করিবে না ভাবিযা ছিল বলিয়া বোধ হয় তাহার অভিমান হঠাৎ প্রচণ্ড হইযা ওঠে। অ-কারণে স্বামীব সামনে দিযা দু' চারবার যাতায়াত, করিয়া সে ঘরে আসিয়া হঠাৎ খিল দেয়।

'দরজায খিল দিলে কেন গো! কি হল আবার?'

অমলা সাড়া দেয় না। বিভূতি দু' চারবাব কড়া নাড়ে, খুলিবার জন্য অনুরোধ করে, তাহার পর নিজ হইতেই বিরক্ত হয়। মেয়েদের কোন কাজেব যুক্তি খোঁজার নিষ্ফলতা সে অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করিয়াছে।

খিল খুলিতে পেড়াপীড়ি করিলেই বেশী দেরি হইবে একথা বুঝিয়া সে নীরবে খানিক বাদে নিজের কাজে চলিয়া যায়। কিন্তু ঘন্টা খানেক বাদেও ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহার রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি কিসের জন্য! বিরক্ত হইয়া বলে, 'সন্ধ্যা হয়ে এল' বেড়াতে যেতে হবে না? খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই শরীর সারবে নাকি?

এবার ভিতর হইতে অমলা উত্তর দেয়, 'বেড়াইতে সে যাইবেনা, এ পোড়ার শরীর তাহার চিতায় পুড়িলে একেবারে সারিবে।' বিভূতির রাগ বাড়ে—কড়া নাড়িয়া উচ্চস্বরে বলে, 'ও সব ন্যাকামি রেখে তাড়াতাড়ি সাজ-পোশাক শেষ করে ফেল দিকি? অন্ধকার তা হয়ে গেল, আর বেড়াবার সময় কই?'

অমলা তথাপি দরজা খোলে না, তাহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়, 'আমি হয়েছি তোমার আপদ-বালাই, মরলেই তোমার হাড় জুড়োয়। উঠতে-বসতে দাঁত খিচোবে যদি তাহলে চেঞ্জে আসবার দরকার ছিল কি! কি হবে আমার শরীর সেরে?'

বিভূতির আর সহ্য হয় না। 'বেশ কাঁদো তাহলে ঘরের ভেতর বিনিয়ে বিনিয়ে। আমি একাই যাচ্ছি বেড়াতে।'—বলিয়া রাগে সে বাহির হইয়া যায়।

বেড়াইতে অবশ্য তাহার ভালো লাগে না। বাড়ির অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া মেয়ে জাতটার অবুঝ অভিমানের কথাই সে ভাবে। এত রাগারাগি করিবার মত কি কথা সে বলিয়াছে, আর যদি একটা রূঢ় কথা বাহির হইয়াই গিয়া থাকে, তাহার জন্য কি সন্ধ্যাটা মাটি করিতে হয় এমন করিয়া? আর কটা দিনই বা আছে। এখানে প্রত্যেকটা দিন যে তাহাকে কি মূল্যে কিনিতে হইয়াছে সে ভাল করিয়াই জানে, এই কটি দিনের উপর সে ভরসা করিয়া আছে। অমলার জ্বর সারান চাই-ই তাহার ভিতর। এই মূল্যবান দিনের একটি নষ্ট হইয়া গেল ভাবিয়া দুঃখের আর সীমা থাকে না। কে জানে কতটা উপকার এই দিনটিতেই হইতে পারিত। হয়ত কাল আর জ্বর আসিত না।

অন্ধকার হইতেই সে বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরিয়া আসে। অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। বেড়াইতে না যাক্ উনুন ধরাইয়া রান্না চড়াইতে সে ভোলে নাই। বিভূতির রাগ পড়িয়া তখন ক্ষোভ আসিয়াছে। কাছে গিয়া সে অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বলে, 'মিছি মিছি রাগ করে আজ বেড়ানটা কেন নষ্ট করলে বলো দেখি! তুমি ভারী অবুজ।'

অমলা কিন্তু ফোঁস করিয়া তিক্তকণ্ঠে জবাব দেয়, 'যাও, আর সোহাগ জানাতে হবে না। নিজে বেড়িয়ে এসেছ ত তাহলেই হল।'

বিভূতি আঘাত পাইয়া ও হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলে, 'বাবারে, এখনও রাগ যায়নি তোমার! তোমার ভালোর জন্যেই বলেছি, লক্ষীটি, রাগ করে শরীরের ক্ষতি এমন করতে আছে!'

অমল রাগিয়া বলে, 'আমার ভালো ত তুমি খুব চাও। চেঞ্জে আনতে টাকা খরচ হয়েছে বলে বুক টন্‌টন্ করছে; উঠতে-বসতে মুখনাড়া দিচ্ছ তাই।'

অন্যদিন হইলে ইহার চেয়ে অনেক বেশীই হয়ত বিভূতি সহ্য করিত। হয়ত আর একবার মান ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ আবার রাগ চড়িয়া যায়; উষ্ণস্বরে বলে, 'তোমার জন্যে টাকা খরচ হয়েছে বলে আমার বুক টন্‌টন্ করছে বটে?'

'করছেই ত।'

বিভূতি গলা চড়াইয়া বলে, 'করবে নাই বা কেন। টাকা রোজগার করতে মেহনৎ হয় না? অমনি আসে? চেঞ্জে এসে ঘরে খিল দিয়ে থাকবে ত টাকা খরচ করবার কি দরকার ছিল?'

'আমি তোমায় চেঞ্জে আনতে ত সাধিনি।'

বিভূতি সে কথায় কান না দিয়া ধরা গলায় বলিয়া যায়, 'বিয়ে হওয়া ইস্তক ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে! মরবে ত জানি, তা সোজাসুজি আগে থাকতে মরলে ত আর আমায় এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।'

অমলা সবেগে স্বামীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। 'আমার জন্যে তোমায় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে ?'

অন্ধকারে বিভূতি মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উত্তর দেয় না। স্বামীর দিকে চাহিয়া খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'বেশ, আজই তোমার সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া দিচ্ছি।'

অন্ধকারে অমলা খোলা দরজা দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়। বিভূতি আগাইয়া ধরিতে গিয়াও বোধ হয় কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া বসিয়া পড়ে। অমলা ছেলে বেলা হইতে ভয়কাতর সে জানে। রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলে বেশীক্ষণ সে থাকিতে পারিবেনা। এখনি ফিরিবে।

কিন্তু একটু একটু করিয়া অনেক্ষণ কাটিয়া যায়। তবু অমলা ফেরে না। বিভূতি এবার ভীত হইয়া ওঠে। দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মৃদুস্বরে ডাকে, 'অমলা!' কোন সাড়া-শব্দ নাই। বিভূতি আরো জোরে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে। তবু কোন উত্তর মেলে না। এক অজানিত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে। ঘরে আসিয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে অমলাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া যায়। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। তাহারই মাঝে সুদূর পথে থাকিয়া থাকিয়া বিভূতিভূষণের ব্যাকুল কাতর আহ্বান শোনা যায়—'অমলা!'

ঘাটশীলার স্টেশনে বসিয়া গভীর এক অন্ধকার রাত্রে আমরা বিভূতি ও অমলার দাম্পত্য কলহের এই কাহিনীটি শুনিয়াছিলাম। কেমন করিয়া কি অবস্থায় শুনিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ বড় অদ্ভুত।

ছিলাম চক্রধরপুরে। হঠাৎ রমেশের খেয়াল হইল অন্ধকার রাত্রে মোটরে করিয়া গেলুডিতে গিয়া বিভাসকে চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। আগের দিন সকাল বেলা বিভাসের বাড়ি হইতেই তিনজনে

মোটরে করিয়া চক্রধরপুরে রওনা হইয়াছিলাম। হঠাৎ পুরের দিন গভীর রাত্রে তাহার দরজায় গিয়া ডাক দিলে বিস্মিত হইবার কথা। শুধু বিভাসকে চমকাইয়া দিবার জন্য এই রাত্রে এতখানি পথ যাইবার তেমন স্পৃহা আমার বা বীরেনের কাহারও ছিল না, কিন্তু রমেশের উৎসাহ কমাইয়া রাখা কঠিন, শেষ পর্যন্ত তাহার প্রস্তাবে রাজীই হইতে হইল। গোল বাধিল শুধু শোফারকে লইয়া। স্পষ্ট না বলিলেও ভাবে বোঝা গেল, এই অন্ধকার রাত্রে মোটর হাঁকাইয়া যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি আছে। সে সম্বন্ধে স-বিশেষ প্রশ্ন করিয়া মনে হইল, ভয়টা তাহার পার্থিব কোন প্রাণী বা দ্রব্য বিশেষের জন্য নয়—তাহার ভয় ভৌতিক। এ পথে রাত্রে মোটর চালানো নাকি মোটেই নিরাপদ নয়।

কিন্তু তাহার কোন আপত্তিই রমেশ টিঁকিতে দিল না। সন্ধ্যার খানিক বাদেই রওনা হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার সোজা পথ, গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের প্রখর হেড-লাইট সে পথ ভেদ করিয়া চলিয়াছে—মনে হয় যেন অন্ধকারের ভিতর হইতে আমাদের আলোয় পথ প্রতি মুহূর্তে আমরা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। যে বেগে মোটর চলিতেছিল, তাহাতে পৌঁছিতে অতিরিক্ত দেরী হইবার কথা নয়।

রমেশ পা-টা সামনের সীটের উপর তুলিয়া দিয়া আরামে মাথা হেলান দিয়া বলিল, 'আরাম বলো দেখি! অন্ধকার রাত্রে মোটর চালাবার মত মজা আছে? বিশেষতঃ এমনি পথে?'

বীরেন বলিল, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার বলো দেখি? মনে হয় যেন আমাদের হেড-লাইটাকে সবলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে।' রমেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। হঠাৎ সার্চ-লাইট-টা নিবিয়া গেল; আর সেই মুহূর্তে মনে হইল—আমাদের চারিধারে অন্ধকার যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, আলো নিবিতে না নিবিতে একেবারে সবেগে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

বীরেন বলিল, 'একি?'

সোফার গাড়ি থামাইয়া নামিয়া বলিল, 'কি জানি বুঝতে পারছি না!' তার কণ্ঠস্বরে সম্মানের চেয়ে ভয় ও বিরক্তির পরিচয়ই বেশী পাইলাম।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল, তাহার মাঝে সেই নির্জন পথে অন্ধকারের শুধু দেশলাইয়ের আলোক সম্বল করিয়া অনেকক্ষণ শোফার হেড-লাইট জ্বালিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিল, 'না, এ জ্বলবে না।'

'তা হলে উপায়!'

শোফার বলিল, 'গাড়ির অন্য আলো জ্বলেবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাতে পথ ভালো দেখা যাবে না।'

কিন্তু মোটর বন্ধ হওয়ার সমান বিপদই শেষ পর্যন্ত হইল। কত মাইল কতক্ষণ ধরিয়া তখন আসিয়াছি বলিতে পারি না। হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া মোটর থামাইয়া শোফার বলিল, কিন্তু পথ যে সত্যি চিনতে পারছি না, বাবু! ঠিক পথে এলে এতক্ষণ এক জায়গায় রেল লাইন পার হবার কথা বলে মনে হচ্ছে।'

রমেশ বলিল, 'পার হয়ে আসেনি, দেখছ ঠিক!'

'দেখছি বইকি!'

ইহার পর আর কি করা হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখান হইতে আগানো বা পিছানো সমান বিপদ। এই অন্ধকার রাত্রে গহন জঙ্গলের মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া যদি মাঝ পথে পেট্রোল ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্বনাশ! কি করা উচিত ভাবিতেছি, এমন সময় বীরেন বলিল, 'রোসো রোসো—একটা আলো দেখা যাচ্ছে না? দেখ ত?'

সত্যি আলোই ত বটে অদূরে কে একজন লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে মনে হইল। কাছে আসিতে দেখিলাম, লোকটি আর যাহাই হোক প্রিয়দর্শন নয়। অন্ধকার রাত্রে তাহাকে হঠাৎ পথে দেখিলে আঁতকাইয়া উঠিবার কথা। শীর্ণ দীর্ঘ দেহ,

তাহার ঝাঁকড়া চুল সেই শীর্ণ মুখের উপর ফনার মত উঁচকাইয়া আছে। হাড় বাহির করা মুখে সবচেয়ে অদ্ভুত তাহার কোটর-নিবিষ্ট চোখ দু'টি। হঠাৎ মনে হয় বুঝি উন্মাদ। কিন্তু তখন অত বিচারের সময় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই রাস্তায় কি গেলুডি যাওয়া যায় জান ?'

লোকটার ধরন-ধারণও অদ্ভুত। খানিক সে আমাদের কথায় কোন উত্তরই দিল না। হয়ত শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলিল, 'এই পথই বটে।'

রমেশ বলিল, 'তাই জেলেই চলো, এখান থেকে আর ফেরা যায় না।' তাহাই হইল। মোটরের যে সামান্য আলোয় সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার যতটুকু দূর করা যায় তাহাই করিয়া আবার অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম। আলোর জোর নাই, সুতরাং গাড়ির বেগ একটু কমাইয়াই চলিতে হইল।

বীরেন বলিল, 'পথ চিনে ঠিক যেতে পারবে ত ?'

প্রশ্নটা সকলের মনেই উঠিয়াছিল, শোফার বলিল, 'তা কেমন করে বলি বাবু! একবার মাত্র ত এপথে এসেছি, তাও দিনের বেলায়।'

তাগার গলায় বিরক্তির স্বর এবার স্পষ্ট। কিন্তু তখন তাহা লক্ষ্য করিবার সময় নাই। ভীতভাবে বলিলাম, 'কিন্তু পথ ভুল হলে এই অজানা জায়গায় কি উপায় হবে বলো ত ?

শোফার কথা বলিল না। মনে মনে রমেশের উপর রাগ হইতেছিল। গোঁয়া তুমি করিয়া অন্ধকার রাত্রে অজানা বিপদ সঙ্কুল পথে এমন করিয়া তাহার জেদেই ত বাহির হইতে হইয়াছে।

বীরেন বলিল, 'ধরো, যদি ইঞ্জিনটাই কোন রকমে খারাপ হয়ে যায়।' এবং এই সম্ভাবনা ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই আবার বলিল ; 'এসব বনে বাঘ আছে জান ত ?

রমেশ আশ্বাস দিবার জন্য হাসিয়া বলিল, 'মোটর খারাপ হবে, এমন আজগুবি কথা ভাবছই বা কেন!' কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইল, তাহার নিজের কথায় নিজেরই আস্থার একান্ত অভাব।

তাহার পর খানিক সবাই নীরবে চলিলাম। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার আমাদের ছোট মোটরের শব্দ ও আলোয় আমরা ক্ষীণভাবে ভেদ করিয়া চলিয়াছি, পাশের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলের আবছা মূর্তি যেন এই উপদ্রবে প্রতি পদে ভ্রূকুটি করিতেছে মনে হইতেছিল। মোটরের সামান্য একটু বেয়াড়া শব্দেই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল—এই বুঝি বন্ধ হইয়া যায়!

লোকটার কথার ধরণ দেখিয়া কিন্তু কেমন সন্দেহ হইল; বলিলাম, 'ঠিক জান ত!'

এতক্ষণ সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, আমার কথায় হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'এইখানে বিশ বছর ধরে আছি, আর গেলুডির পথ জানি না!'

থাক্, হয়ত কথা তাহার সত্য। শোফার আবার গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বলিলাম, 'যা হবার হয়ে গেছে, এখন চলো সামনে যতদূর পথ মেলে।'

বহুক্ষণ—প্রায় ঘণ্টা দুই এক হইবে—এইভাবে চলিবার পর এক জায়গায় আসিয়া কিন্তু বিষম বেকিয়া গেলাম। সামনে পথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। শোফার বলিল, 'কোন্‌টায় যাব বুঝতে ত পারছিনা!'

এবার সমস্যা সত্যই দারুণ। দুইটা পথই যে ঠিক নয় এটুকু বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু কোন্ পথে যাওয়া যায়? গাড়ি থামাইয়া আমরা সেই তর্কই করিতেছি, এমন সময় বীরেন বলিল, 'না, বিধাতা আমাদের সহায়?'

এই আরেকটা আলো দেখা যাচ্ছে!

এবারেও একটা লোক আলো লইয়া আসিতেছিল বটে! বলিলাম, 'এই জঙ্গলের মাঝে মানুষ থাকতে পারে ভাবিনি—'

এবারের লোকটা কাছে আসিতে শোফারই তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি তাহাকে বলিল শুনিতে ভালো পাইলাম না। কিন্তু শোফারকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাইয়া দিতে দেখিয়া বুঝিলাম—সে এবার রাস্তা বুঝিয়াছে।

হঠাৎ বীরেন বলিল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, গাড়ি একটু থামাও ত।'

তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিলাম, 'কেন!'

বীরেন কম্পিত গলায় বলিল, 'লোকটাকে লক্ষ্য করেছ তোমরা!' এবং আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, 'প্রথম যে লোকটা আমাদের পথ বলে দেয় একেবারে হুবহু সেই লোক!'

ঠিক অমনি একটা সন্দেহ আমারও হইতেছিল, কিন্তু ভয় ধরা লজ্জায় বলিতে পারি নাই। বীরেনের কথায় সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল—যথাসাধ্য সাহস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'কিন্তু তাকে ত প্রায় বিশ মাইল দূরে ফেলে এসেছি।'

'সেই ত আশ্চর্য ব্যাপার! এই জনমানবহীন জঙ্গলের পথে দু'—দু'বার মানুষের দেখা পাওয়াই অদ্ভুত ব্যাপার। তার ওপর বিশ মাইল পার হয়ে সেই একই লোক!'

শোফার হঠাৎ গীয়ার বদলাইয়া দ্বিগুণ বেগে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বলিলাম, 'ও কি করছ?'

সে তিক্তকণ্ঠে বলিল, কি করব বাবু, আমার প্রাণের ভয় নেই?'

বলিলাম, 'তুমিও দেখেছ নাকি!'

শোফার পিছন না ফিরিয়াই ভীতস্বরে বলিল, 'দেখেই না অত তাড়াতাড়ি গাড়ি ছেড়ে দিলাম!'

পর মুহূর্তে আমরা সকলে এক সঙ্গে হৈ-হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শোফার প্রাণপণে ব্রেক্ কষিয়া গাড়ি রুখিতে গেল। গাড়ি থামিল না, ষ্টীয়ারিং হুইল ঘুরিয়া একেবারে পাক খাইয়া পাশের গড়ানে খাদ দিয়া হড় হড় করিয়া নামিয়া চলিল। সামনের দিকে চাহিয়া সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও দেখিতে পাইলাম গভীর

জল তারার আলোয় সামান্য চিক্‌চিক্‌ করিতেছে। বুঝিলাম, তাহার তলেই আমাদের সমাধি হইতে চলিয়াছে। ভয়ে চোখ বুঝিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইলাম। সামনে বুঝি উঁচু একটা তারের জাল ছিল, তাহাতে গাড়ি আটকাইয়া গেল। এ রকম অবস্থায় গাড়ি উল্টাইয়া যাইবার কথা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা যায় নাই। চোখ খুলিয়া দেখিলাম, প্রবল ঝাঁকানি খাওয়া ও অক্ষত শরীরেই সবাই রক্ষা পাইয়াছি।

প্রথম কথা কহিল বীরেন; আতঙ্কের স্বরে বলিল, 'লোকটার একেবারে কি বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি গেছে, শোফার।'

শোফার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল; খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহির হইয়া বলিল, 'কি জানি বাবু, ব্রেক্‌ কষতে কষতেই গাড়ি ঘুরে গেছে। দেখবার সময় পাইনি।'

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বলিলাম, 'এখনই দেখতে হবে, চলো।'

সবাই মিলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম, কিন্তু আশ্চর্য। তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সামান্য কিছু নয়, একটা জোয়ান মানুষ; সবাই মিলিয়া স্পষ্ট তাহাকে গাড়ির ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাহার দেহ এই এক মিনিটের ভিতর কোথায় উধাও হইয়া যাইতে পারে! যে দিকে খাদ সেদিকেও সে পড়ে নাই। পড়িয়াছে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য দিকে—সেখান হইতে মৃত বা জীবন্ত কাহারও এক মিনিটে অন্তর্ধ্যান হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

বীরেন বলিল, তাহলে কি?—

তাহার কথা আর শেষ করিতে হইল না। একই নামহীন আতঙ্কে সবারই বুক কাঁপিতেছে। বলিলাম, 'ও মোটর আজ আর ওঠান যাবে না। চলো, সবাই মিলে এগিয়ে যাই।'

রমেশ বলিল, 'কিন্তু—কোথায়?'

বলিলাম, 'ওই দূরে কটা লাল আলো দেখা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে যেন স্টেশন একটা হবে।'

বীরেন বলিল, 'কিন্তু—আবার আলো !'

সেদিন অনেক হয়রানির পর অবশেষে স্টেশনে পৌঁছাইয়া ছিলাম। পথ ভুল যে কতখানি হইয়াছে স্টেশনের নাম দেখিয়াই বোঝা গেল, গেলুডি আসিতে একেবারে ঘাটশীলায় আসিয়াছি। গভীর রাত্রে স্টেশনে তখন একা টেলিগ্রাফ মাস্টারই জাগিয়া ছিলেন। লোকটি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের স্বাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিয়া বলিলেন, 'আজকের রাতটা এখানে থাকুন, কাল আপনাদের মোটর তোলবার ব্যবস্থা করিয়ে দেব।'

ঘুমাইবার ব্যবস্থা এক প্রকার তিনি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর ঘুমাইবার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কাহিনীই বলিলাম।

ভদ্রলোক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আপনারা জানেন না তাই, নইলে এ অঞ্চলে সাহেব-সুবোরাও রাত্রে ও-পথে মোটর নিয়ে বেরোয় না। আপনারা তবু প্রাণে বেঁচেছেন। পাঁচ ছটা মোটর লোকজন সমেত এই রাস্তায় আশ্চর্যভাবে চুরমার হয়ে গেছে।'

সভয়ে বলিলাম, 'কিন্তু কি ব্যাপার মশাই ?'

'শুনি মোটরের উপরই তার যত আক্রোশ! সারারাত নাকি অমনি লণ্ঠন নিয়ে এই পথে বেড়ায়।'

ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে ?'

সীগ্‌ন্যালার মশাই ধীরে ধীরে বলেন, 'দশ বৎসর আগে এখানকার একটি লোক রাত্রে তার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, আর বাড়ি ফেরেনি !'

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন,—'ওই পথে সে মোটর চাপা পড়ে মারা যায়। তবে শুনুন······'

প্রেমেন্দ্র মিত্র :—আজ হতে প্রায় অর্ধশতক পূর্বে প্রবাসে সুদূর বারাণসী ধামের গঙ্গা বিধৌত সরস মাটিতে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করেন পরবর্ত্তী কালে তিনি জীবন ও জীবিকার নানা বৃত্ত ও বৃত্তির ঘূর্ণিপাকে নিষ্পেষিত হয়ে ক্রমে কল্লোল কালের পলল সঞ্চিত নরম মৃত্তিকায় পদচারণ করে সাহিত্য সাধনায় নিরত থাকেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি হিসাবে যতখানি খ্যাত গল্পকার হিসাবে তার চেয়ে কম নন। আবার ঔপন্যাসিকের আবরণ ও নাট্যকারের আভরণ তাঁকে পরবর্তী কালে সাহিত্যের জগৎ হতে সাময়িক ভাবে নাটক তথা সিনেমার জগতে অধিক ব্যাপৃত করে। কল্লোলকালের সাহিত্যিকদের পুরোধা হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার প্রিয় লেখক। তবে সে দিনের বস্তাপচা, মরচেধরা সমাজের যুগ সঞ্চিত সংস্কার আর বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে সাহিত্যের মরা গাঙে প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেন। অস্থির দুরন্ত তিরিশের দশকের লেখক হওয়া সত্ত্বেও কল্লোল আশ্রিত প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য করেন শিল্পের রূপোলী কলম হাতে নিয়ে।

তবে পরবর্ত্তীকালে সাধারণ মানুষের ব্যথা বেদনায় জর্জ্জরিত হয়ে বিদ্রোহের রংমশাল তাঁর সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ।

অচ্ছুৎ আর অন্ত্যজদের ব্যথা-বেদনা ভরা তাঁর কবিতা, গল্প আর উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে এক নব-চেতনার জাগরণ সৃষ্টি করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনী সকল সময় বাঙ্গলা রহস্য, গোয়েন্দা ও ভৌতিক সাহিত্যের মরা নদীকেও স্রোতমুখী করে তুলেছে। নিশাচর গল্পটি তার অন্যতম উৎকৃষ্ট একটি ভৌতিক কাহিনী যা পাঠক-পাঠিকাকে শিহরিত করে।



রহস্য

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী

বহুকাল পরে বাসুদেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা ক'লকাতার এক জনবহুল রাস্তায়। কুড়ি বৎসর পরে পরস্পরকে চেনা সহজ নয়। উভয়েরই মাথার চুলে পাক ধরেছে। বাসুবেবের তো মাথায় বেশ বিস্তীর্ণ একটি টাক। তথাপি কিন্তু চিনতে কষ্ট হোল না বিশেষ

কুড়ি বৎসর আগে কলেজ হষ্টেলের একই ঘরে বছর দুই আমাদের কেটেছে। আমি যখন থার্ড ইয়ারে, ও তখন ফার্ষ্ট ইয়ারে। শ্যাম-বর্ণের বেঁটে-খাটো একটি ছেলে। অসাধারণ পেটুক। বাপের কাছ থেকে টাকা আসতো অনেকগুলি। তার অধিকাংশই যেত খাবার-ওয়ালার বাক্সে। কিছু নয় তো, জলই খেয়ে ফেললে বড় ঘটির একটি ঘটি।

জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষ তো ওইটুকু। ওগুলো রাখো কোথায়?

হেসে উত্তর দিত, ব্যবস্থা করলেই রাখা যায় দাদা! সুটকেস দেখেন নি, ব্যবস্থা করলে অনেক জিনিষ রাখা যায়। অব্যবস্থায় কিছু রাখা যায় না।

ওইটুকু জঠর-গহ্বরে সিঙাড়া থেকে লবঙ্গলতিকা এবং রসগোল্লা থেকে সন্দেশ যে-পরিমাণ সে আশ্রয় দিত, তাতে সকলকেই স্বীকার করতেই হোত যে, ব্যবস্থা ছিল।

অনেক কাল পরে ক'লকাতার এক জনবহুল রাস্তায় দেখা হোতেই বাসুদেব ঠিক ছেলেবেলার মতোই জড়িয়ে ধরলে: অমলদা! কী আশ্চর্য!

হেসে বললাম, আশ্চর্য বটে। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। কি বল বাসু?

নয় তো কি। চলুন, চলুন, একটা খাবারের দোকনে গিয়ে বসা যাক। কতকাল পরে দেখা, অনেক গল্প করবার আছে।

খাবারের দোকান! তোমার সেই পুরানো অভ্যাস এখনও যায় নি?

বাসুদেব হো হো ক'রে হেসে বললে, থাকতে কি চায় দাদা, কোনো রকমে রেখেছি,—যেতে দিইনি। ভগবান একটা শক্তি দিয়েছেন, চর্চা না ক'রে সে শক্তি খোয়ানো কি ভাল হোত!

কখনই না। চল কোথায় যাবে।

কাছের একটা দোকানে গিয়ে বাসু বললে, কি খাবেন বলুন।

এক গ্লাস জল। আমি তোমার খাবার দেখবার জন্যে এলাম।

তার পরে যা হয়। বাসু ছাড়লে না। আমাকেও কিছু নিতে হোল। কিন্তু বাসুর জন্যে প্লেটে খাবাব সাজাতে দোকানদারও যে অবাক হোল, বাসু না দেখলেও তা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

তারপর কি করছ বল।

ডাক্তারী। মফঃস্বলের ডাক্তারী যে কি ব্যাপার, আপনার বোধ হয় ধারণা নেই। সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত বাড়িতে বসে রোগী দেখি। তারপরে যেই পায়ের তলার মাটি তেতে আগুন হোল, আকাশ রূপোর পাতের মত ঝকঝক করতে লাগলো অমনি হয় ঘোড়া নয় সাইকেলে বেরুলাম রোগী দেখতে। ফিরতে তিনটে। এত কষ্টের পয়সা দাদা খরচ করতে ইচ্ছা হয় না।

বাসু করুণ, অনুতপ্ত দৃষ্টিতে তার প্লেটের খাবারগুলোর দিকে চাইলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেপুলে কি ?

চামচে করে হাতের রাজভোগের একটা টুকরো মুখে পুরতে যাচ্ছিল, থমকে গেল। বললে, তা অনেকগুলি দাদা। একটি ভালো ছেলে খুঁজে দিন না। বড় মেয়েটির বিয়ে আর না দিলেই নয়।

বাসু রাজভোগটি নিঃশেষ করে বললে, আপনি তো কিছুই খেলেন না দাদা। খাওয়া আপনার বরাবরই কম।

হাঁকলে : দেখি আর একটা রাজভোগ দাও তো হে !

বাসুদেবের একটি ছোট ভাই ছিল, শুকদেব। অত্যন্ত ডাংপিটে ছেলে। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে দাদার হস্টেলে আশ্রয় নিত। আশ্চর্য, তার কথাটাই এতক্ষণ মনে পড়েনি।

তাড়াতাড়ি বললাম, আসল লোকের খবরই নেওয়া হয়নি। তোমার সেই ভাইটির খবর কি ? শুকদেব ?

বাসু যেন চমকে উঠলো। তার মুখের উপর বেদনায় গাঢ় ছায়া নেমে এল।

একটু যেন সামলে নিয়ে বললে, শোনেন নি তার খবর ?

না তো !

সে তো নেই।

মানে ?

সে আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যা ! বলো কি !

বাসু জবাব দিলে না। অনেকক্ষণ পরে বললে, চলুন পার্কে গিয়ে বসি গে। পার্কে অসম্ভব ভিড়।

এক কোণে একটি গাছের তলায় ঘাসের উপর বসা গেল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপরে বাসু বললে, সে এ... ...ায়

ব্যাপার দাদা। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আমার কাছে আজও সমস্ত ঘটনটা একটা রহস্য হয়েই রয়ে গেছে।

আমি উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বাসু বলতে লাগলো, ধীরে ধীরে থেমে থেমে, ভেবে ভেবে :

আমার একটি ঠাকমা ছিলেন। বুড়োমানুষ হলে যা হয়, মেজাজ তাঁর খুবই খিটখিটে ছিল। ভোর থেকে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই খিটিমিটি চলতোই। ঠাকমার যতই বয়স বাড়তে লাগলো, তাঁর সেবায় মায়েরও ততই ত্রুটি ঘটতে লাগলো,—খিটিমিটিও ততই বাড়তে লাগলো।

সে এক দারুণ অশান্তি। বাড়িতে কাক চিল বসবার যো রইলো না।

শুকদেব ছিল ঠাকমার প্রিয়। সে যে ঠাকমার খুব সেবা ও শুশ্রূষা করত তা নয়। কিন্তু যেহেতু মায়ের আমি ছিলাম প্রিয়, আর শুকদেব খেত মায়ের বকুনি, সেই জন্যে ঠাকমার প্রিয় ছিল সে। এই অবস্থায় একদিন ঠাকমা গেলেন।

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল। কিন্তু শুকদেব যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলো। অত আড্ডাবাজ ছেলে, কেমন যেন কুনো হয়ে যেতে লাগলো। বন্ধুবান্ধব এসে ডাকাডাকি করেও তার সাড়া পায় না।

মা বারবার জিগ্যেস করেন, কি হয়েছে তোর? দিন রাত্তির ব'সে বসে কি ভাবিস? শরীর ওরকম হয়ে যাচ্ছে কেন?

তারও জবাব দিতে পারে না

আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। মা আমাকে বললেন। আমিও প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পাই না।

ও তখন কলেজে পড়ে। হষ্টেলে থাকে। একদিন হঠাৎ হষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কয়েকটি ছেলে সঙ্গে দিয়ে ওকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বাবাকে একখানা চিঠিতে জানিয়ে দিলেন, ওকে হষ্টেলে রাখা নিরাপদ নয়।

পয়ঃবাবা তো আকাশ থেকে পড়লেন। শুকদেব দুষ্টু ছেলে সন্দেহ

নেই,—কিন্তু খারাপ ছেলে নয় নিশ্চয়ই। এমন কিছু সে করতে পারে না, যাতে হষ্টেল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কলেজের যে ছেলেগুলি ওকে পৌঁছে দিতে এসেছিল তাদের জিগ্যেস ক'রে বাবা এই পর্যন্ত জানতে পারলেন যে, ওর মাথা ঠিক সুস্থ নয়। রাত্রে টেবিলে পড়ছে, হঠাৎ কী যে হয়ে গেল বিড় বিড় করে আপন মনে বকতে লাগলো, ওকে সামলানো যায় না।

বাবা ডাক্তার মানুষ। তাঁর সন্দেহ হোল মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বলক্ষণ নয় তো।

কিন্তু জানেনই তো, তাঁর প্রচণ্ড প্রাকটিস্। নিজের ছেলেকেও চোখে চোখে রেখে তাকে পর্যবেক্ষণ করবেন, তার সময় নেই। মাঝে মাঝে অবসর পেলে কাছে ডাকেন, গল্প করেন, অনেক সময় কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও করেন। কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনো চিহ্নই দেখতে পান না।

শেষে বিরক্ত ভাবে মাকে বললেন একদিন, কিছুই হয়নি। মাথা বেশ সুস্থ আছে। বোধ হয় পড়াশুনা করার ইচ্ছা নেই, তাই ও রকম করছে।

এ রকম সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। ছেলে পড়াশুনায় খারাপ নয়। কিন্তু পড়াশুনায় আশ্চর্য ঢিলেমি। যেবার ম্যাট্রিক দেয়, পরীক্ষার আগের দিন বেঁকে বসলো, পরীক্ষা দেবে না। পড়া কিছু তৈরি হয়নি, দিলে নির্ঘাৎ ফেল ক'রে যাবে।

বাবা কোন কথা শুনলেন না। জোর ক'রে পরীক্ষা দেওয়ালেন। ফল বেরুলে দেখা গেল, প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। ভারী খেয়ালী ও চিরকাল।

মা রেগে বললেন, তাহ'লে থাক বাড়ীতে ব'সে। প'ড়ে আর কাজ নেই। নিজেই ঠেলা পাবে।

আমার স্ত্রী প্রায় ওর সমবয়সী। দুজনে ভাবও খুব। সে হেসে আমাকে বললে, ভায়ের-বিয়ে দিয়ে দাও, সব সেরে যাবে।

মনে হোল, তাও অসম্ভব নয়। হয়তো বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অন্য কাউকে তো বলতে পারছে না, বলেছে হয়তো ওর বৌদিদিকে।

জিগ্যেস করলাম, সেকথা বলেছে নাকি তোমাকে ?

—না, বলেনি অবশ্য কিছুই। কিন্তু আমার তাই সন্দেহ হয়। বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে খুশী হয়ে ওঠে।

বললাম, মাকে বলো।

আমার স্ত্রী মাকে বললেন, মা বাবাকে। কিন্তু বাবার অখণ্ড বিশ্বাস ওর কিছুই হয়নি। আসলে ও আর পড়াশুনো করতে চায় না। তিনি রেগে বললেন, তোমাদের যা খুসি কর। ওর কথা আমার কাছে কিছু বোলোনা।

সুতরাং বিয়ের প্রস্তাব চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু মা এবং আমার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মধ্যে একটা কিছু হচ্ছে,—যেটা ও কিছুতে বলছে না। স্নান-আহার, গল্প-গুজব সাধারণভাবে ঠিকই আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একদিন, খুব কচিৎ অবশ্য, খেতে-খেতে কিংবা গল্প করতে করতে হঠাৎ কেমন অন্য-মনস্ক হয়ে পড়লো, কেমন স্থির দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে রইল, ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত,—দেখতে ভয় করে।

মায়ের আশঙ্কা হোল, ভৌতিক কিছু নয় তো ?

বাবা এবং আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। বাবা বললেন, এ পাগলটার সংশ্রব ছাড়ো, নইলে তোমরাই শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে।

এমনি ক'রেই চলে।

একদিন সন্ধ্যার সময় শুকদেব তার শোবার ঘরে খাটের উপর ব'সে আছে। তার শরীরটা সেদিন খুবই খারাপ। অন্য কিছু নয়, বলছে, বুকের ভিতরটা কেমন ভারি বোধ হচ্ছে এবং চোখ দুটো অসম্ভব জ্বালা করছে।

মা নিচে রান্নাঘরে। ঠাকুরকে রাত্রের রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমি শুকনের ঘরে গিয়ে একটু বোসোগে বৌমা। ওর শরীরটা ভালো নেই বলছে। একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

আমার স্ত্রী চৌকাটের কাছে ব'সে শুকদেবের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। আজে-বাজে গল্প :

—তুমি নাকি বাপের বাড়ি যাচ্ছ বৌদি।

—হ্যাঁ।

—কেন? এই তো এলে সেদিন?

—তা তো এলাম। কিন্তু থেকেই বা কি করব বল? সামনে চোত মাস পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে তো আর তোমার বিয়ে হচ্ছে না, সে আশা থাকলে থাকতাম।

ও! আমার বিয়ের জন্যই বুঝি তোমার এখানে থাকা?

তা ছাড়া আর কি!

মা বোধ হয় একবার এসেছিলেন। কিন্তু সিড়ি থেকেই ওদের হাস্য-পরিহাস শুনে আবার নিচে নেমে যান।

হঠাৎ শুকদেব বললে, একটা দেশলাই বাক্স এনে দেবে বৌদি। সিগারেট খাব।

আমার স্ত্রী নিচে থেকে একটা দেশলাই বাক্স এনে দিলে।

সিগারেটটা ঠোঁঠে চেপে একটা কাঠি জেলেই শুকদেব যেন কী রকম হয়ে গেল। তার ঠোঁটদুটো এমন জোরে-জোরে কাঁপতে লাগলো যে, সিগারেটটা পড়ে গেল। ওর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। চোখের দৃষ্টি ওর ওদিকের দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ। সেদিকে কাকে যেন ও দেখছে, তার কথা শুনতে শুনতে ওর চোখদুটো যেন অস্বাভাবিক জ্বালায় জ্বলতে লাগলো। সেই দিকে চেয়ে ও একটার পর একটা কাঠি জেলেই চলে।

—ও কি ঠাকুরপো! ও কি করছ? কোনোমতে আমার স্ত্রী মৌখিক একবার বাধা দিলে বটে, কিন্তু শুকদেবের চোখ-মুখের অস্বাভাবিক অবস্থার দিকে চেয়ে ভয়ে ওর গলা শুকিয়ে এল।

ওই দৃশ্য আর সে সইতে না পেরে ছুটে গেল নিচে।

—ও মা শীগগির আসুন। ঠাকুরপো কি করছে দেখুন।

মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত ছিলেন। সাড়া দিলেন: যাচ্ছি, তুমি যাও।

আমাদের ভাঁড়ার আর রান্নাঘরটা বাড়ির এক দূর প্রান্তে। আমার স্ত্রী উন্মাদের মতো সেই দিকে ছুটলো। মায়ের আঁচল ধ'রে টেনে বললে, শীগগির আসুন, ঠাকুরপো যেন কী রকম যেন রকম হয়ে গেছে।

—কী হয়ে গেছে?

—খালি একটার পর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালছে। আর কি রকম ক'রে দেওয়ালের দিকে চাইছে। ভয় করছে।

মা কথাটার খুব গুরুত্ব দিলেন না। হেসে বললেন, জানো তো তুমি ভীতু মেয়ে। তাই তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। যাও, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো গে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

আমার স্ত্রীর কিন্তু একা যেতে ভয় করছিল। এমন সময় পাশের বাড়ির গাঙ্গুলী গিন্নীর মোটা ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল: ও ভূতো চাটুয্যের দোতলার ঘর থেকে অত ধোঁয়া বেরুচ্ছে কিসের দেখে আয় তো।

আমার স্ত্রী এবং মা দুজনেই চমকে উঠলেন। ছুটলেন দোতলায়, —পিছনে পিছনে ঝি-চাকরগুলোও। কিন্তু…

বাসুদেব থামলো।

বাসুদেব বলতে লাগলো:

সঙ্গে সঙ্গে মোটরে করে তাকে এখানে হাসপাতালে আনা হোল। ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। কিন্তু হাসপাতালে আনার পর থেকে প্রায় সমস্তক্ষণ আমি তার পাশে থাকতাম। মেডিকেল কলেজের ছাত্র ব'লে সে সুবিধা আমি পেয়েছিলাম।

সমস্তশরীর, এমন কি মুখ পর্যন্ত পুড়ে এমন বীভৎস হয়ে গিয়েছিল

যে, সেদিকে চাওয়া যেত না। অথচ ওর চোখ-মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। এই অবস্থায় সে দিন-দুই ছিল।

মৃত্যুর আগের দিন নিরিবিলি পেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, কেন এমন করলি?

কথা কইতে শুকদেবের কষ্ট হচ্ছিল। কোন রকমে বললে, তোমাদের বলিনি,—বললে হয়তো বিশ্বাসও করতে না,—মৃত্যুর পরে ঠাকমা প্রায়ই আমাকে আত্মহত্যা করার লোভ দেখাতেন। তাঁকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেতাম। বলতেন, মর, মর, আগুন জ্বেলে মর। দেখবি খুব আরাম। লোভ হোত। অনেক বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ-না কেউ এসে পড়ায় বাধা পেয়েছি। সেদিন দেশলাইটা জ্বালামাত্র ঠাকমা আবার দেখা দিলেন, আবার মরবার প্ররোচনা দিতে লাগলেন। কিন্তু বৌদি বসে আমি পেরে উঠছিলাম না। হঠাৎ বৌদি উঠে যেতেই আমি দাঁড়ালাম। ঠাকমা যেন ঠেলতে ঠেলতে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কেরোসিনের ভর্তি টিন। সেই কেরোসিন ঢাললাম মাথায়, জ্বালিয়ে দিলাম আগুন। তারপরে·······

জিজ্ঞাসা করলাম যন্ত্রণা হচ্ছে খুব? না।

আর কিছু বললে না শুকদেব।

রাত্রি হয়ে আসে। জনস্রোত ঈষৎ মন্দীভূত।

কতক্ষণ নিঃশব্দে বসে ছিলাম জানি না। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, চারিদিকের আলো জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। গাছের তলায়, যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেখানটা অন্ধকার। বাসুদেবের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

আমার চোখে কি কিছুর ছোঁয়া লেগেছে? কিছুই চিনতে পারছি না কেন? বাসুদেবকেও না, চিরপরিচিত দীঘিকেও না, চারিপাশের আবেষ্টনকেও না।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—দক্ষিণ বিহারের হাজারিবাগ জেলার বন্য প্রকৃতির নৈসর্গিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। আবাল্য প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক, লেখককে এক স্বাভাবিক শিল্পিমানস দান করে। তবে সরোজবাবুর আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির মালিহাটি। রবীন্দ্র পরবর্ত্তীকালে সরোজকুমার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এক নাম। তাঁর লেখায় কাহিনীকারের কুশলতা ও জাত শিল্পীর কারুকার্য-অনিবার্যভাবে উপস্থিত। ভাষার প্রাঞ্জলা ও সুখদায়িকা লেখকের নিপুণ চরিত্র চিত্রনকে নিপুনতর করেছে। সরোজ রায়চৌধুরী মশাই গ্রাম বাংলার অসাধারণ সব সাধারণ মানুষগুলোকে অসামান্য সুষমায় ভরিয়ে তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। লেখকের শতাব্দীর অভিশাপ, কালো-ঘোড়া, কৃশানু ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক পঠিত।

বিচিত্র রসের সন্ধান পিয়াসী লেখক কিছু রোমাঞ্চকর ভৌতিক গল্পও লিখেছেন। লেখকের ভৌতিক কাহিনী পাঠক-পাঠিকাকে এক বিশেষ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দান করে।



ছায়াময়ী

মনোজ বসু

জন্ম থেকেই শহরে বসবাস। কল টিপলে আলো, কল ঘোরালে জল। চাকরি নিয়ে সেই আমাকে বিরাটগড় যেতে হল। নাম শুনে ভেবেছিলাম বিরাট বিপুল কোন জায়গা। ছিল বটে তাই নীলকুঠির আমলে। ভাঙাচুরো দালানকোঠা, তার বট-অশ্বত্থ হরেক-রকম ঝোপজঙ্গল। সাপ আর বুনোশুয়োর মজাসে পাকাদালানে বসবাস করে। শীতকালে নাকি বড়মিঞারাও (রাতের বেলায় লিখছি—

খোলাখুলি নাম করে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব!) বেড়াতে আসেন। এ হেন স্থানে এসে দুদিনে পালাই-পালাই ডাক ছাড়ছি। ইচ্ছা করে, চাকরির পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে শহরের ছেলে শহরে গিয়ে যথারীতি রাজাউজির নিধনকর্মে লেগে যাই।

কিন্তু মুরুব্বিরা নিষেধ করেন। খুঁটোর জোর নেই, কাকে ধরলে কি হয়-এই তত্ত্বে একেবারে আনাড়ি। তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসলাম—এবং কি আশ্চর্য টায়েটোয়ে পাশও হয়ে গেলাম। বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যবল না থাকলে এমন অঘটন ঘটে না। আরও বছর দেড়েক কেটে গেলে হটাৎ সরকারী চিঠি—আমাকে সাবরেজিস্ট্রার করা হয়েছে বিরাটগড়ে। এ চাকরির নিয়ম—আজ এখানে কাল ওখানে, তামাম ঘাটের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়ায়। মুরুব্বিরা তাই ভরসা দিলেন —থাকো-না বাপু চেপেচুপে। উপরে যাওয়া আসা কর, তড়িঘড়ি যাতে বদলি হতে পার ভাল যায়গায়। ভাল অর্থে তাঁরা ভাবেন, যে জায়গার দু-চার পয়সা উপরি আছে; আমি ভাবি, আছে যেখানে আড্ডা দেবার জুৎ।

আছি তাই। হরিশ নামে তুখোড় একটি লোক পেয়েছি। সাবান কেচে রান্না সেরে জুতোয় বুরুশ ঘষে বাসন মেজে তার পর ধাঁ করে উর্দিচাপরাস পরে নিয়ে গোঁফ চুমরে হরিশ আমার অফিসের চাপরাসি হয়ে যায়। বেলা দশটায় চাপরাসি সহ হাকিম গিয়ে এজলাসে ওঠেন। এই পাড়াগায়ে সাবরেজিস্ট্রারকে বলে 'হাকিম'—সকলে হুজুর হুজুর করে! শুনতে খাসা লাগে। চারটে অবধি তালে-গোলে কেটে যায় এমনি।

সন্ধ্যার পর থানায় ডাক পড়ে প্রায়ই। হেরিকেন ও লাঠি-বন্দুক নিয়ে কনস্টেবল চলে আসে। ছোট দারোগার তাসের নেশা। কাজকর্মে বাইরে গেলেন তো আলাদা কথা—থানায় উপস্থিত থাকলে তাসে ওঁরা বসবেনই। অঞ্চলটার অধিপতিই হলেন ওঁরা—যার তার সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাসখেলায় চারজন চাই—তা ছোটবাবু ছাড়া আছেন ও বড় দারোগাবাবু। সরকারি ডাক্তার আর দশ আনির নায়েব দয়ালহরি সেন। একজন কেউ গরহাজির থাকলে

আমার খোঁজ পড়ে যায়। ছাড়ান নেই কোন রকমে। খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করে হিড়হিড় করে থানায় নিয়ে যায়—প্রায় সেই গতিক। আমার ভাল লাগে না। নিরিবিলি একটু লেখাপড়া করতে চাই। চুপি চুপি বলি —বয়সটা খারাপ এবং চতুর্দিকে গাঙখাল ও সবুজ গাছপালা থাকায় কিঞ্চিৎ পদ্য লেখার বাতিকে পেয়েছিল, ঐ সময়টা।

রেজেস্ট্রী অফিস পাকা দালানে, তারই কাছাকাছি খান দুই দোচালা খোড়োঘর নিয়ে বাসা আমার। রাত ঝিমঝিম করে। তক্ষক ডাকে ঘরের দাওয়ায়। আর কেউ ডাকে জঙ্গলে—তার মানে, বড়-মিঞা বা ঐ জাতীয় বড়দের কেউ দর্শন দিয়েছেন। বাদুড়ের ঝাঁক দেবদারুবনে পাকা ফল খাচ্ছে—গাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সেই শব্দেও গা শিরশির করে। পদ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে মানুষে মানুষে তফাৎ হয়ে থাকা একান্ত অনুচিত এই মহাতত্ত্ব মনে পড়ে যায় তখন। হরিশকে ভিতরে ডেকে নিই। হাকিম ও চাপরাসির পাশাপাশি শয্যা। দশে-ধর্মে দেখে না এই যা - দেখতেপেলে ধন্য ধন্য করত।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে হরিশ ভাবছে: উঠে পড়ুন হুজুর, বেড়ার ওধারে জলের তোড় শোনা যাচ্ছে। ধড়মড়িয়ে উঠি দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। তাই বটে। উঠানে জল বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলছে দু'দিন ধরে—তাই বলে এত জল?

এদিক-ওদিক তাকাই। সীমাহীন জল। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অদূরের অফিসবাড়িটা দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে। দাওয়ায় বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। ভারি এক আফশোষ—করল। হরিশ চুকচুক করে: ইস—একেবারে ছাঁচতলায় গো! বড় কাতলা। কুঠির—পুকুর ভেসে সর্ব মাছ বেরিয়ে পড়েছে। খেপলা-জাল থাকলে এক্ষুনি এটাকে কায়দা করে ফেলতাম। বান ডেকেছে। লটবহর কাঁধে নিয়ে- একহাঁটু জল ভেঙে অফিসের দালানে এসে উঠলাম। এসেছিলাম ভাগ্যিস। বানের তোড়ে সন্ধ্যা নাগাত আমার

সেই কাঁচা—বাসা ভেঙে পড়ল। চাল—খুটি-বেড়া এদিক-সেদিক ভেসে চলল! ওখানে থাকলে আমাকেও ভাসতে হত।

দিন তিনেক পরে জল সরে ফের ডাঙ্গা দেখা দিল। তখন ঘরের সমস্যা। সরকারী অফিসে চিরকাল বসবাস চলে না। খোড়োঘরে আবার গিয়ে উঠতে আমার ঘোরতর আপত্তি। তাসের আড্ডার বন্ধুবর্গও চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু ভেবে কোন্ সুরাহা হবে - পাকা—কোঠা এই জায়গায় কে বানিয়ে রেখেছে আমার জন্য ?

দশ—আনির নায়েব দয়াল হরি একটা খোঁজ দিলেন—কুঠিবাড়ী যেতে চানতো বলুন। নীলকরদের বাড়া ভেঙেচুরে পড়েছিল। দশ—আনির সেজোকর্তা সেই বাড়ী আগাগোড়া মেরামত করে দরজা—জানালা পালটে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য করলেন। ইচ্ছে ছিল, মাঝে মাঝে মহলে এসে ঐখানে থাকবেন কিন্তু প্রথম বারেই ক-দিন থেকে চোঁচা—দৌড় মারলেন। আর এ মুখো হননি তারপর। ভূতের বাড়ী—প্রভুরা কিলবিল করছেন কুঠিবাড়ীর অন্ধিসন্ধিতে। গল্প শুনে সরকারী-ডাক্তার হেসে খুন। ভূত না ঘোড়ার ডিম মশাই। ডাক্তার হিসাবে আমার জানতে কিছু বাকি থাকে না সেজোকর্তা বএক্তিয়ার হয়ে থাকতেন— সে চোখে গরু-মানুষ পেত্নীভূতের তফাৎ বোধ থাকে না। আপনি ও যেমন।

দয়ালহরি আমার দিকে চেয়ে বলেন, তা সাহস থাকে তো বলুন। চাবি-ছোড়ান আমার কাছে—এক্ষুনি তালা খুলে দিচ্ছি। রঙিন মেঝে, ডিসটেমপার—করা দেয়াল, সেজোকর্তার শখের আসবাবপত্রর—যদ্দিন ইচ্ছে ভোগদখল করুন গে। কাছেই আমার বাসা ছাড়া—বাড়ী দেখে মেয়েদের গা ছমছম করে। মানুষের আনাগোনা হলে তারা সোয়াস্তি পাবে।

বড় দারোগাও অভয় দেন ঠিক আছে মশায়—ঐখানে উঠুন। লেখাপড়া শিখে কুসংস্কার থাকবে কেন? সারারাত্রির বরঞ্চ কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব ওখানে। বন্ধুলোক আপনি, সরকারী লোকও বটেন। উঠলাম তো কুঠিবাড়ী। গোড়াতেই হরিশ জবাব দিল—কাজকর্ম সবই সে করবে, কিন্তু রাতে থাকবে না। সন্ধ্যাবেলা

রান্নাবান্না সেরে চ'লে যাবে। যা গতিক, চাপাচাপি করতে গেলে চাপরাসির চাকরিটাই ছেড়ে দেবে হয়তো।

যাক গে, বয়ে গেছে! দারোগাবাবু কথা রেখেছেন। রাত্রিবেলা এক ঘুমের পরেও জানালা দিয়ে দেখছি, বসে আছে লোকটা বারাণ্ডার উপর। মাস চারেক কেটে গেল। আরামেই আছি। সেজোকর্তা কি দেখেছিলেন জানি না।—যাঁরাই হন, বাসা উঠিয়ে সরে পড়েছেন। দয়ালহরি খুব দৃষ্টি সুখ দেন। ইদানীং কুঠিবাড়ির সামনে দিয়েই তাঁদের যাতাযাত। আমায় দেখলে বারাণ্ডায় উঠে আপ্যায়ন করেন আছেন ভাল? বেশ, বেশ—

স্ত্রীর নাম করে হরিশকে বলেন, বড়বউ কি জন্যে ডাকছে একবার তোকে। শিগগির শুনে আয়।

তার মানে, রান্না—করা দু একটা তরকারী কিম্বা পিঠা-পায়স। হররোজ এই চ'লে। বিদেশি মানুষ একলা পড়ে থাকি—আর হরিষের যা রান্নার তরিবৎ! ক্ষিদের জ্বালায় সেই বস্তু গলধঃকরণ করি। অভ্যাস না থাকলে কক্ষনো আপনারা তা পেটে রাখতে পারবেন না নোংরা কাণ্ড ক'রে বসবেন।

কুঠিবাড়ি আর দয়ালহরির বাসার মাঝে একখানা শুধু আউশক্ষেত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের সব দেখা যায়। আচ্ছা হরিশ, একটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছি ক-দিন—

অফিসে হরিশ চাপরাসি, কিন্তু অনেকদিন পাশাপাশি রাত কাটানোর দরুন বাড়িতে সময় বিশেষে সে সখাস্থানীয়।

উই যে ঢ্যাঙা এক হাড়গিলে ঘুরছে যেন। হাড়গিলে কোথায় হুজুর - শহুরে মেয়ে, অতি শ্রীমন্ত।

গাঁয়ের তাবৎ খবর হরিশের নখদর্পনে। বলে, নায়েবের ভাগনী হন উনি। মা নেই বাপের দ্বিতীয় পক্ষ। নানান গণ্ডগোলে মামার বাড়ি এসে উঠেছে।

ফিক ফিক করে হেসে বলে, চালচলনে অবিকল হুজুরের সঙ্গে মিলে যায়। পুকুরে নামবে না কিছুতে, ডুবে যাবার ভয়। তোলা

জলে চান করে। কে জল তুলে দেবে তা দেখুন গে, সারা বেলা নিজেই কলস ভরে।

ঐ এক পরিচয়েই মেয়েটাকে আপন মনে হল। গ্রামের মধ্যে দু-জন আমরা স্বতন্ত্র নরনারী। ঘাটে গিয়ে পা ডুবিয়ে নাইতে পারি নে। অদৃষ্টবশে জঙ্গুলে গ্রামে নির্বাসনে এসেছি, কিন্তু শহরের অভ্যাস নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে এখানকার একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে আমি যেমন নিশ্বাস ছাড়ি ঐ মেয়েটা ও ছাড়ে তেমনি নিশ্চয়। অথচ দেখিনি তাকে—আউশ ক্ষেতের ওপারের একটুকু ছায়ামূর্তি ছাড়া। দশটায় অফিস চলে যাই। এক রবিবারে জল বওয়া ব্যাপারটা চোখে দেখলাম। কত মেয়ে বউ তো কুঠির-পুকুরের জল নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত দূর থেকে এক নজরেই মালুম হল, ঐ মেয়ে আলাদা। কলসি কাঁখে ধরবার কায়দাও জানে না—অর্ধেক জল ছলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে, সাবরেজিষ্ট্রার-হাকিম কুঠিবাড়ির বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্য মেয়ে-বউ যেমন করে—কেউ আধ-হাত ঘোমটা তুলে দেয়, কেউ দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোনো লজ্জাবতী মাঠ পগার পেরিয়ে শজারুর মতো চোঁচা দৌড় মারে (শজারু বললাম এই জন্যে যে পায়ের তোড়া ঝুন ঝুন আওয়াজ তোলে দৌড়নোর সময়) —আর এ মেয়ে সোজা একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

অঘ্রানে খানাডোবায় পাট—পচানো জল কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। যথারীতি কুইনাইন সেবন সত্ত্বেও হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এলো। বিছানা ছেড়ে উঠবার তাগত নেই রেজিষ্ট্রী—অফিসের কাজ একরকম বন্ধ— চাপরাসি হরিশকে তবু গিয়ে হাজিরে দিতে হয়। দুপুরবেলাটা নিঃসঙ্গ লাগে। মা কবে মারা গেছেন, তাঁর কথা মনে আসে। শহরের বন্ধুবান্ধবদের কথা ভাবি। আর ভাবি দয়ালহরির ভাগনীটাকে। জ্বর কম থাকলে মাঝে মাঝে জানালায় বসি। যদি সে কুঠির—পুকুরে জল নিতে যায়, কিম্বা দয়ালহরির স্ত্রী বার্লি রেঁধে পাঠিয়ে দেন তার হাত দিয়ে। বার্লি নিয়ে নয়—শুধু হাতে সে এলো। মাথা

কামড়াচ্ছিল, দু-আঙ্গুলে রগ টিপে ধরে ছটফট করছিলাম। হঠাৎ দেখি, শিয়রের পাশে কখন এসে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেমের মত ফরসা চেহারা—আপনার আমার ঘরে এমনটা কদাচিৎ দেখা যায়। তাকিয়ে পড়তে জিজ্ঞাসা করল : বড্ড কষ্ট হচ্ছে ?

না, না বেশ তো আছি—

মিথ্যাও নয় জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে ঐ ভাবে সমবেদনা জানানোর পর ? এতক্ষণের আর্তনাদ চক্ষের পলকে গানের মত সুরেলা হয়ে উঠেছে।

দাঁড়িয়ে কেন বসুন না।

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায়।

আজকে যাচ্ছি আমি। আবার আসব কেমন ?

দেখলাম, হরিশ এসে পড়েছে। তাই পালাল। কখন কি লাগে না লাগে অফিস থেকে হরিশ সকাল সকাল এসেছে সেজন্য। মনিবের জন্য উদ্বেগটা কিছু কম হত যদি হতভাগার।

মাসখানেক ভোগান্তির পর জ্বরটা গেল দুপুরের দিকে মেয়েটা রোজই আসে। কথাবার্তা বেশী নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। এই গ্রাম অঞ্চলে সাধু ফকিরেরা ঝাড়ফুক দিয়ে ব্যাধি সারান। সরকারী-ডাক্তার যতই দেমাক করুন, আমি জানি, দু-চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে মেয়েটাই আমার জ্বর সারিয়ে দিয়েছে।

জ্বর বন্ধ হবার পরে আর দেখা পাই নে। তখনও ঠাণ্ডা লাগানো বারন সন্ধ্যার পর দরজা-জানালা ভেজিয়ে ঘরে থাকতে হয়। এক কালে গানের চর্চা করতাম, গলার সুরের বিস্তর তারিফ পেয়েছি। দয়ালহরির বাড়ি থেকেই এক হারমেনিয়াম জুটিয়ে সঙ্গীত-সাধনায় লেগে গেলাম আবার। ডাক্তারের সব উপদেশ মেনে চলা যায় না—শেষটা দুয়োর-জানালাও খুলে দিয়েছি। কিন্তু গানে বনের পশু হয়তো বশ হয়, শহুরে মানুষ নৈব নৈব চ। ওরা বেশি কঠিন।

মরীয়া হয়ে এক চিঠি লিখলাম সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথাঃ গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল তবু একবার দেখা পাই নে। অসুখের সময় রোজ আসতে—অসুখই তো ভাল ছিল আমার পক্ষে। রোজ আমি দরজা খুলে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাই ভাগ্যবশে অসুখ করে যদি আবার।

হরিশ কি মনে করবে, তাকে দিয়ে হয় না। পথের এক রাখাল-ছোঁড়াকে ডেকে নগদ পাঁচ পয়সা কবুল করলাম ঃ নায়েবমশায়ের ক্ষেতেওই যে একজন বেগুন তুলছে, ওকে দিয়ে আয় তো কাগজখানা। কি বলে সেটা শুনে আসিস। ছোঁড়া এসে বলে, গোমরোসাপের মতন ফোঁস করে উঠল হুজুর। কোনদিন ও কোনখানে আসে নি মিছে কথা লিখছেন নাকি আপনি। কাঁটাসুদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারতে গেল। ভয়ে ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।

আরও পাঁচ পয়সা বকশিশ দিয়ে তাকে বিদায় করলাম গোখরো-সাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। অসো নি তুমি মিথ্যে কথা? বেশ, তাই মেনে নিলাম। আমারই চোখের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। তোমার মুখে হেন বাক্য—কেউ নেই তবে আমার বিশ্বভুবনে। সেই ভাল—আমার কেউ নেই।

একটু-আধটু অফিসে যাচ্ছি এখন, সকাল-বিকাল ফিরে আসি। এসে দেখি, ঘরের মেঝের উপর আঁটা-খাম। জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

লিখছে—রাগের বশে ছোঁড়াটাকে যা বলেছি, পুরোপুরি ঠিক নয়। এক-শ পাঁচ জ্বর শুনে গিয়েছিলাম একদিন। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে আসি। রোজ যেতাম, একথা বলা হল কেন তবে? এই ছোট ব্যাপার নিয়ে চিঠি লেখাও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আপনার পক্ষে।

নাম লিখেছে লাবণ্য। নাম পেয়ে গেলাম এই বা কম কিসে? আমি চুপচাপ। স্রেফ বেনেবনে গিয়ে বেগুন নিক্ষেপ হচ্ছিল—তবু অন্তত একটা দিনের নিশানা পাওয়া গেল। একটা দিন ছাড়া বাকি সমস্ত মায়া।

আবার চিঠি ক-দিন পরেঃ না-হয় গিয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশি মানুষ রোগে আই টাই করছেন কানে শুনে সবাই দেখতে যায়। ঘরের ভিতরে যাইনি তো। মামা-মামির কানে এ সমস্ত না ওঠে - দোহাই আপনার।

চিঠি পড়ছি চোখ তুলে দেখি, লেখিকাই অদূরে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসচে মুচকি মুচকি।

জিজ্ঞাসা করলামঃ এত খেলানো হচ্ছে কেন?

মজা করি।

সাহস পেয়ে বলি, এখন মোটেই আসছেন না। একা-একা বড্ড কষ্ট হয় আমার। এত কঠিন আপনি, ভাবতে পারি নি।

খিলখিল করে হাসেঃ আপনি-আপনি করেন মনে হচ্ছে কত দরের লোক যেন আমি।

অপরূপা ইতিমধ্যে এতখানি অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেলামঃ বেশ, তুমি বললে যদি আপদ চোকে তো তাই।

দিন কতক তার পরে ভারি মজা চলল। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে আসে। নানান ছলছুতোয় আমিও হরিশকে বাইরে রাখি। এমন হল সন্ধ্যার পর ঘরে একটু প্যাঁ পোঁ আওয়াজ উঠেছে—

দেখেছি গো, দেখতে পেয়েছি। আমাব চোখে লুকিয়ে থাকবে, এত ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এসো, খাটের উপব ভাল হয়ে বসে গান শোন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল আলাদা একজন কালো রঙের থুড়ি, একটুখানি চাপা-রঙের মেয়ে। আর ঝকমকে সেই লাবণ্য স্মুভুত করে কোন ফাঁকে সরে পড়েছে। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিঃ কে আপনি?

হকচকিয়ে গেল সে। কণ্ঠস্বর কাঁপছে, কথা আটকে আটকে যায়। কেউ নেই, কেউ নেই। গান হচ্ছে শুনে একটু এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ডাকলেন, তাই ভিতরে এসেছি। পথ ছাড়ুন, চলে যাচ্ছি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল, মাটি করে দিল। আচ্ছন্নের মতো মেয়েটা চলে যাচ্ছে তবু মায়াদয়া হয় না, যাচ্ছেতাই গালমন্দ

করছি : চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি ? কে পাঠিয়েছে আপনাকে ?

অদৃশ্য হয়ে গেল ঝুপসি ঝুপসি গাছপালার আড়ালে। রাত্রিবেলা পিছনে ছুটে গিয়ে ধরে, এত সাহস নেই শহুরে ছেলের। যাই হোক, আর দেরি করা ঠিক নয় বদনাম রটে যেতে কতক্ষণ নিশ্চয় কারো নজরে পড়ে গেছে, অন্ততপক্ষে যে মেয়েটা ঐ পালিয়ে গেল।

যা থাকে কপালে দয়ালহরির কাছে পরদিন কথা পেড়ে ফেললাম আপনার ভাগণীর সঙ্গে যদি ইয়ে হয় নিতান্ত অযোগ্য আমি, তবু যদি দয়া করে।

আপনি তুমি বাবা, পায়ে ঠাই দেবে লাবণ্যকে ? যার মা নেই, তার কিছুই নেই। অনেক কষ্ট পেয়েছে এই বয়েসের মধ্যে। ও মেয়ের এত ভাগ্য

আনন্দে দয়ালহরি কেঁদে ফেললেন।

কেল্লা ফতে। ক-দিন পরেই লাবণ্য তুমি একেবারে আমার। শোন, শোন ও লাবণ্য খবর রাখ ?

দুষ্টুমি ভরা চোখে চেয়ে সে বলে, মামি তো রেগে আগুন কী করে জানল তোকে হতভাগা মেয়ে ? যাতায়াত চলে বুঝি প্রেম করে বেড়াস ? একছুটে পালিয়ে এসেছি ধরতে পারলে মামি দিত দেখিয়ে। কই, গান-টান হবে না আজকে ?

সত্যি হাঁপাচ্ছে। আর ঐ ভুবনমোহন হাসি। ক্ষেপে গেলাম যেন ধরতে পারলে মামি কেন, আমিও দিই দেখিয়ে এমনি করে খেলানোর জন্য।

পালাচ্ছে, আমিও পিছন পিছন ছুটি। ভয় টয় গিয়ে অকস্মাৎ বিষম বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে হঠাৎ একবার। খিলখিল হাসি : ধরুণ দিকি কত ক্ষমতা। সে আর পারতে হয় না। ধরুন ধরুন—

একেবারে কাছে গিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু-হাত ফিরে এল. কারও গায়ে ঠেকল না তো। একটুকু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারি স্ফূর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে দিয়ে জোৎস্নার সঙ্গে হাস্যধ্বনি

মিশে চারিদিক তরঙ্গিত হচ্ছে। পাঁকাল মাছের মতন পিছনে পিছনে যাচ্ছে। তাই বা কোথায় এত ছুটছি, তবু একটুকু স্পর্শ পাইনে।

আচ্ছা এইবারে চ়-উ-উ-উ

পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কপাটিখেলায় যেমন দম ধরে ছোটে। নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে ভ্রমরার একটানা গুঞ্জন। খালি পায়ে মাটির ঢেলায় ঠোক্কর লাগছে। তখন মালুম হল আউশক্ষেতে চলে এসেছি। ধান কাটা শেষ করে নতুন চাষ দিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে চারিদিকে। ক্ষেতের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে সে ডাক দেয়ঃ কই পারলেন না তো।

ধরেছি--ধরলাম এইবারে বুঝি উঁহু, ফসকে গেল, সামান্য একটু -খানির জন্য। আলেয়া এমনি করে ভুলিয়ে নিয়ে যায় পথিককে নিয়ে গিয়ে রক্ত চোষে।

রক্তে আগুন ধরে গেছে, টাণ্ডা মাথায় ভাল-মন্দ ভাবি কখন? এসে পড়েছি দয়াল হরির বাইরের উঠানে। আমি হেন হাকিম মানুষ রাত্রিবেলা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি দেখতে পেলে লোকে ভাববে, নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা সে যা-ই হোক, জিতেছি জিতেছি হাত ধরে ফেলেছি অবশেষে। সুকোমল হাতখানা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, অসুখে কাবু হয়ে পড়েছি, কত কষ্ট আর আমায় দেবে লাবণ্য?

চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেন বাড়ি এসে আবার মিষ্টি মিষ্টি বুলি! কী ভাবেন আমায়? খেলার পুতুল নই যা ইচ্ছে করা যায় না আমায় নিয়ে।

গর্জন করে উঠল সেই মেয়েটা, চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। আর, যার পিছন ধরে এতদুর চলে এলাম, চক্ষের পলকে সে জ্যোৎস্নার সঙ্গে গলে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

দয়াল হরির ভাগিনী লাবণ্য তবে তো এই। হাত ধরে লাবণ্যর মান ভাঙ্গতে আর একজন এখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে সে নেবেই আমি আরও শক্ত করে ধরিঃ বিষম এক

গোলমাল আছে এর ভিতরে। নিশ্চয়ই। মুখে বলো লাবণ্য, আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

কী জানে লাবণ্য, আর কী-ই বা বলবে। শহরের নিঃসঙ্গ মানুষটার কষ্ট শুনে চুপিসারে সে গিয়ে বাইয়ে দাড়াত। সে-ই আরও অবাক হয়ে গিয়েছে মানুষটার পিছনে ছুটো চোখ আছে নাকি? মুখ না ফিরিয়েই আমার খবর কেমন করে টের পায়? চিঠিতে লিখে পাঠায় আবার সেই কথা···

মামাকে দেখে লাবণ্য তাড়াতাড়ি সরে গেল. সমস্ত কথা শুনতে পেলাম না। যাক গে যাক গে পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। উল্লসিত চিৎকারে দয়াল হরি আহ্বান করলেন: এসেছ বাবাজী, এসো। থানার বড় বাবু আর ছোট বাবুকে বললাম তোমার কথা। সবাই ধন্য ধন্য করলেন। এমন দরাজ দিল—কলিযুগে কেউ কানে শোনে নি।

এরপর আর একটা দিন তাকে দেখেছিলাম। বিরাটগড় থেকে বদলি হয়েছি. পরের দিন চলে যাব। কুঠিবাড়িতে সেই আমাদের শেষ রাত্রি। আমি আর লাবল্য ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন এক আমরা। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশে চাঁদ দেখা যায়। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে এসে পড়েছে। চাঁপাফুল ফুটেছে কোথায়, ফুলের গন্ধে ঘর আমোদ করছে।

খাটের বাজু ধরে আমাদের দু জনের দিকে চেয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছে। দেখা পেয়ে বড় আনন্দ হল: এত সুখ তুমি এনে দিয়েছ লাবণ্যকে তোমার জন্য পেলাম। যেখানেই থাকি, সারা জীবন তোমায় মনে করব।

হাসতে হাসতে সে বলে, বড় যে তুমি তুমি করছ কত বয়স আমার জান?

অনেক ছোট নিশ্চয় আমার চেয়ে

অনেক বড়। কুঠিয়াল গ্রান্ট আমার বাবা, নয়নতারাকে ধরে আনা নিয়ে হরিশ মুখুজ্জের কাগজে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল সেই

নয়নতারার গর্ভের মেয়ে আমি। কত বয়স তাহলে হিসেব করে দেখ।

বললাম, মেয়েরা বয়স কমায় তোমার রুচি উল্টো। কিন্তু 'আপনি বললে তুমিই তো হেসে উঠেছিলে আর একদিন।

হেসেছিলাম বুঝি। তাই হবে। মন খারাপ লাগে এক এক সময় ভালবাসার কথা শুনতে লোভ হয়, সাধ হয় মানুষের ছোঁয়া পেতে।

গভীর এক নিশ্বাস ফেলল। কণ্ঠ ছলছলিয়ে ওঠে। বলল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী যে আমি। তোমাদের চোখে ধোঁয়াটা রঙিন লাগে ভাগ্যিস। তোমার লাবণ্যর বকলমে ফাঁকি দিয়ে অনেক ভালবাসার কথা শুনে নিয়েছি। হি-হি-হি

চলে গেল; হাসি ছাড়া কান্না দেখাবে না বুঝি পাগলের মতন হাসতে হাসতে চলে গেল তাই।

মনোজ বসু ঃ জন্ম ১৯০২ সালে।

যুদ্ধপূর্ব তথা যুদ্ধোত্তর কালের ঝড় ঝঞ্ঝা ও নৈতিকতার অবমূল্যায়ণের যুগেও যে সমস্ত লেখক রোমান্সের মর্ম্মর ধ্বনীতে আমাদের আমোদিত করেছেন মনোজ বসু তাঁদের অন্যতম।
তবে পরবর্ত্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ "ভুলিনাই" তাঁকে অসামান্য জনপ্রিয়তা দান করেছে। এছাড়া তাঁর "মানুষ গড়ার কারিগড় ও "চীন দেখে এলাম" বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। বাঙ্গালা ছোট গল্পের উজ্জ্বল পথ পরিক্রমায় মনোজ বসুর অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। মনোজ বাবুর গল্পের ভাণ্ডারে অতি প্রাকৃত ও ভৌতিক গল্পও বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তাঁর ছায়াময়ী ও "ওনারা" বাঙ্গলা ভৌতিক কাহিনীতে এক উজ্জ্বল সংযোজন।



স্বপ্নলব্ধ কাহিনী

প্রমথনাথ বিশী

লেখক জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, লিখিবার কিছু না থাকিলেও লিখিতে হয়। শরীর খারাপ বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না, ভাবে ওটা বাড়াবাড়ি হইতেছে; সময় নাই বলিলে ভাবে ওটা চাপ দিয়া কিছু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার অজুহাত মাত্র। কাজেই হতভাগ্য লেখককে, যুগপৎ পিছনের ঠেলায় ও সামনের টানে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়। আমার লিখিবার অভ্যাস আছে লেখার প্রেরণায় যে লিখি এমন মনে করিবার কারণ নাই, নিতান্তই আর

কিছু করিতে পারি না বলিয়া লিখিয়া যাই। সেটা বিস্ময়ের নয়, বিস্ময় এই যে, এমন লেখা ও সম্পাদকগণ কাঞ্চনমূল্যে কিনিয়া ছাপিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সম্পাদক চক্রের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইবার সময় পূজার ছুটি, আকাশ যখন নির্মল হইয়া উঠে, উত্তরে বাতাসে শিউলিফুলগুলি যখন স্নেহ-সম্ভাষণের মতো টুপ-টুপ করিয়া ঘাসের উপর পড়িতে থাকে, আর প্রত্যেক তৃণপল্লবের আগায় একটি করিয়া শিশির বিন্দু দেখা দেয়, সেই নিরাময় শরৎকালে আমি কিছুদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়ি।

সেবার এই উদ্দেশ্যে হাওড়া ষ্টেশন গিয়া পৌছিয়াছি, জিনিসপত্র গাড়ীর কামরায় তোলা হইয়াছে, আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটি চুরুট সবে ধরাইয়াছি—এমন সময়ে পিছন হইতে কে নাম ধরিয়া ডাকিল! ফিরিয়া দেখি পত্রের সম্পাদক। ব্যাপার কি শুধাইবার আগেই ব্যাপারখানা কি তিনি আগেই জানাইয়া দিলেন—একটি গল্প চাই। বলিলাম, দেখছেন আমি তো বেরিয়ে পড়েছি। তদুত্তরে তিনি সন্তর্পনে কয়েকখানি নোট আমার মুঠোর মধ্যে গুঁজিয়া দিয়ে বিনীত ভাবে হাসিলেন, ভাবটা এই যে, এবারে তো হইল, আর কোন অজুহাত চলিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, নোট কয়খানা ফেরত দিবার মতো সৎসাহস আমার হইল না। বলিলাম কিন্তু কবে যে পাবেন স্থির নাই। সম্পাদক বলিলেন, যখন খুশি দেবেন; অর্থাৎ টাকা যখন একবার গিলিলেন তখন লেখা কি করিয়া আদায় করিয়া লইতে হয় তাহা যদি না জানি তবে সম্পাদকতা করিতেছি কেন? যাই হোক সম্পাদককে নমস্কার করিয়া বিদায় করিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সাধারণতঃ আমার নিরুদ্দেশ বাসের ঠিকানা কেহ জানিতে পায় না। তাহার কারণ বেড়াইতে বাহির হইবার কয়েকদিন আগে একবার অজ্ঞাতবাসের স্থান খুঁজিতে নিজে বাহির হই এবং অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় একটা লক্ষীছাড়া আবাস নির্দিষ্ট করিয়া আসি। এবারে চলিয়াছি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে।

পুরুলিয়া হইতে টাটানগর পর্যন্ত ছোটনাগপুরের ভূখণ্ডে অনেকগুলি ছোটখাটো রেল ষ্টেশন আছে। তাহাদেরই মধ্যে এক জায়গাকে বাছিয়া লইয়াছি। জায়গাটি শুধু নির্জন নয়, এ যেন সংসার কর্তৃক সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দিনের মধ্যে খানকতেক উজান ভাটী রেলগাড়ী পুরাতন স্মৃতির মতো হু হু করিয়া চলিয়া যায়। সবগুলি থামে না। তারপরই সব আবার পূর্ববৎ, নিস্তব্ধ, নির্জন, বিস্মৃত। ষ্টেশনটির নাম গোপন রাখিলাম, আরও একবার যাইবার ইচ্ছা আছে, সম্পাদকগনের কবলে পড়িতে চাই না।

প্রকৃত নাম গোপন করিয়া জায়গাটিকে বিরামপুর বলিয়া উল্লেখ করিব। বিরামপুরের ষ্টেশনমাষ্টার আমাদের দেশের লোক। তিনি আমার নির্জন আবাস জানিতেন এবার পূজার আগে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, একবার বিরামপুরে আসুন, ইহার চেয়ে নির্জনতর স্থান আর পাইবেন না। তাঁহার আহ্বানে বিরামপুরে গিয়া ষ্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে একটি বাড়ী স্থির করিয়া আসিয়া-ছিলাম। বাড়িটি বৃহৎ, খুব পুরাতন না হইলেও পরিত্যক্ত পড়িয়া থাকায় অল্প বয়সেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বর্তমান মালিক বরাহভূমের এক ইংরেজ পাদ্রী। বাড়ীটি সে কিছুকাল আগে কিনিয়াছিল, কাহার কাছ হইতে জানি না। পাদ্রী সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে এখানে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করিবে। কিন্তু পরে মত পরিবর্তন করিয়া তাহা বরাহভূমে স্থাপন করিয়াছে। বরাহভুম ষ্টেশন এই লাইনেই, কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। পাদ্রী সাহেবের কাছে নামমাত্র ভাড়ায় বাড়ীটি একমাসের জন্য লইয়াছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন যে, আপনি আসিলে ঠাকুর ও চাকরের একজন 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড' নিযুক্ত করিয়া দিব।

হাওড়া হইতে রওনা হইয়া পরদিন বেলা দশটার মধ্যেই বিরামপুর এসে পৌঁছিলাম। সে-বেলা ষ্টেশন মাষ্টারের বাসাতেই স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। বিকাল বেলা একখানা গরুর গাড়ীতে মালপত্র তুলিয়া লইয়া বাড়ীটির দিকে চলিলাম। সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টার চলিলেন। তিনি 'ঝরুকু' নামে একজন স্থানীয় লোককে কম্বাইণ্ড

হ্যাণ্ড স্থির করিয়া বাসযোগ্য করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। মাঠ পার হইয়া আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন ও বাড়ীটির মধ্যে একটি উচ্চ ভূখণ্ড, নতুবা এক স্থান হইতে অপর স্থানটি দেখা যাইত। বাড়ীর পাশে দাঁড়াইলে ষ্টেশনের সিগন্যাল বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পৌছাইবার পর ঝরকু চা করিয়া আনিল। দুইজনে চা পান করিলাম। ষ্টেশন মাস্টারবাবু প্রতিদিন একবার করিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। আমি ভগ্ন প্রাসাদের একক অধীশ্বর হইয়া বারান্দায় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম।

বাড়ীটার সম্মুখে লাগান আছে, কিংবা ছিল বলাই উচিত। এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, দু'চারটি টগর, কবরী ফুলের গাছ ছাড়া অন্য গাছ নাই। বাড়ীটির চারিদিক ঘেরিয়া টানা বারান্দা—মাঝখানে বড় একটি হল, দু'কোণে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। অদূরে পাকশালা, ভৃত্যনিবাস প্রভৃতি। কাছেই একটি ইঁদারা, ইঁদারার পাশে গোটা দুই মহুয়া ও অর্জুন গাছ। বাড়ীটি দেখিলে মনে হয় যে, সৌখিন লোকের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে বাড়ীটির সুখের অবস্থা গত, এখন কোন-রূপে খাড়া হইয়া আছে মাত্র। ভাবিলাম, আমি সুখের সন্ধান করিতে আসি নাই, নির্জনতা আবার কাব্য, এমন অজ্ঞাতবাসের স্থান আর পাইব না।

বাড়ীর বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিলে চোখের দৃষ্টি সুদীর্ঘ ছাড়া পায়, একেবারে বাধে গিয়া দিগন্তের গিরিমালায়। বাড়ীটার সামনেই একটি রিক্ত মাঠ—উঁচু হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরেই প্রথমে চোখে পড়ে সুবর্ণরেখা নদীর অপর তীর, এদিকের তীরটা মাঠের স্ফীতির আড়ালে গুপ্ত। নদীর পরপারে জনশূন্য, তৃনশূন্য, তরুগুল্ম-শূন্য দগ্ধ প্রান্তর, দিগন্তে সেই অনুর্বর, রুক্ষ পাহাড়ের প্রাচীর। এমন নেড়া পাহাড় জীবনে দেখি নাই, পাহাড় নয় যেন জতিকায় পুরীর ভগ্নপ্রাচীরে যে শ্যামলতাটুকু দেখা যায় তাহাও

অভাব। চারিদিকের এমন লক্ষ্মীছাড়া নির্জীব ভাব আর কোথাও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এক একবার মনে হয় যেন পরিচিত পৃথিবীর অংশ নয়। চন্দ্রলোকের মত জগতের একটা খন্ড। কেবল স্বস্তি পাই আকাশের দিকে তাকাইলে—এমন স্বচ্ছ নির্মল নভঃকান্তি বাংলার লোকে কল্পনা করিতে পারিবে না। বাংলা দেশে পৃথিবীর শ্যামলতা আকাশের নির্মলতার প্রতিদ্বন্দ্বী -তাই শরতের আকাশেও সেখানে পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে না। আকাশের দিকে তাকাইয়া আমি কল্পনার ভেলা ভাসাই, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দেবকন্যাগণ মেঘের ভেলা ভাসায়—দুই-ই উদ্দেশ্যহীনভাবে নিরর্থকতার দিকে ভাসিয়া যায়।

এইভাবে দিন যায়, বিকাল বেলা ষ্টেশন মাস্টার আসেন, তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়া জনসঙ্ঘের স্বাদ উপভোগ করিয়া আসি। জনসঙ্ঘের পরিপ্রেক্ষিতে নির্জনতাকে আরও বেশী করিয়া পাই। সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্ফুটমান তারাপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া বারান্দায় থাকি। ঝরকু একাধিকবার তাড়া দিলে তবে উঠিয়া আহার করিতে যাই। আহারের পরে শয়ন। ছোট কামরা দুটির একটিতে আমার শুইবার ব্যবস্থা। আর একটিতে বসি, লিখিবার কিছু সাজসরঞ্জামও সেখানে আছে।

দুই তিন দিন পরে একদিন জামার পকেটে হাত দিতেই কতকগুলো কাগজ খচমচ্ করিয়া অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া দেখি সম্পাদকের দেওয়া সেই নোটগুলি। সেই নোটের স্মৃতিতে সম্পাদক ও সংসারের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম আর বিলম্ব না করিয়া একটা কিছু লিখিয়া পাঠাইতে হয়, নতুবা সম্পাদক হয়তো এই অজ্ঞের স্থানে আসিয়া পড়িবে, সম্পাদকের কিছুই অসাধ্য নয়।

লিখি লিখি করিয়াও সারাদিন বসিতে পারি নাই, সন্ধ্যাবেলা মনকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিব স্থির ছিল না। একসময়ে ভাবিতে ভাবিতে লিখিতাম, এখন লিখিতে লিখিতে ভাবি চলার বেগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতেই আলো

জলে। ভাবিলাম এই বাড়ী ও মাঠের বর্ণনা দিয়াই আরম্ভ করা যাক না কেন। সরোবরে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা আমার কাজ, তারপরে তরঙ্গবলয় নিজের নিয়মেই ছড়াইয়া পড়িবে। রচনার প্রথম ধাক্কাটি লেখকের অধীন—তারপর হইতে লেখক নিয়মাধীন হইয়া পড়ে যাই হোক, এই মাঠও এই বাড়ীটির বর্ণনার পরিবেশ রচনা করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলাম, এবার গল্পের সূচনা করিবার পালা—কিন্তু গল্পের সূচনার পূর্বেই নিদ্রার রচনা হইল। গল্পের সুচনা করিবার পালা কিন্তু গল্পের সূচনার পূর্বেই নিদ্রার রচনা হইল গল্পের ভার আগামী কল্যের উপর রাখিয়া নিদ্রাজড়িত চোখে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রির দ্বিগুণিত নিস্তব্ধতার প্রান্তে শিবাধ্বনির প্রহর ঘোষণার সঙ্কেতটুকুমাত্র মনে আছে—তারপরে আর কোন সম্বিৎ রহিল না।

ঘুমাইয়া একটি স্বপ্ন দেখিলাম। অবশ্য ঘুমের মধ্যে স্বপ্নবোধ হয় নাই। জাগিয়া উঠিবার পরেই স্বপ্ন বলিয়াই বুঝিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি একটি উৎসব ভাবাপন্ন বাড়ীতে গিয়া যেন ঢুকিয়াছি। চারিদিকে লোকজনের যাতায়াত, আমি সকলকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি বাহির বাড়ী হইতে বাবুদের বৈঠকখানায় গেলাম। তারপরে আরও একটা মহল অতিক্রম করিয়া একেবারে অন্দর মহলে গিয়া পৌঁছাইলাম। দেখিতে পাইলাম যে, পুরস্ত্রীগণের কেহ কেহ নিজেরা সাজিতেছে, কেহ কেহ বা গৃহসজ্জায় ব্যস্ত। তাহারাও যে আমাকে দেখিতে পাইতেছে এমন বোধ হইল না। তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, এই বাড়ীর একটি মেয়েকে বরপক্ষ আজ দেখিতে আসিবে। তাই উৎসবের আয়োজন বটে। এবারে বিবাহের কনেটিকে দেখিবার কৌতূহল হইল। অন্দর মহলের দোতলায় টানা বারান্দা দিয়া চলিলাম—আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া অবধি অধিকার। ঈষন্মুক্ত একটি জানালা পথে দেখিলাম যে, তিন চারজন মিশ্র বয়সের মেয়েরা মিলিয়া একটি তরুণীকে সাজাইতেছে। বুঝিলাম এইটিই বিবাহের কনে। এমন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই, যেন ক্ষীর-

সমুদ্রের চাঁচি। যেমন শুভ্র, তেমনি সুকুমার। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মেয়েটির দুইচোখ হইতে জল ঝরিয়া তাহার দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে। একটি বর্ষীয়সী মহিলা বলিতেছে—মা-ইন্দিরা, আজকের দিনে চোখের জল ফেলে না।

মেয়েটির নাম তবে ইন্দিরা।

ইহার পরেই স্বপ্নের পটপরিবর্তন হইয়া গেল। ইন্দিরার বিবাহ সভা। বরকন্যা মুখোমুখি উপবিষ্ট। বরের চেহারা ভাল লাগিল না। দেখিতে সে সুপুরুষ নয়, কিন্তু সে অভিযোগ আমার নয়। তাহার মুখে চোখে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে আচার-ব্যবহার সব তাতেই কেমন একটা অমার্জিত রুচির আভাস। আর সবচেয়ে বেশী নজরে পড়িল—তাহার সর্বাঙ্গে, চোখে-মুখে কেমন নির্লজ্জ ক্ষুধার ভাব। তাহার পাশে ইন্দিরাকে রজনীগন্ধার কুঁড়িতে রচিত একটি মূর্তির মতো বোধ হইতেছিল। ইন্দিরা নিস্পন্দ, নিষ্পলক, মূর্তিমতী নিষ্পাপ। মনে হইল এ রকম বি-সমের মিলন কখনই সুখের হইতে পারেনা। ইহা কি পূর্বাভাসে ইন্দিরা জানিতে পারিয়াছিল, নতুবা সেদিন তাহার চোখে জল ঝরিয়াছিল কেন, নতুবা আজ তাহার মূর্তি শুভ্র অশ্রু-সমুদ্রের স্ফটিকীভূত পুত্তলির মতো বোধ হইল কেন?

আবার স্বপ্নের পটপরিবর্তন হইল। আমি যেন একটি নূতন বাড়িতে আসিয়াছি। বাড়িটি চেনা-চেনা মনে হইলেও ঠিক কোথায় দেখিয়াছি বুঝিতে পারিলাম না (স্বপ্নভঙ্গের পর বুঝিয়াছি বিরামপুরের বাড়ীটাকেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম)। রাত্রি তখন অনেক। আমি যেন একটা কক্ষের পর্দাটানা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম (পরে বুঝিয়াছি যে আমার বর্তমান শয়নকক্ষটিই দেখিয়াছিলাম)। পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিলাম, ফুলশয্যার বিছানা—কেহ নাই। মনে হইল, এ উচিত হইতেছেনা। ফিরিয়া যাইব কিন্তু অদৃশ্য কণ্ঠের অর্ধশ্রুত স্বর কেবলই কানের কাছে বলিতে লাগিল—"ফিরিয়া যাইও না, ফিরিয়া যাইও না সাক্ষী থাকিয়া যাও।" আমি মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে পূর্ব-দৃষ্ট ইন্দিরাকে

অনুসরণ করিয়া তাহার বর আসিতেছে। লোকটা বলিতেছে, শোবে এসো। বলিতেছে, এখনো কথা শোন। ইন্দিরা বলিতেছে, না, না আজ থাক। বর বলিল, সে কি, আজ যে ফুলশয্যার রাত। ইন্দিরা তবু বলিল, কাল হবে। কাল হবে শুনিয়া লোকটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—জানো, আমি এখন তোমার মালিক; আমি যা খুশি করতে পারি।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—আমাকে তুমি চেনো না। আমি নিজের হাতে অনেক খুন করেছি, আমার বন্দুকের গুলি খুব সিধা চলে।

এ কথায় ইন্দিরা ভয় পাইল বলিয়া মনে হইল না। সে শান্তভাবে বলিল—তবে তাই হোক, তোমার গুলি আর একবার সিধা চলুক, তাতেই আমার শান্তি।

ইন্দিরার উত্তরে লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া প্রস্থান করিল—বোধ হয় বন্দুক আনিতেই গেল। ইন্দিরা একটা টেবিলের উপর বাঁ হাত ভর দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সপ্তমীর চাঁদের আলো জমাইয়া কঠিন করিয়া লইয়া কোন দিব্য-শিল্পী তাহার মূর্তি কুঁদিয়া রচনা করিয়াছেন।

আবার পটপরিবর্তন হইল। এবার কেবল কালের পরিবর্তন স্থানের নয়। আমি পূর্ববৎ সেই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। দেখিলাম, ফুলশয্যার একান্তে ইন্দিরা শায়িতা, নিদ্রিতা, শান্ত, শুভ্র, সুকুমার, নিস্পন্দ তাহার দেহ যেন মন্দাকিনীর খানিকটা জমিয়া তুষারে পরিণত কিছুক্ষণ পরে তাহার বর প্রবেশ করিল পুরুষের এমন নির্লজ্জ ক্ষুধার মূর্তি দেখি নাই। সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—তবে যে বড় বড়াই করা হয়েছিল—আমার শয্যায় শোবে না। এখন তোমার নাকি বন্দুকের ভয় নাই?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ওঃ, ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে। আচ্ছা কি করে ঘুম ভাঙ্গাতে হয় তা দেখাচ্ছি।

এই বলিয়া সে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো শয্যার উপরে, ইন্দিরার দেহের উপরে বলাই উচিত, লাফাইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য আমার দেখা উচিত নয় বলিয়া যতই সরিতে যাই, সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আমাকে বলে—তুমি যাইও না, তুমি যাইও না, সাক্ষী থাকিবার জন্য তোমাকে আনিয়াছি।

লোকটা লাফাইয়া পড়িবার পরমুহূর্তে বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। একি। একি। এ কি হ'ল।

সে একবার ইন্দিরার মুখে, নাকে, বুকে হাত দিয়া অনুভব করিল কোথাও কোন স্পন্দন নাই, আশার কম্পমাত্র নাই। সে ত্রাসে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিলাম, সত্যই বিষম। ইন্দিরার বাহু যে নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া লইয়াছে, সে বাহুপাস হইতে লোকটা আর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না—বরঞ্চ মনে হইল, তরুণীর বাহুলতা লৌহবলয়ের মতো তাহার কণ্ঠ ক্রমশঃ আঁটিয়া ধরিতেছে। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখ-চোখ ক্রমে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দম বন্ধ হইবার মতো হইয়াছে, তাহার আর্তনাদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে স্বর বন্ধ হইবার মতো হইল। এমন সময়ে দপ করিয়া ঘরের আলো নিভিয়া গেল। আমার স্বপ্ন মিলাইল।

পাশ ফিরিয়া তাকাইয়া দেখি—জানালা দিয়া শুকতারার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে। আমি লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। মনে হইল—এ কী দুঃস্বপ্ন। এ কী বীভৎস স্বপ্ন। স্বপ্ন যে এমন প্রত্যক্ষ, এমন নিবিড় হয়, তাহা আগে জানিতাম না। সারাটা সকাল ইন্দিরার ট্র্যাজেডি মনের মধ্যে করুন সুরে গুঞ্জন করিতে লাগিল।

দুপুরবেলা আহারান্তে আমার অর্ধসমাপ্ত গল্পের কাছে গিয়া বসিলাম। খাতাখানা পূর্ববৎ ছিল। কিন্তু পাতা উল্টাইতেই বিস্মিত হইলাম। এ কি। এতগুলো পাতা লেখা হইল কি প্রকারে? আমি তো মাত্র চারখানা লিখিয়াছিলাম। পাতা গুনিয়া দেখিলাম আরও পঁচিশ পাতা কে লিখিয়াছে? কিন্তু লিখিল কে? হাতের লেখা তো আমারই দেখিতেছি। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়াই দেখি না কি লিখিল।

খানিকটা পড়িয়াই ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। এ যে আমার স্বপ্নে—দেখা কাহিনী। গত রাত্রে যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যে-ভাবে দেখিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই লিখিত। আরও আশ্চর্যের এই যে হস্তাক্ষর আমারই। আর ভাষায় যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহাও আমারই। তখন প্রত্যয় হইল—আর কিছু নয়, আমিই স্বপ্নের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া গল্পটা লিখিয়া ফেলিয়াছি। যদিচ এমন অভ্যাস আমার ছিল না, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার নজিরের অভাব নাই। তখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলাম, ভাবিলাম মাঝে মাঝে এমন ঘটিলে মন্দ হয় না। সম্পাদকের একটা দেনা শোধ হইবার পন্থা হয়। গল্পটা পড়িয়া মন্দ লাগিল না। স্থির করিলাম—কালকের ডাকে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিব।

বিকালবেলা স্টেশনমাষ্টারবাবু আসলেন। তিনি কহিলেন, চলুন আজ সুবর্ণরেখার দিকে যাওয়া যাক।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, ওদিকে একেবারে যাওয়া হয়নি। বাড়ীর সামনে একটা মাঠ। মাঠটা উঁচু বলিয়াই নদীর তীর দেখা যায় না। মাঠ পার হইতেই সুবর্ণরেখা চোখে পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ষ্টেশনমাষ্টারবাবু বলিলেন—এদিকে আসুন একটা জিনিস দেখাই। উঁচু তীর হইতে নীচে নামিতেই পাশাপাশি দুটো অনুচ্চ স্তম্ভ চোখে পড়িল। কাছে গিয়া স্তম্ভের গায়ে সংলগ্ন শ্বেত পাথরে খোদিত লিপি দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম।

ষ্টেশনমাষ্টার শুধাইলেন, - চমকালেন কেন ?

—চমকাইনি, হোঁচট খেয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল। শ্বেতপাথরের কালো অক্ষরগুলো ধূর্জটির প্রথম ফুলের মতো চোখের উপরে নাচিতে লাগিল—"ইন্দিরা রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ ফুলশয্যার রাত্রি।" তারপর পাশের স্তম্ভটিতে লিখিত—"ফণীন্দ্র রায় মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ ফুলশয্যার রাত্রি।"

আমি বসিয়া পড়িলাম। আমার স্বপ্নে লেখার থিওরী ধসিয়া পড়িয়া মনটা আবার অভাবিত সমস্যার সম্মুখে গিয়া পড়িল।

স্টেশনমাষ্টারবাবু আমাকে বসিতে দেখিয়া বলিলেন, বলিলেন —ফুলশয্যার রাত্রে বরবধূর একত্র মৃত্যু দেখে বিস্মিত হয়েছেন নিশ্চয় ?

আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—হাঁ।

তবে শুনুন—বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—যে বাড়ীটায় আপনি আছেন, সেখানেই এই ব্যাপার ঘটেছিল অনেক দিন আগে। এখানকার পুরানো লোকদের মুখে এ কাহিনী শুনেছি। আরও শুনেছি যে, এ বাড়ীটা ফণীন্দ্র রায়েরই ছিল। তার মৃত্যুর পরে সেই পাদ্রীসাহেব কিনে নিয়েছে।

—মৃত্যুর কারণ কিছু শুনেছেন ?

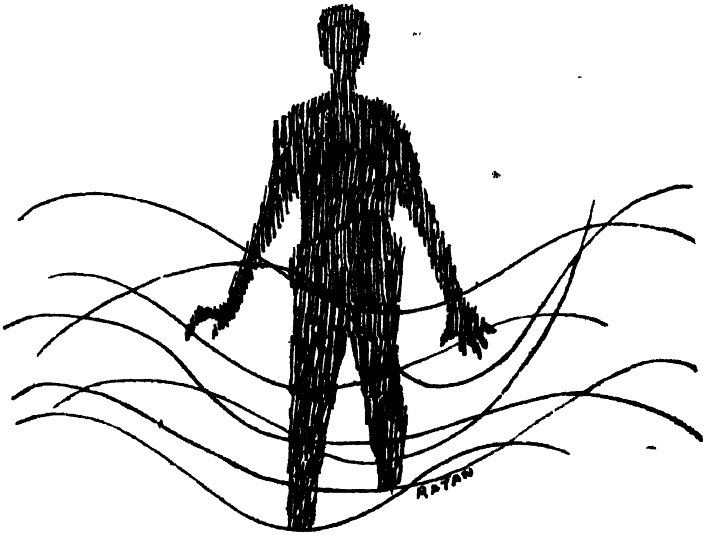
তিনি বলিলেন তা বটে, আপনিই বা শুনবেন কোথাথেকে ? এসব অনেককাল আগেকার কথা।

তারপরে বললেন—চলুন ফেরা যাক। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লুক বের হয়।

দুজনে ফিরিয়া চলিলাম। তিনি ইন্দিরার কাহিনী বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য তুচ্ছ কথা লইয়া পড়িলেন—কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিলনা। আমার মনের মধ্যে ইন্দিরার স্মৃতি একটি অলৌকিক শ্বেত ময়ূরীর মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া ক্রমশঃ অন্য সব বিষয় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। মনে হইল ইন্দিরাই আমাকে তাহার ট্র্যাজেডির সাক্ষী হইবার জন্য করুন আহ্বান জানাইয়াছিল, আমি সরিতে চাহিলেও সরিতে দেয় নাই। তাহার মৃত্যুর সত্যটা আর একটা মানুষকে জানাইবার জন্যই এতকাল তাহার আত্মা যেন আকুলিবিকুলি করিতেছিল। এতদিন পরে হয়তো ইন্দিরা শান্তি পাইল। যখন বাসায় ফিরিলাম, শরতের নৈশ আকাশ ইন্দিরার অশ্রুজলে ছাইয়া গিয়াছে, কত অশ্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ইন্দিরার অশ্রু

মুছিবার নয়, তারাপুঞ্জের অমর ভাস্বরতায় চিরকাল, তাহা জ্বলিতে থাকিবে।

॥ প্রমথ নাথ বিশী ॥ জন্ম ১৯০২ সালে: রাজসাহী জেলার এক জমিদার পরিবারে। বর্তমানে কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করেন ও অবসর জীবনের ফাঁকেও শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা কাজে উৎসাহী সহযোগী। প্রমথ বিশী মশাই প্র, নাঃ, বি, নামেও সমধিক পরিচিত। সব্যসাচী লেখক একদা অক্লান্ত লেখনী সঞ্চালনে বাঙলা হাসির নাটক, রম্যরচনা ও ছোট গল্প রচনায় এক বিশেষ সরস ভঙ্গী অবলম্বন করেন। এছাড়া পণ্ডিত, গবেষক ও সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর অবদান প্রশংসনীয়। লেখকের শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, প্র, নাঃ, বি গল্প সমগ্র শাহিশিরোপা, পরিহাসবিজল্পীতম, ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গবেষণা-ধর্মী বহু লেখা অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রমথনাথ বিশী সেই সব রবীন্দ্র অনুরাগীদের অন্যতম যাঁরা রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের আশ্রমিক হওয়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন।



এখনো

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

অলৌকিক কাহিনী

একই সঙ্গে তিনটি কণ্ঠের আর্তস্বর কানে এসে বাজল আমার। আত্মরক্ষার তাগিদে আকুল কান্না।

একটু আগে সমুদ্রে তিনজনকে ডুবে যেতে দেখে আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলুম। আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ-শিথিল। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছে আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি।

যাঁরা ডুবেছে তাদের জন্য মনে অসহায় প্রার্থনা করছি। ওরা

ভেসে উঠুক, ওরা বেঁচে ফিরে আস্থক। প্রার্থনা করতে করতে মনে হয়েছে আমার ভেতর জলে টইটম্বুর। নিশ্বাস নিতে পারছি না। প্রাণটা বুঝি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে এখুনি। জলে ডোবার কি নিদারুণ যন্ত্রনা।

মাঝ রাতের উদ্ভট স্বপ্নে যখন এই যন্ত্রনা ভোগ করছি আমি, তখুনি বহু দূর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল আমার কানে। ক্রমে এগিয়ে এলো অনেক কাছে। একেবারে কানের পাশে।

ঘুম পাতলা হয়ে আসছিল, তন্দ্রার ঘোরটাও ছুটে গেল। ধরমড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। জোরে জোরে কাঁদছে কারা। গুহার পাথুরে দেওয়ালে-ছাদে ছড়িয়ে পড়ছে কান্না। আমার সর্ব-শরীরেও। গুহার ভেতরে বাতাস ভারী।

অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে যা দেখলুম, তাতে আমার চক্ষু স্থির। প্রভানন্দ, সূর্যশর্মা আর লোচনদাসের মড়ার মুখ। ভয়ে ওরা ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। ওদের আমি যে-অবস্থায় দেখেছি, যে-মুখে দেখেছি, এমন দেখবো—ভাবাও যায় না। দু'চোখের জলে ভাসছে ওরা। এক নাগাড়ে কেঁদেই চলেছে।

চিলকিগড়ে দেখেছি ওদের সৌম্য শান্ত ভাব। এক এক জন যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি। সাধনায় ওরা সবরিপু জয়ী, শোক-দুঃখ তো বটেই। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। যা দেখছি সত্যি, না আগের স্বপ্নের মতো এও আর একটা স্বপ্ন। ঠিক কোন্‌টা—বাঁচাই-বাছাই করে, খুজে বার করার জন্য পাগলের মতো নিজের পায়ে-গায়ে নিজেই হাত বুলিয়ে দেখছি বারবার। আমি নিথর পাথর না স্বপ্নের মানুষ, না রক্তমাংসের ?

প্রাণভয়ে গুহার মধ্যে ওদের ছুটোছুটি আর দাপাদাপির সময় ধাক্কা খেয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলুম। ওদের শান্ত হতে বলেছি; কারণ জানতে চেয়েছি। শান্ত হয়নি ওরা। বরং আরো অশান্ত হয়ে উঠেছে তিনজনে। কারণ দেখিয়েছে গুহার বাইরে আঙুল দেখিয়ে।

—ওখানে অনেক লোকের ভিড়। ওরা তারই—প্রভানন্দের দলের লোক। দীর্ঘদিন ধরে তাকে তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে। ছায়ার মতো অনুসরণ করে এখানে এসে যে উপস্থিত হবে সবাই প্রভানন্দের ধারণার রাজ্যে এ-চিন্তা একেবারের জন্য উকি মারেনি কখনো কোনদিন ওরা তাকে ধরে শেষ করে ফেলার তাক খুঁজছে।

মৃত্যুসাজা পাবার অভিধানে সত্যিই কি প্রভানন্দ দোষী আসামী? না, না, না। প্রভানন্দ চিৎকার করে বলে উঠল।

আমীর বানাবার আশা দেখিয়ে ওরা তাকে দলে টেনেছিল। নির্জন রাস্তার ধারে একা মানুষদের চরম দুর্গতি ক'রে ছেড়েছে ওরা। প্রাণ কেড়ে নেবার ভয় দেখিয়ে কপর্দকশূন্য করা যাকে বলে। নাম-না-জানা তরুণীটি নিজের গায়ের যত গয়না এক এক ক'রে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে। দিতে চায়নি স্রেফ একটি। এয়োতির চিহ্ন। বিয়ের রাতে স্বামীর পরানো সোনা-বাঁধানো বা হাতের লোহা।

অসুরের হাতে দেবীরও লাঞ্ছনা ঘটে নাকি? এ ক্ষেত্রে ঘটল। তরুণীটির শক্ত মুঠো আটকাতে পারল না। চারজন জোয়ানের ইস্পাত-কঠিন মুঠোর চাপে তা আলগা হয়ে গেল।

তরুণীটি কাঁদেনি। কিন্তু লোহা খুইয়ে বাঁদিকের বুকটা ডানহাতে সজোরে চেপে ধরে বসে পড়েছে। ওর ফর্সা মুখখানা নীল হয়ে উঠেছে।

প্রভানন্দের ভেতরটায় মোচড় দিচ্ছে। বিধবা দিদির মুখ ভেসে উঠছে চোখের সামনে। নিজের মনকেই প্রশ্ন করল প্রভানন্দ, মানুষ এত অমানুষ হ'তে পারে! সে এ দলে থকেবে না, কিছুতেই না।

সে 'না 'বললে কি হবে, দলের লোক ছাড়বে কেন? দলছাড়া প্রভানন্দকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার মতলব আঁটতে লাগল ওরা। প্রভানন্দ দলের বিভীষণ। ওদের গোপন ডেরা, অন্ধকার রাতের কার্যকলাপ প্রকাশ করে দিতে পারে। কন্টক নির্মূল ক'রে ফেলাই ভালো।

সহর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে প্রভানন্দ বিহারের সীমানায়। মেদনীপুরের শাল-জঙ্গল ঘেরা লাল কাঁকরের রাস্তায়। ডুলুঙ নদীর ধারে চিলকিগড়ে।

হাঁটুজল ভেঙে ডুলুঙ নদী পেরিয়ে ওপারে গেছে। আরো জঙ্গল আরো নির্জন। লোকালয়ের বাইরে অজ্ঞাতবাসের সুবিধে। দেখেছে, লোকালয় নেই বটে, কিন্তু আছে অশ্ববাহিনী কনকদুর্গার মন্দির। এ মন্দির বেশী দিনের নয়। বছর একত্রিশ-বত্রিশের। দুশো-আড়াইশো বছরের মন্দিরটি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে।

চতুর্ভুজা কনকদুর্গা রাজা কমলাকান্ত ধবলদেবের বংশধরদেরই। দেবী আর মন্দিরের ইতিহাস পূজারী শোনালেন প্রভানন্দকে। দেবীর প্রসাদে পেটের খিদে মিটেছে প্রভানন্দর। দেবীর কাছে প্রার্থনা করছে প্রভানন্দ, 'আর যেন পাপের পথে না ফিরি মা।'

মন্দিরেই আলাপ হল কুলাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী লোকাচারীর সঙ্গে। প্রভানন্দকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। পরে সন্ন্যাসও দিয়েছেন। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মড়ার মাথার গাঁথুনির ঘরে দিনের পর দিন থেকেছে গুরু-শিষ্য—লোকাচারী আর প্রভানন্দ। কথায় কথায় শিষ্যকে বুঝিয়েছিল লোকাচারী, ঘরের ছাদ দেয়াল, মেঝে—সবই মড়ার মাথার। দেহের এই পরিণতি চিন্তা করতে করতে দুর্দান্ত মানুষও শান্ত হয়ে আসে। মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি ষড়রিপুর দমন হয়ে যায় নিজের অগোচরেই। এটা সাধনপথে এগোনোর মস্ত সহায়।

এমন উপদেশবাণী যাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, সেই কুলাচারীই প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেছেন নেপালের এই গোঁসাইকুণ্ড পাহাড়ে আসার সময় তাঁর তিনজন শিষ্যকে মাথায় হাত দিয়ে। প্রভানন্দ, সূর্যশর্মা আর লোচনদাস—তিনজনই গুরুর অভয় নিয়ে তীর্থযাত্রা শুরু করেছে আমার সঙ্গে।

এদের সঙ্গে আমার আলাপ দুর্গাপুজোর নবমীর রাতে। মন্দিরে হাঁড়ির মধ্যে বড় বড় প্রদীপ জ্বলছে। দেবীর অঙ্গে বেনারসী শাড়ী, হাতে গয়না, মাথায় মুকুট। ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে শ্রীচরণ থেকে

কণ্ঠ অবধি। নিঝ্ঝুম রাত। ছাগ বলি হল খড়োর ঘায়ে নয়, হাতের আঘাতে দম বন্ধ করে দিয়ে। বলির ছাগলের মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরুনোও নিষেধ। বিনা রক্তপাতে বিনা আওয়াজের এমন বলি কোথাও হয় কিনা জানি না।

পূজো শেষে লোকাচারী তাঁর মড়ার ঘরে—সাধনার ঘরে—নিয়ে এসেছেন আমায়। অমায়িক হাসিখুশি সন্ন্যাসী। ওঁর তিন শিষ্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার। বললেন, 'প্রথম এসেছে প্রভানন্দ। তারপরে আসে উত্তরপ্রদেশ থেকে সূর্যশর্মা। ও সূরজ নাম বলেছে। আমি সূর্য বলেই ডাকি। উচ্চারণে যাই থাক, মানে তো একই।' দন্তহীন মুখে একগাল হেসে বলেছেন, 'লোচনদাস অনেক পরে'।

বিদায় দেবার সময় ওঁকে ঋষির মতো দেখাচ্ছিল। ফুরফুরে হাওয়ায় মাথার তুষারশুভ্র চুল উড়ছে। এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়ার সময় ঘাড়ের চুল দুলছে। থিরথির করে কাঁপছে গোঁফদাড়ির চুল। খালি পা পরণে গেরুয়া আলখাল্লা। দু'হাতে দুটি প্রদীপ ধরা। উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক, শুভ হোক .....'

বুকভরা প্রশান্তি নিয়ে চিলকিগড় থেকে বলতে গেলে লোকাচারীর কাছ থেকেই, আমাদের যাত্রা শুরু।

আমাদের কোন অমঙ্গল হ'তে পারে—স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু বিপদ তো এসে গেছে গুহার বাইরে। তার দলবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই দুর্গম পাহাড়ে এসে হাজির হয়েছে। আমি বিস্ময়াবিষ্ট!

বাইরে বেরুনোর পথ নেই। ভেতর দিক দিয়ে পালানোর রাস্তা নেই। ভয়ে মানুষের মতিভ্রম, দৃষ্টিভ্রম হয়। প্রভানন্দেরও তাই হয়েছে। ভেতর দিকে দৌড়তে গিয়ে পাথুরে দেয়ালে কপাল ঠুকে রক্তারক্তি। কখনো মুখ থুবড়ে পড়ছে, পাথরের মেঝেয়, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। একা প্রভানন্দের নয়, সূর্যশর্মা, লোচনদাসেরও এক অবস্থা।

শিল্পী সূর্যশর্মার জগৎ থেকে সবচেয়ে যে বস্তুটি সুন্দর সেটি কেড়ে নিয়েছে দুশমন জিৎ সিং। আবার এসেছে সুরজকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে মারতে।

সূর্যশর্মা যে জন্য দেশান্তরী, সর্বত্যাগী, সেই দৃশ্য দেখতে হচ্ছে আবার তার প্রাণাধিক কোহিনুরের নির্যাতন! অপরূপা কোহিনুরের কংকালসার চেহারা, চোখের জ্যোতি ম্লান কাঁচা সোনার মত রংয়ে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। আর দানবটার কি হাসি!

কোহিনুরের বাপ-মাকে অনেক নিষেধ করেছে সূর্যশর্মা বিয়ে দিতে। বলেছে, এ-মেয়ে দেবী। স্বপ্নের পারিজাত ফুল। মানুষের সঙ্গে বিয়ে এর সইবে না মোটে। বিশেষ করে দানব-প্রবৃত্তির মানুষের সঙ্গে।

মা-বাপ সূর্যশর্মাকে বিয়ে করতে বলেছে। রাজী হয়নি সুরজ। কোহিনুরকে স্পর্শ করা চলবে না কারো।

অন্য জায়গায় চেষ্টা করছে বাপ-মা।

খোঁজ করে করে সেখানে গিয়ে, নানা কথা বলে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে সূর্যশর্মা। জানতে পেরে মা-বাবা সরিয়ে নিয়ে গেছে মেয়েকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেবার জন্য।

বিয়ে হয়ে গেছে শুনে কি বুক চাপড়ে কান্না সূর্যশর্মার! মুখে কেবল একই কথা—বিধাতার গড়া অমন নিখুঁত প্রতিমা চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেল।

দিনের পর দিন কোহিনুরকে দেখে ছবি এঁকেছে কত সুরজ। প্রতিবেশীরা তার সৌন্দর্য-জ্ঞানটা বুঝল না। তাকে পাগল-অসৎ চরিত্রের মানুষ ভেবে তার পিছনে লাগল।

সূর্যশর্মা পালিয়ে এল লোকচারীর আশ্রয়ে নিদারুণ মনোকষ্ট নিয়ে। সন্ন্যাসদীক্ষাও নিল তাঁর কাছে মনের জ্বালা জুড়াতে।

কিন্তু রেহাই নেই, এতদূরেও দুশমন এসে হাজির। নিজে এলেও ক্ষতি ছিল না। সঙ্গে এনেছে কোহিনুরের প্রেতাত্মাকে।

ওদিকে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে লোচনদাসের কর্তার ছেলেরা।

গুহা তো তাদের জমির আওতায় পড়ে না। তবুও তারা লাঠিসোটা নিয়ে এসেছে ওকে মেরে তাড়াবে বলে।

ওরা লোচনদাসকে চোর বলে মারধোর করে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

ভাগ্যের দোষে লোচন না হয় চাকরের ছেলে হয়ে জন্মেছে। কিন্তু কাজে তো কখনো কারো ভালো ছাড়া খারাপ করেনি। কর্তার ছেলেদের পর ভাবেনি কোনদিন। কর্ত্তা আর কর্ত্তামাকে নিজেরই বাবা-মা জ্ঞানে দেখে এসেছে।

যতদিন ওরা ছিলেন, বেশ চলছিল। তাঁদের সন্তানের মতই স্নেহ ভালবাসা পেত লোচন। কোন প্রভেদ ছিল না। ওঁরা গত হবার সময় লোচনের নামে কিছু জমি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটাই তার কাল হল। প্রথমে কর্ত্তার ছেলেরা তাকে নানা লোভ দেখালো জমিটা দিয়ে দেবার জন্য। তাতে কাজ না হলে 'চোর' অপবাদ দিয়ে মারধোর করে বাড়ী থেকে বার করে দিল।

খুব আঘাত পেয়েছিল লোচনদাস। যত না দেহে, তার বেশী মনে। যাদের আপন ভেবেছিল, তারা হল পর। সে হল চাকর। চিরদিনের মত ওড়িশা ত্যাগ করে মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকলো লোকচারীর ডেরায়।

লোচনদাসের মনের ব্যথা ভোলার জন্য সন্ন্যাসব্রত দিয়েছেন তাকে লোকাচারী।

কিন্তু সন্ন্যাস নিয়েও তো রেহাই নেই লোচনের। আগের ব্যথা বিভীষিকার রূপ ধরে ঘোরাফেরা করছে চোখের সামনে। অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে লোচনদাস।

প্রভানন্দ আর সূরজেরও একই অবস্থা!

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না সন্ন্যাস নিয়েও কি এরা নিজেদের অতীত ভুলে যাবার, নিজেদের সংযত করার অভ্যাস করেনি? করলে, এমন হবার কথা নয়। এত উঁচু পাহাড়ে উঠে এমন বিপদের মুখোমুখি পড়তে হয় অনেক সময় অনেককে।

নিজেদের ভেতরের জমা ক্ষোভ আর প্রবৃত্তির প্রতিফলন দেখছে

এরা তিনজনে। তাকে প্রকৃত ভেবে যন্ত্রণা ভোগ করে করে মারাও যেতে পারে এরা। আমার একার সাধ্য নেই এদের এক একজনকে নিচুতে টেনে নিয়ে যাই। নিচুতে নামলেই এদের প্রভাব কেটে যাবে জানি। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

আমি নিরুপায়।

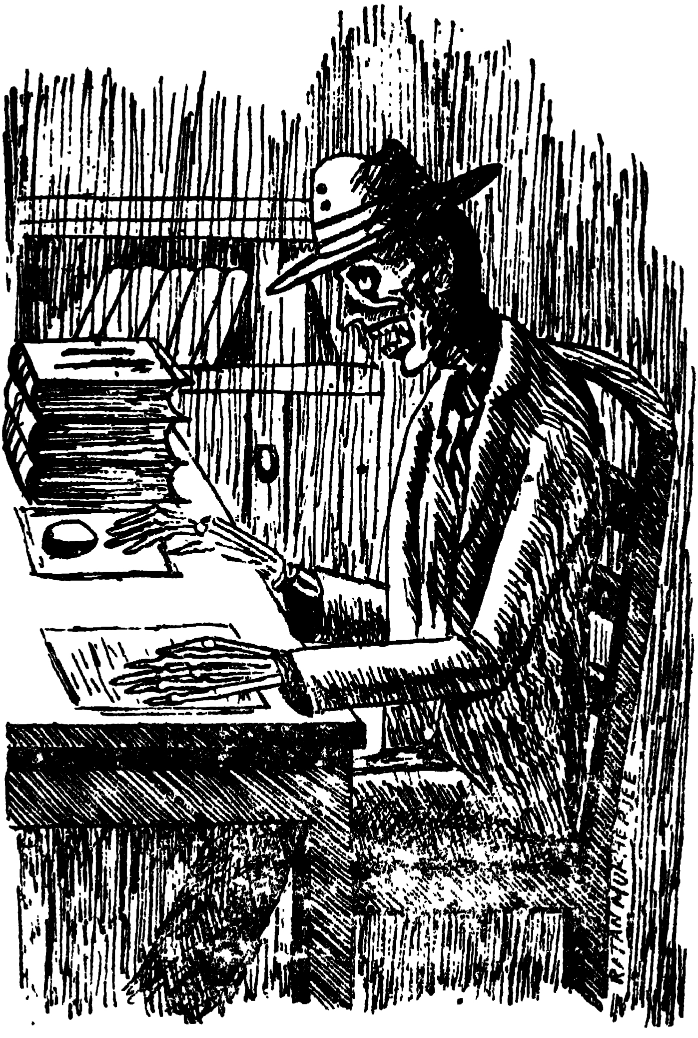
তখন একমনে প্রার্থনা করতে লাগলাম। কোন শক্তি যদি কোথাও থেকে থাকো, এদের বাঁচাও!

কতক্ষণ প্রার্থনা করেছি, জানি না। চেতনা ফিরে পেলুম আমি কার অস্তিত্ব অনুভবে। কোন রক্তমাংসের শরীর দেখিনি, অনুভব করেছি শুধু দীর্ঘদেহীর অস্তিত্ব। সে অস্তিত্ব ওদের তিনজনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল যেন। মন্ত্রের মতো কাজ হ'ল। ওদের উন্মত্ত ভাবের উপশম হয়ে গেল নিমেষে। ওরা আগের মত শান্ত হয়ে গেল।

অস্তিত্ব গুহা থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। এমনই আকর্ষণ তার যে ওরা তিনজন আর আমি তার পিছনে-পিছনে বেরিয়ে এলাম।

সে অস্তিত্ব নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে! আমরাও নামছি। খানিক পরে ওদের মুখের দিকে তাকালাম। শান্ত সুন্দর ঋষির মুখ যেন প্রত্যেকের।

॥ তারা প্রণব ব্রহ্মচারী ॥ অলৌকিক কাহিনীর প্রতি আমাদের যুগসঞ্চিত আগ্রহ ও কৌতুহল। তবে আমাদের সাহিত্যে ভৌতিক আখ্যান কেন্দ্র করে সফল গল্প খুব বেশী নাই। তারা প্রণব ব্রহ্মচারী মশাই তাঁর ব্যক্তিগত তন্ত্র ও ভৌতিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উপাদেয় ও কৌতুহল উদ্রেককারী রহস্য ও অলৌকিক কাহিনী উপহার দিয়েছেন। তাঁর রচনায় রহস্যের ঘনীভূত জাল ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে হয়ে পাঠককে এক তীব্র-সংশয়দীর্ণ সম্মোহনের শীর্ষে আরোহণ করায়। লেখকের অশরীরী, আজও যা ঘটে ইত্যাদি কাহিনী আমাদের সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন)



গারষ্টিন প্লেসে সাহেব ভূত

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

১৯২৭ সাল। ২৪শে আগস্ট। কলকাতা বেতার স্টেশন ব্যবসায়িক ত্তিতে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি গারস্টীন প্লেসের একটি বাড়ীতে থম বেতার স্টেশন গড়ে তোলেন।

প্রকৃত পক্ষে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী ভারতী
অনুষ্ঠানগুলি চালাতাম বাকি সবই ইউরোপীয়। লালমুখো সাহেব।
এই গারস্টিন প্লেসে যে বাড়ীটি ছিল তার দোতলা
তিনতলাটি আমরা ব্যবহার করতাম। তার একতলায় ছিল একা
সাহেবী দোকান। বিলিতি—সুধারস পাইকারি হিসাবে ওরা চাল
দিত।

সেটি একটি অফিস মাত্র। পাঁচটার পর থেকে অফিস ব
হয়ে যেত। কয়েক বছর পরে অবশ্য সেই কোম্পানিও ওখান থে
চলে গেল। আমরা একতলাও পেয়ে গেলাম।

গারস্টিন প্লেসের এই বাড়ীটি ছিল খুব নির্জন। সাহেবী কায়দ
বাড়ী। আশপাশে কোন গোলমাল ছিল না। একতলা থে
তিনতলা পর্যন্ত একটি কাঠের চকচকে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে
পাছে শব্দ হয় তার জন্য ম্যাটিং দেওয়া ছিল সিড়িটায় সকল
সন্তর্পণে উঠতে হ'ত। লোক আসতো বটে, তবে সন্ধ্যার পর থে
নির্জন—ডালহাউসির সব অফিস বন্ধ। আমাদের পেছনের দি
সেন্ট্ জর্জ গীর্জের বিরাট উদ্যান। তার মধ্যে একটি স্থান—সমাধি
স্থল। বেতার ষ্টেশনের দোতালার পেছন দিকে একটি বারান্
ঘেরা বিরাট ছাদ। রবিবার সন্ধ্যায় চার্চে অর্গ্যান বেজে উঠত
গম্ভীর স্বরে সমবেত ভক্তবৃন্দের অপূর্ব প্রার্থনা সঙ্গীত আসতো ভে
—আমরা অবসর সময়ে ঐ ছাদে পায়চারি করতাম আর ঐ গ
শুনতাম।

বেতারের ষ্টুডিওতে গান, বাজনা, বক্তৃতা চলতো প্রতিদিন
এক এক জনের ওপর এক একটি ভার। রাত দশটার পর সব
ছুটি।

তখনকার দিনের বেতারে অত্যন্ত শৃঙ্খলা থাকত—নীরবতার ম
দিয়ে সব কিছু চলত। ইউরোপীয় সাহেবরা ছিলেন সংখ্যায় বেশি
বাঙালীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় আমরা কয়েকজন। আমাদের ভারতী
অনুষ্ঠানের মূল কর্তা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। বেতার
জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করতে

ার মধ্যে আমিও তাঁর সহকারিত্ব করতাম। রাইচাঁদ বড়াল, াজেন্দ্রনাথ সেন এরাও বিভাগীয় কর্তা ছিলেন।

আমাদের ষ্টেশন ডিরেক্টর প্রথম পরিচালক ছিলেন মিঃ ডব্লু, য়ালিফ্‌! মতান্তর হওয়ায় তিনি অফিস ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে ারপর এলেন মিঃ জে, আর, স্টেনটন, খুব কড়া লোক।

একদিন আমি, নৃপেনদা, রাজেনদা প্রভৃতি প্রোগ্রাম নিয়ে ালোচনা করছি! এমন সময় আমাদের এক ঝাড়ুদার এসে বললে, জুর, কাল রাত দো বাজে বড়া সাব আয়া থা। ম্যয় তো খাটিয়া সকে ছুতল্লা সিঁড়ি কা পাশ ঘুমতা থা। সাব খাটিয়া টানকে রমে হটা দিয়া। হমারা নিদ্‌ টুট গিয়া থা সাব কিছু বোলা নেই, ট্‌গট্‌ করকে তিনতলা মে উঠ গিয়া।

এক ঘণ্টা, দো ঘণ্টা খাড়া হোকর উপরমে উন্‌কো পাত্তা মিল্‌না। য়াস্তে ম্যয় উঠা থা। উহা পর গিয়া দেখা, চাবি বন্‌ধ হ্যায়। সাব াহাসে চলা গিয়া হুজুর। মালুম হুয়া নেই।

কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। ভাবলাম গাঁজা খেয়ে বেটা প্ন দেখেছে বোধ হয়। নেপেনদা বললেন, আচ্ছা যাও, সাবকো ায় পুঁছে গা। সে চলে গেল। আমরা খুব হাসলাম।

বড় সাহেবকে নেপেনদা জিজ্ঞাসা করলেন কাল রাত দুটোর সময় ষ্টশনে আপনি এসেছিলেন নাকি?

স্টেপলটন সাহেব ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, কে বললে?

নৃপেনদা জমাদারের উক্তিটি বলতে সাহেব হেসে বললেন, ও বেটা নিশ্চয় নেশা করেছিল তাই কিছু দেখেছে নেশার ঘোরে।

নৃপেন দা মৃদু হেসে বললেন, ভুতটুত ও তো হ'তে পারে? এ জায়গাটা তো নিঝ্‌ঝুম। সাহেব হেসে বলে উঠলেন, অল রাবিশ্‌।

এই নিয়ে আমাদের মধ্যেও খুব কৌতুক বোধ জেগে উঠল, ভাবলাম, এই খবরটা সবাইকে দিই। কিন্তু নৃপেনদা বারণ করলেন। বললেন, দেখ, লোকে ভয় পেয়ে যেতে পারে। চুপ্‌চাপ থেকো।

চুপচাপই ছিলাম। হঠাৎ একদিন আমি তিনতলায় নিজের ঘরে বসে ফাইল দেখছিলাম। রাত তখন ৮টা। সারাদিন খেটে খুটে

এ যাতনায় আলো নিভিয়ে ওপর থেকে কাঠের সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে এসে মনে হল, ফাইলটা নিয়েই যাই। বাড়ীতে এ দেখবো।

এমন সময় ষ্টুডিও বেয়ারা মেহেরবান একটা ষ্টুডিওতে যাচ্ছে তাকে ডেকে বললাম, মেহেরবান একটা কাজ করবে বাবা ?

হাঁ হুজুর।

বললাম, তিনতলায় আমার ঘরে টেবিলের উপর একটা ফাইল রেখে এসেছি, আবার তিনতলায় উঠতে পারছিনা—একটু কষ্ট ক'রে নিয়ে এসনা বাবা !

কোমল স্বরে মানুষকে ব'লে অনেক কাজ করানো যায় তাই মেহেরবান আমার মিষ্টি কথা শুনেই ধীরে ধীরে তিনতলায় উঠে গেল।

তার যাবার ঠিক তিন মিনিট পরেই দুম্-দুম্ সিঁড়িতে কে যে লাফাতে লাফাতে নামছে। আমি বুঝতে পারিনি। দশটা করে সিঁড়ি বাদ দিয়ে যে গোটা চারেক লম্ফ দিয়ে ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে একেবারে সিঁড়ির সামনে এসে হাজির। ভয়ে থর্-থর্ ক'রে কাঁপছে। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী হয়েছে, এত কাঁপছ কেন? কিছু কথা বলতে সে ঢোক গিলতে লাগল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, আরে- বাবা॥—আপনার ঘরের বাইরে যে চলার পথটা রয়েছে, আমি সেখানে আলোর সুইচ্ টিপে টিপে যাচ্ছিলাম—আপনার ঘরে আপনি আলো নিভিয়ে এসেছিলেন তাই- অন্ধকারে ঘরে ঢুকে আপনার সুইচ্ বোর্ডে সুইচ্ টিপতেই দেখি, একজন লম্বা সাহেব একটা লম্বা হ্যাট্ পরে আপনার ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে মাথা নীচু ক'রে পড়ছে। এই দেখেই আমার মনে হ'ল সাহেবটা বোধ হয় আমার ঘাড়ে এবার লাফিয়ে পড়বে। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতুম। আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবার জন্যে বোধ হয় শক্তি দিলেন—আমি জান রক্ষে করতে কি ক'রে যে এত সিঁড়ি লাফাতে পারলুম তাঁরই কৃপায়। বাপ রে

াপ্। এ বেটা জীন। ভূত। রাত্তিরে আর জন্মে তিন তলার
ুপরে উঠবো না।

আমি ওর ভয় দূর করার জন্যে মৃদু হেসে বলে উঠলুম, আরে
ুর, ও ভূতটুত কিছু নয়।

এ কথা শুনে মেহেরবান আমায় চ্যালেঞ্জ ক'রে ব'লে উঠল, চলুন
ুপরে, দেখুন সেই ঘরটায় এখনও আলো জ্বলছে। আমি একটু দূরে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবো—আপনি আপনার ঘরে গিয়ে দেখে আসুন
া। ঘরটায় নিশ্চয় এখনও আলো জ্বলছে আসুন!

আমি তখন নিজেই ঘোল খেয়ে গেছি। কিন্তু মেহেরবানের
ঙ্গে ওপরে ওঠবার সাহস পেলাম না—'মৌনেন মারিতং জগৎ' ক'রে
য়ে ভয়ে স'রে পড়লুম।

কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না যে ভূত আছে। একবার সাহস
দখাচ্ছি আবার বুকটাও দুরু-দুরু করছে। তবে ভূতের প্রচারটা
াপা গেল না। অনেক ঘটনা এখানে ঘটেছে। সবার কথা বলতে
গলে একটা বই লিখতে হয়। সংক্ষেপে আমি একটা ছোটো ঘটনা
লছি।

আমাদের কলকাতা স্টেশনে এক সময় প্রভাত মুখোপাধ্যায় কাজ
রতেন। আমার বিশেষ স্নেহস্পদ। বর্ত্তমানে তিনি ফিল্ম নিয়ে
াজ করেন, পরিচালনা করেন। যাই হ'ক, একদিন বর্ষার সময়
একতলার পেছনের দিকে রিহার্শেল রুমে বসে বই পড়ছেন। বেলা
শেষ হয়ে গেছে— সন্ধ্যে ছ'টা। আলো জ্বেলে পড়ছেন। আমাদের
ারস্টিন প্লেসের পেছন দিকে সেই গির্জে—আর আমাদের ঘরের
পছনটায় রেলিং দেওয়া জানলা—তারের জাল বসানো। বাইরে
াগান দিয়ে যাতে কেউ না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা আছে।

প্রভাতকুমার বই পড়তে পড়তে বাগানের দিকে মুখ তুলে
একবার চেয়েছেন, সেই সময় দেখতে পেলেন, এক দীর্ঘদেহী সাহেব
াথায় টপ্ হ্যাট, আগেকার দিনে বড়বড় সাহেবরা ঐ কালো
ম্বা হ্যাট—মাথায় পরে যেতেন, সেইটে পরে ঘরের দিকে বর্ষার
জল মাথায় নিয়ে জানালার কাছে আসছেন। প্রভাত বিস্মিত

নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে ভয় খেয়ে গেলেন। সাহেবকে দেখেই তিনি দরজার দিকে এগোবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ সাহে যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে জালঘেরা রেলিং দেওয়া জানলার তারে দু হাত চেপে দাঁড়িয়ে গেলেন।

প্রভাত কোন রকমে ধীরে ধীরে পিছিয়ে দরজাটা খুলতেই সাহে ভূত ঘরের মধ্যে ঢুকে হাতছানি দিয়ে কি যেন বলতে এলেন প্রভাত তাঁর বলার অপেক্ষা না করেই প্রায় জ্ঞান হারা হয়ে দরজাট খুলেই দ্রুত করিডর পেরিয়ে একেবারে একতলার ষ্টুডিওর সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি আর একতলার ঘরে কখনও একা দাঁড়াতেন না।

ছোটখাট অনেক ঘটনা ঘটেছে। তবু আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি যে ভূত আছে। সব ঘটনা বলতে গেলে অনেক ঘটনা তাহলে হয় বলতে সেটা সম্ভবপর না। একটা যে উপন্যাস হয়ে যাবে আর একটা ঘটনা বলছি।

একজন ঘোষক রাত্রে ইউরোপীয় প্রোগ্রামে রেকর্ড বাজাতো দোতলায় একটা ঘর ছিল—লম্বা করিডর দিয়ে ষ্টুডিওতে ঢুকতে হয় নীচে থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ড নিয়ে ষ্টুডিওতে ঘোষকরা যাবে তিনটি ঘর আছে, একটা খালি ঘরে আর্টিষ্টরা বিশ্রাম নিতে পারে একটা গোল টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার বসার জায়গা।

কাঁচের আড়াল সব ষ্টুডিওতে। ঘোষক যন্ত্র চালাতো একটা ষ্টুডিওতে বসে। সব দিকটা দেখতে পারত। তার হাতে ষ্টুডিওর চাবি কাঠি। রাত ন'টা বেজে গেছে। নীচের ষ্টুডিওগুলিতে গান বা বাজনা চলছে। ওপর নিস্তব্ধ। ষ্টুডিওর পরিচালকরা একটা কাজ করে, আর ষ্টুডিও যখন চলছে, তখন কয়েকজন সহকারী ব্যবস্থাপক দেখাশোনা করে। আর্টিষ্টদের সুবিধা অসুবিধা, ঘোষকদের অভিযোগ অনুযোগ সব শুনে ব্যবস্থা করে দেয় ব্যবস্থাপকরা।

আমি সেই রাত্রে, রাত দশটার সময় নীচে মিঃ দাশগুপ্তর সঙ্গে গল্প করছি। হঠাৎ দোতলার একটা ষ্টুডিও থেকে টেলিফোন বেজে উঠল। দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন কি চাইছ?

একটি কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—শিগ্‌গির আসুন। দাশগুপ্ত বললেন, বীরেনদা আপনি একটু বসুন। ঘোষক ব্যানার্জী বোধ হয় কিছু সাংঘাতিক মূর্তি দেখেছে। আপনি চলে যাবেন না যেন। ফাইল কন্ট্রাক্ট, চেক পড়ে আছে এই বাক্সে, দেখবেন।

বলেই সে ওপরে চলে গেল। আমি শেষ পর্যন্ত বসেই রইলুম। ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘোষক ব্যানার্জী ও দাশগুপ্ত নেমে এল। সে যে ঘটনা বললে—তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।

আমি আগেই বলেছি চার্চের দিকে একটা বিরাট ছাদ আছে। তারপরেই একটা ঘর—সেটায় আর্টিষ্টদের বিশ্রাম নেবার জায়গা। সেই টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ার থাকে। ব্যানার্জীর ষ্টুডিওর ঠিক সামনা সামনি একটা রুদ্ধ দ্বার ষ্টুডিও। একেবারে সামনা সামনি। মধ্যস্থলে বিশ্রাম কক্ষ। ব্যানার্জী সিগারেট ধরিয়ে বগলে চেপে নিয়ে চলেছে কতকগুলি বড় রেকর্ড। ঐদিনে রাত্রে বাজাবে বলে। মুখের সিগারেটের শেষ টানটি সেরে সেটা ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ষ্টুডিওতে ঢুকতে যাবে, এই সময় হঠাৎ সে ফিরতেই দেখলে সেই গোল টেবিলটার একটা চেয়ার চর্কির মত রাউণ্ড দিয়ে ঐ ষ্টুডিওর বিপরীত দিকের দরজায় উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদিকে টাইম হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ সে কোনমতে কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো শেষ করেই রেকর্ডটা ডিস্কের ওপর চালিয়ে দিলে। রেকর্ড বাজতে লাগল।

এরই ফাঁকে ষ্টুডিওর সঙ্গে নীচের অফিসে ফোন করা যায়। তখুনি ফোন তুলে সে দাশগুপ্তকে ডাকলে।

দাশগুপ্ত আমাকে রেখে ছুটে চলে গেল সেই নির্জন দোতলায় স্তব্ধ ষ্টুডিওর মধ্যে। ব্যানার্জী তখন শীতকালেও ঘেমে-নেয়ে গেছে। কি করে তার চোখের সামনে এক অদৃশ্য ভূত চেয়ারটা টেনে বিপরীত ষ্টুডিওর দরজায় উঁচু করে ঠেকিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার নমুনাও সে ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলে।

দাশগুপ্ত দেখলে সত্যিই তো। আশ্চর্য কাণ্ড! আমিও দেখে এলাম ভূতের কাণ্ড কারখানা। তবুও কিছুতেই ভূতের অস্তিত্ব বুঝতে পারলাম না।

তারও কিছুদিন পরে—বেতারের একজন বিশিষ্ট গীটার বাদক অমিয় অধিকারীর যে দুর্গতি ঘটেছিল সেটাও অভিনব। বড় বড় গায়ক গায়িকাদের সঙ্গে সে গীটার বাজাতো। একদিন রাত সাড়ে ৯টা বা ১০টার সময় কোন এক গায়কের সঙ্গে তার গীটার বাজানোর কথা। আমাদের নীচে রিহার্শেল রুম ছিল যেখানে, সেখানে প্রভাত মুখোপাধ্যায় ভূত দেখে ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়েছিল যেভাবে তার চেয়েও বেশি কাণ্ড ঘটেছিল তার জীবনে।

গাইয়ে বাজিয়েদের জন্যে একটা রুটীন টাঙিয়ে দেওয়া হত—রিহার্শেল রুমের কাছে।

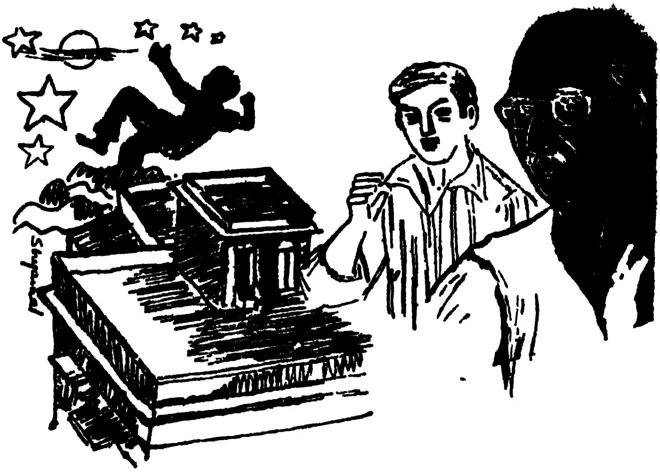
অমিয় রাত ৯টার সময় একা সেইখানে বোর্ডে তার বাজনা কখন কার সঙ্গে বাজাতে হবে সেইটা দেখতে গেছে। রিহার্শেল রুম একদিকে ছিল। আর তার সমান্তরাল আর একটা ঘর চাবি দেওয়া থাকতো। যে ঘরে ইঞ্জিনিয়ারদের যন্ত্রপাতি থাকত। অমিয় প্রায় কাছাকাছি যখন রুটীন দেখতে আসছে, হঠাৎ সে দেখলে ঐ চাবি-দেওয়া ঘরটা থেকে সাহেব ভূত বেরিয়ে এল এবং লম্বা হ্যাট পরে বিরাট দেহ নিয়ে, ঊর্ধ দিকে চোখ মেলে একেবারে গট্‌গট্‌ করে আর একটা বন্ধ রিহার্শেল রুমের দরজা না ঠেলে নিমেষের মধ্যে ভেতরে ঢুকে গেল।

অমিয়র আবার হার্টের রোগ ছিল। তখন তৎসত্ত্বেও সে ঘুরে গিয়ে দরজার কাছে ঘর্মাক্ত কলেবরে নির্বাক হয়ে বসে গেল ওখানে। তখন বেতারের তৎকালীন কর্মী, ছোটদের আসর পরিচালক, জয়ন্ত চৌধুরী তার অবস্থা দেখে কোনরকমে তার শুশ্রূষা ক'রে, গাড়ী পাঠিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। ভাগ্য ভাল—তার হার্ট বন্ধ হয়ে যায়নি, তবে কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে ঘটনাটি সকলকে জানালো।

সেদিন থেকে আমার বিশ্বাস হ'ল যে ভূত আছে। নিশ্চয় আছে। এরা কেউ মিথ্যে বলেনি। ছায়ার মধ্যে দেখেনি—একেবারে চর্ম চক্ষে ভূতের কায়া দেখেছে। যারা যারা দেখেছে তারা কেউ বাজে লোক নয়—বানিয়েও বলেনি।

তাই ভূতকে বাতিল করা যায় না।

॥ **বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র** ॥ ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সাতাত্তর বৎসর বয়সেও বীরেনবাবু আজও অক্লান্তভাবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ধারাকে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন। আকাশবাণীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল জড়িত। বীরেনবাবু স্বনামেও বিরূপাক্ষ নামেও সমধিক পরিচিত। কথকতার ভঙ্গিতে বৈঠকী মজলিস' সৃষ্টি তাঁর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট দিক। তিনি কতকগুলি সার্থক ভৌতিক কাহিনীরও স্রষ্টা। বুদ্ধিদীপ্ত মননের সঙ্গে পরিশীলিত রুচিবোধের এক অপূর্ব মিলন দেখা যায় লেখকের জীবনব্যাপী সাধনায়। আর কলিকাতা আকাশবাণীর বাঙলা আসরগুলির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সাথে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মশাইয়ের নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে ও থাকবে।



মৃতের সহিত সাক্ষাৎ

তুষার কান্তি ঘোষ

সে আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের কথা। আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেটার সত্যকার তাৎপর্য কি, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা যে শুধু সত্য তাহাই নয়, আমি যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহাও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই ঘটনাটি ঘটিযাছিল দিল্লীতে, কুইন রোডস্থিত করোনেশন হোটেলে। ইহা সম্যক বুঝিতে হইলে ইহার কিছুদিন আগের কথা জানা আবশ্যক।

সেদিন সরস্বতী পূজার ভাসান। তখনও আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার নূতন বাড়ি নির্মিত হয় নাই। আমরা তখন ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে থাকি। আমাদের বাড়ির বাগানে সেইদিন বিকালে আমরা কয়জনে ব্যাডমিন্টন খেলিতেছিলাম। আমার ছোড়দাদা

(আমার ঠিক উপরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সেইখানে বেড়াইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের খেলা দেখিতেছিলেন। আমি দেখিতেছিলাম যে, ছোড়দাদার মুখ বড়োই বিষণ্ণ, যেন কি চিন্তা করিতেছেন। দু'একবার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে ছোড়দাদা আমাকে একপাশে ডাকিয়া অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, 'দেখ, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তুই তোর ছোটো বউদিকে আর ছেলে-মেয়েদের দেখা শোনা করবি তো?' আমি এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম ও ছোড়দাদার মন হইতে ঐরূপ ভাব দূর করিবার জন্য বলিলাম, 'কি পাগলের মতো যা-তা বকছো—তুমি হঠাৎ মরতে যাবে কেন, আর আমারই বা তোমার ফ্যামিলিকে দেখবার কি দরকার হল?'

বকুনি খাইয়া ছোড়দাদা তখন চুপ করিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার আমাকে বলিলেন, 'তুই রাগ করিস কেন? মরা-বাঁচার কথা কে বলতে পারে? আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়, তুই এদের দেখবি তো?' আমি রাগ করিয়া বলিলাম, 'না দেখবো না। তোমার মতো পাগলের সঙ্গে আমি বকতে পারি না।'—এই বলিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। কিন্তু হায়, তখন বুঝিতেপারি নাই যে, নিজের জন্য কি শেল প্রস্তুত করিতেছি।

সরস্বতীর বিসর্জন দিয়া রাত্রে আহারের পর অতি ক্লান্ত হইয়া সবেমাত্র ঘুমাইয়াছি, এমন সময় আমার দুয়ারে ধাক্কা পড়িল। দরজা খুলিয়া শুনিলাম যে, ছোড়দাদার হঠাৎ অত্যন্ত হাঁপানি হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ নিচে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'ডাক্তার! আর সহ্য করতে পাচ্ছি না!' তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনা হইল এবং তিনি আসিয়াই ইঞ্জেকশন দিলেন। হায়, তখনও যদি ছোড়দাদাকে আমার মনের কথা বলিতাম! কিন্তু তখনও তো বুঝি নাই আমাদের কি সর্বনাশ হইতেছে। ইঞ্জেকশনের পর ছোড়দাদা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তার পরদিন সকালে কিছু বেলাতে শুনিলাম যে, ছোড়দাদা

তখনও ঘুমাইতেছেন। আমরা ভাবিলাম ইহা মর্ফিয়ার ফল তখনও আমাদের মনে কোনো শঙ্কা জাগে নাই। তাহার পর যখন অনেক বেলাতেও ছোড়দাদার ঘুম ভাঙিল না তখন আমরা ডাক্তার আনিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমার স্নেহময় ছোড়দাদা তখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আর জাগিলেন না, আর কথা কহিলেন না।

বলিতে হইবে কি, আমার হৃদয় ভাঙিয়া গেল। ভ্রাতৃ-বিয়োগের অপেক্ষা আরো বড়ো আঘাত আমার হৃদয়কে খণ্ডিত করিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের হৃদয়কে বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেন ছোড়দাদাকে সত্যকথা বলিলাম না। কেন তাঁহাকে বলিলাম না যে, আমি তোমার সংসার দেখিবো দেখিবো দেখিবো। কিন্তু তখন কে আমার কথা শুনিবে ?

ইহার পর আমার হৃদয় সর্বদাই অনুতাপে দগ্ধ হইত। বারবার ছোড়দাদাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতাম, সেদিন ব্যাডমিন্টনের মাঠে আমি তোমায় মিথ্যা কথা বলেছি। কিন্তু কিছুমাত্র শান্তি পাইতাম না, মন সর্বদাই অবর্ণনীয় ব্যথায় ভরিয়া থাকিত।

ইহার অতি অল্পদিন পরেই আমাকে কোনো বিশেষ কাজে দিল্লী যাইতে হয়। দিল্লীতে বিকালে পৌঁছিয়া করোনেশন হোটেলে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া আমাব রাত্রের খাবার আনিতে আদেশ করিলাম। হোটেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, তখনও খাবাব প্রস্তুত হইতে সামান্য বিলম্ব আছে। সময় কাটাইবার জন্য আমি একখানি বই লইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

খানিক পরে মনে হইল যেন আমার শরীরটি অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ হইতেছে এবং আমি যেন আমার বিছানার উপরে শূন্যে ভাসিতেছি। একটু একটু করিয়া আমার দেহ শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে আরম্ভ করিল। আমার মাথার নিকট যে জানলা খোলা ছিলো তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম— আমার যে এই অবস্থা হইয়াছে এবং আমি যে কিছু অস্বাভাবিক বোধ করিতেছি তাহা আমার মনে হইল না, শূন্যে ভাসিয়া চলা যেন আমার

কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, আমি অতি আরামে ও সহজভাবে যাইতে লাগিলাম।

খানিকটা উর্ধ্বে উঠিয়া একদিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার চারিপাশের আলোকজ্জ্বল অবস্থা অস্পষ্ট হইতে লাগিল। একটু পরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কোথা দিয়া যাইতেছি, এবং কোথায় আমার গন্তব্যস্থান কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!

ক্রমে ক্রমে আমার আশেপাশে আবার অস্পষ্ট আলোক ফুটিতে লাগিল, যেন তৃতীয়া কিংবা চতুর্থীর চাঁদের আলো। ক্রমে আরো একটু স্পষ্ট হইলে আকাশে বহু তাঁরা ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে চাঁদের আলো বাড়িতে লাগিল যেন চাঁদ পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আমি দেখিলাম এক সুরম্য বনপথে অগ্রসর হইতেছি! নির্জন প্রান্তর, নদী, পর্বত ও বন অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে চাঁদের আলো আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য আরো সৌন্দর্যময় হইতে লাগিল। চারিদিকে ফুল ফুটিয়া আছে, ফুলের সুগন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া আছে! সে সৌন্দর্যের বর্ণনা হয় না। আমার প্রাণ মন আনন্দে ভরিয়া গেলো, কিন্তু কোনো জনমানব দেখিলাম না।

একটু পরেই এক নির্জন প্রান্তরে একটি মাত্র সাদা বাড়ি দেখিলাম! সেখানে আর কোনো বাড়িঘর নাই বা সেখানে কোনো গ্রাম আছে বলিয়াও বোধ হইল না। বাড়িটি উঁচু ও ছাদের উপর একটি চিলে কোঠা দেখিলাম। আমি শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে ছাদের পাঁচিল ডিঙাইয়া ছাদে অবতরণ করিলাম। সমস্ত ছাদ পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত কেবল একাংশে সেই চিলে কোঠার ছায়া পড়িয়াছে; দেখিলাম, সেই ছায়াতে ছাদের পাঁচিলে হাত রাখিয়া আমার ছোড়দাদা দাঁড়াইয়া আছেন।

ছোড়দাদাকে দেখিযা বিদ্যুতের মতো আমার হৃদয়ে একটিমাত্র কথার উদয় হইল যে, এই তো ছোড়দাদাকে পাইয়াছি—এখনি কেন

তাঁহাকে আমার মনের কথা বলি না ? আমি ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলাম, 'ছোড়দাদা, ছোড়দাদা, আমি আগে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনো করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

ছোড়দাদা আমার দিকে ফিরিলেন ও হাসিলেন। সে হাসি যে কতো করুণ তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি বলিলেন, 'ওরে তা কি আমি জানি না ভাই!' পরমুহূর্তেই ছোড়দাদা কেমন যেন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'যা, এক্ষুনি ফিরে যা, আর এখানে একমুহূর্তও থাকিস নি।' ছোড়দাদা একথা বলিবামাত্র আমার দেহ প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু করিল ; আমি আর দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম না, আমার দেহ ছাদের পাঁচিল ডিঙাইয়া শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল। ফিরিবার পথ বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ যে পথ দিয়া গিয়াছিলাম সেই পথ দিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম, সেই ফুলবন, ফুলের গন্ধ, নির্জন প্রান্তর, নদ-নদী-পর্বত এবং গভীর আশ্চর্যের বিষয় এই যে চাঁদের আলো যাইবার সময় যেরূপ কম বেশি হইয়াছিল, ফিরিবার সময় উল্টাভাবে, সেইরূপই দেখিলাম। সেই গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিতে হইল এবং অবশেষে হোটেলের জানলা-পথে আমি কামরায় প্রবেশ করিলাম।

সবেমাত্র বিছানায় শুইয়াছি, এমন সময় আমি শুনিলাম, 'এ সাব, আপ্‌কা খানা লায়া।'—হোটেলের চাকর বলিতেছে।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। আমার গমন ও প্রত্যাগমনে কতো সময় লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। বোধহয় মিনিট কয়েক হইতে পারে, ইহা যে কিরূপে হইল, কেন হইল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই।

॥ **তুষারকান্তি ঘোষ** ॥ জন্ম কলিকাতায়। তুষারকান্তি ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর নিকট এক অতি পরিচিত নাম। সাহিত্যিক হিসাবে যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশী সাংবাদিক হিসাবে। আবার সাংবাদিক হিসাবে যতখানি তার চেয়েও অনেক বড় পরিচয় তাঁর সংবাদপত্র গোষ্ঠীর পরিচালক হিসাবে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলির সেদিনের নিরক্ষরতা জর্জ্জর ভারতেও এক অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। আর এই ভূমিকা পালনে যে সকল মানুষ সেদিনের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভারতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন শিশিরকুমারের যোগ্য পুত্র তুষারকান্তি ঘোষ তাঁদের অন্যতম। আজ সংবাদপত্র যে কোন গণতন্ত্রীদেশে "তৃতীয় সরকার" বা Third Government-এর মর্যাদায় আসীন। আর এই মর্যাদার ধারক উত্তর ভারতের এক অন্যতম বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর অধিনায়ক হিসাবে লেখকের অবদানও নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তবে অতি ব্যস্তকর্ম্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে লেখকের সাহিত্যিক প্রয়াশ আরও প্রশংসনীয়।



ভুতুড়ে দোলা

—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

অল্প বয়সে ভূত সম্বন্ধে কৌতুহল-মেশানো ভীতি সবারই থাকে, আমারও ছিল। ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগত বটে, কিন্তু বেশী ভয়ের গল্প হলে বেশ তু'চারদিন গা ছম্‌ছম্‌ করত। মনে মনে তখন বলতুম, 'ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি!' ঠাকুমা ভূতের ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এই মন্তরটা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রমশঃ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার কৌতুহলও জেগেছিল মনে। তখন সত্য ঘটনা ব'লে কেউ ভূতের গল্প বললে, আমি তাকে চেপে ধ'রে

প্রশ্ন করতুম, আপনি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন কি? অনেকেই তখন আমতা-আমতা ক'রে বলতেন, আমি নিজে দেখিনি, কিন্তু—নিজে দেখেছে এমন লোকের মুখ থেকে শুনেছি।

আমার এক বড় ভগ্নীপতি ছিলেন, তিনি খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা ভূতের গল্প শুনতাম। নানা-ভাবে অনেকবার নাকি তাঁর সঙ্গে ভূতের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। তিনি সেই কাহিনীগুলি এমনভাবে গুছিয়ে আমাদের কাছে বলতেন যে, আমরা ভয় পেলেও বারবার সেগুলি শুনতে চাইতাম। একবার তিনি তাঁর পিসতুতো-ভাই-এর এমন একটি ঘটনা আমাদের কাছে বলেছিলেন, যা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি আরও এই জন্যে যে, সেই পিসতুতো-ভাইকে ছোটবেলায় আমরাও দেখেছিলুম এবং এ-কাহিনী যে সত্য তা তিনি নিজেও আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন।

ভগ্নীপতির এই পিসতুতো ভাই ছিলেন তাঁর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁদের 'অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। গ্রামের মধ্যে দোতলা কোঠা বাড়ী ছিল একমাত্র তাঁদেরই। জমি-জায়গায় আয় থেকে সংসারই শুধু চ'লে যেত না, বাড়ীতে দোল-দুর্গোচ্ছব পূজাআর্চাও হ'ত। এই পিসতুতো ভাই-এর বউটি ছিল ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। লক্ষ্মী প্রতিমার মত বউটি শ্বশুরের ঘর আলো করে ঘুরে বেড়াত। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাযত্নে, ঘর-সংসারের কাজকর্মে সকলের মুখেই বউ-এর সুখ্যাতি আর ধরত না! কিন্তু বিয়ের সাত-আট বছর কেটে যাবার পরও বউ-এর যখন কোনো ছেলেপুলে হোল না, তখন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন-থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র ছেলের কোনো ছেলেপুলে না হলে ছেলের বাপ-মায়ের ভাবনা হয় বৈ কি! তাঁরা বউ-এর ছেলেপুলে হবার জন্যে নানা ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হতে লাগলেন। এখানে-ওখানে বউ-এর নামে পূজাআর্চা দেন, মানত করেন। যে যা বলে তাই ক'রে বউ-এর হাতে গণ্ডা-কবচ মাহুলী ঝুলিয়ে দিলেন। এমনি ক'রে আরও প্রায় বছর দুই কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না!

শেষে বউয়ের উপর কেমন যেন একটা বিরূপ ভাব দেখা দিতে লাগর শ্বশুর-শাশুড়ীর। বিশেষ ক'রে শাশুড়ীই সেটা প্রকাশ ক'রে ফেলতে লাগলেন নানাভাবে। পাড়ার মেয়েরাও এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সঙ্গে। এমন টুকটুকে মিষ্টি বউ-এর মুখে ক্রমশঃ ভয়ে-ভাবনায় কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিলে। সুঠাম, সুশ্রী চেহারা দিন দিন রোগা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল। অনেকে এমন কথাও বলতে যে, বউ-এর উপর নিশ্চয়ই কোন অশরীরীর দৃষ্টি পড়েছে—তাই ছেলেপুলে হচ্ছে না, আর শরীরটাকে চুষে খাচ্ছে।

এইসব শুনতে শুনতে বউ-এর মনেও একদিন ধিক্কার এসে গেল। সে স্থির করলে, এ জীবন সে আর রাখবে না।

একদিন রাত দুপুরে বাড়ীর পাশেই এক জলা-থই-থই দীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করবে ব'লে সে বেরিয়ে পড়ল চুপি চুপি। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বাড়ীর দরজা খুলে দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়াল। চারিদিক আব্‌ছা চাঁদের আলোয় থম্‌থম্‌ করছে। মৃত্যুভয় না থাকলেও, বউটি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সামনেই বেল-গাছের তলায় এক ইয়া লম্বা-চওড়া পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আলো-আঁধারের মধ্যেও তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন বউটির কাছে। এসেই ধমকের সুরে বললেন, ছিঃ মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ! যাও ঘরে ফিরে যাও—শীগ্‌গিরই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে এ কথা আর কাউকে ব'লো না তুমি।

গলায় পৈতে খালি গা, দীর্ঘাকার এই পুরুষকে প্রণাম ক'রে বউটি ভয়ে ভয়ে আবার পা-টিপে-টিপে বাড়ী ফিরে এলো। সকলে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাড়ীর কেউই এ কথা জানতে পারল না।

পরদিন সকাল থেকে বউ হয়ে গেল একেবারে অন্য মানুষ। এতদিন মন-মরা হয়ে সে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে, আজ তার মুখ হাসিখুশী, মনে আনন্দের জোয়ার! কয়েক মাস যেতেই না যেতেই ক্রমশঃ বউ-এর কোলে বাচ্চা আসার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল সকলের কাছে। শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে আরম্ভ করে পাড়া-পড়শীদেরও আনন্দ

…ার ধরে না! বউ-এর তখন সে কি আদর-যত্ন। শাশুড়ী বলে, তুমি মা বেশী খাটাখাটি ক'রো না, শ্বশুর বলে, বউমাকে মাছের মুড়োটা দাও। আর তার স্বামীর তো কথাই নেই! সে যেখান থেকে যা পারে ভাল ভাল খাবার জিনিষ এনে দেয় বউকে।

এমনি ক'রে দিন যায়। ব্রহ্মদত্যি ব্রাহ্মণের কথাটা কিন্তু বউ-এর পেটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। স্বামীকে বলি—বলি ক'রেও ভয়ে বলতে পারে না। শেষে একদিন থাকতে না পেরে বলেই ফেললো। স্বামী তো শুনে একেবারে হতভম্ব! কিন্তু এই হতভম্ব ভাব সহজেই কেটে গেল, যখন একটি মিষ্টি হাত-পা-নাড়া জ্যান্ত ডলপুতুলের মুখ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সে। মাথায় একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা-টানা চোখ, আর তুলতুলে দেহটা যেন ময়দার সঙ্গে আলতা গুলে তৈরী করেছে কে!

ছেলের মা-বাবা তো বটেই, এমন কি ঠাকুমা-ঠাকুদা থেকে আত্মীয় স্বজন সকলেই আঁতুড় ঘরে গিয়ে বিভোর হয়ে যেত; এই সাত রাজার ধন মাণিককে দেখে—তার দিক্ থেকে কেউই চোখ ফেরাতে পারত না!

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে, আঁতুড় ঘরেই বিষাদের ছায়া নেমে এলো। বউটি হঠাৎ মারা গেল আটকড়ায়ের আগের দিন সেপ্‌টিক জ্বরে। মারা যাবার একটু আগেও বউটির বাচ্চার দিকে চেয়ে চেয়ে সে কি দেখা! বাচ্চার গায়ে একটা হাত রেখেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। সবাই দুঃখে শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু এই শোককেও চাপা দিয়ে আর এক ঘটনা বাড়ীর সবাইকে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে কাবু ক'রে ফেল্‌ল! ব্যাপারটা ঘটল ঐ নবজাত শিশুকে নিয়ে। মা-মরা বাচ্চাকে কি ক'রে বাঁচান যাবে। এই নিয়ে যখন সকলেই জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত, তখন কোন্ এক অদৃশ্য হাত এসে যেন তার সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলে।

দুধের বাচ্চাকে মানুষ করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া মায়ে মত বুকের রক্ত আর সেই যত্ন দিয়ে কেউই পারে না সাত-আ দিনের বাচ্চাকে বাঁচাতে! কিন্তু এ হাঙ্গামা কারুকেই পোয়াতে হ' না, বরং বাচ্চার আনন্দ উচ্ছল মুখ ও হালুচালু ভাব দেখে সবা অবাক্ হয়ে গেল। ছেলের পেট যেন সারাক্ষণই ভরে আছে খাওয়াতে গেলে খেতে চায় না, কান্নাকাটিও বেশী নেই। এক কেঁদেই কাকে এদিক্-ওদিক্ দেখে আবার যেন চুপ ক'রে যায়, মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গায়ের কাঁথা বা ঢাকা ভিজিয়ে ফেললে কেউ বদ্‌লে দেবার আগেই, সেগুলি সবার অলক্ষ্যে কে যেন পা ফেলে আবার নতুন পাটকরা কাথা-কাপড় বদলে দেয়।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বাড়ীর কেউই তেমন ক'রে বুঝতে পারেনি কিন্তু সেদিন বুঝল, যেদিন দেখল বাচ্চার দোলা বারান্দায় আপন থেকেই দুলছে। বাচ্চাব ঠাকুমা দোতলার বারান্দায় বাচ্চার জন্যে একটা বেতের দোলা টাঙিয়ে ছিলেন। মা-মরা এই ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে, দোলায় শুইয়ে দিয়ে, তিনি একটু নিশ্চিন্ত হতেন—সংসারে কাজকর্ম দেখতে পারতেন। কিন্তু এমন কাণ্ড যে ঘটতে পারে ত কেউ কল্পনাও করতে পারেনি! মানুষজন কেউ কোথাও নেই, অথচ দোলা আপনা থেকেই দুলছে! দুলতে দুলতে যেই দোলাটা থেমে আসছে, আবার যেন কেউ ঠেলে দিচ্ছে সেটাকে। বাচ্চার ঠাকুমা বাড়ীর সবাইকে ব্যাপারটা ডেকে এনে দেখালেন। দেখে সবাই তে থ হয়ে গেল!

কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-পড়শীরা ভেঙে পড় বাড়ীতে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল আশেপাশের চারিদিকে দূর দূর গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল এই ভূতুড়ে দোলা দেখা জন্যে।

পাড়ার মাতব্বররা ছেলের বাপ ও ঠাকুদার কাছে, গিন্নীবান্নীর ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলতে লাগল রোজা ডাকিয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয় করার জন্যে। গয়ায় গিয়ে মায়ের পিণ্ডি দিতেও বলল কেউ কেউ

কিন্তু এক বছরের আগে গয়ায় মৃতের পিণ্ডি দেবার রীতি নেই। তাছাড়া ছেলের বাপ এ সবে আপত্তি করলে। এ ব্যাপারে সে ভয় পেয়ে গেল আরও এই জন্যে যে, এতে হয়ত ঐ শিশুর জীবন নিয়েও টানাটানি হ'তে পারে।

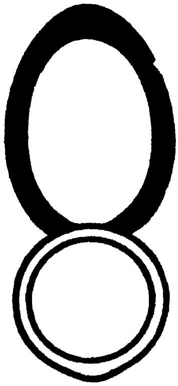
শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হ'ল না। দিনের পর দিন এই ভুতুড়ে কাণ্ড চলতে লাগল বাড়ীতে। এক মাস, দু'মাস ক'রে ছেলে বড় হতে লাগল, হামা দিতে শিখল। ক্রমশঃ তার মুখে ভাত দেবার সময় এগিয়ে এলো। ছেলের মৃত মা-ই তখন অলক্ষে থেকে তাকে আদারক করে, তার সঙ্গে খেলা করে। ছেলে উপরের ঘর থেকে হাসে-খেলে। তাকে দেখার জন্যে ঠাকুমাকে আর উদ্‌গ্রীব হতে হয় না। শুধু একটি বুড়ী ঝিকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে বেশী টাকা দিয়ে, তার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা বাড়ীর সকলের গা—সওয়া হয়ে গেলেও, সবারই মনে একটা চাপা অস্বস্তি লেগে ছিল। তাছাড়া এক বছর হয়ে গেল অথচ ছেলের অন্নপ্রাশন হ'ল না! কতদিনই বা অস্বস্তি কর এই ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা টেনে যাওয়া যায়? এদিকে ছেলেও বড় হচ্ছে আত্মীয় স্বজনরাও যা-তা রটাচ্ছে! এমন সময় ছেলের বাপ একদিন গয়ায় যাওয়াই স্থির করলে। যাওয়ার আগে তার বাপ-মার সঙ্গে যুক্তি করে গেল যে, গয়া থেকে ফিরে এসেই ঘটা ক'রে তারা ছেলের মুখে ভাত দেবে।

কিন্তু তার আর সুযোগ হয়নি। গয়া থেকে ফিরে এসে ছেলের বাপ ছেলেকে আর দেখতে পায়নি! যেদিন সে গয়ায় তার কাজ শেষ করে, সেই দিনই গ্রামে ঐ শিশু ডিপথিরীয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

আশেপাশের যারা এই ভুতুড়ে ঘটনার কথা জানত, তারা সকলেই একবাক্যে এই মৃত্যু সংবাদ শুনে বলেছিল, মা-ই নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে তার কাছে!

॥ বিশু মুখোপাধ্যায় ॥ ১৯০৯ সালে এই সাহিত্য কর্মীর জন্ম হয়। তিনি অলৌকিক কাহিনী রচনায়ও সমধিক পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে 'দৈনিক বসুমতী'র পাতায় 'বিষ্ণুশর্মা' হিসাবে সাংবাদিকতার কাজে লিপ্ত আছেন। বাংলা সাহিত্য জগতের তিনি একজন জীবন্ত অভিধান। সুদীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে তিনি ভাবীকালের জন্য অবিরাম চয়ন ক'রে চলেছেন মূল্যবান কিছু ফসল। বিশু মুখোপাধ্যায় সেই বিরল সংখ্যক সাহিত্যিকদের একজন যাঁরা বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী নানা বিচিত্র রসের রচনায় সমৃদ্ধ করেছেন।



শাঁখের আংটি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

একই সঙ্গে মানুষের মনে এমন আশা আর আশঙ্কা দেখা দেয়—এমন প্রবলভাবে, একই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে তা জানত না পরমেশ। দিতে পারে এমন ধারণাও ছিল না। দুটো অনুভূতিই এখানে স্পষ্ট। আশঙ্কাটা স্বাভাবিক, কিন্তু আশাটা বড়ই কলঙ্কজনক, কলুষিত মনের পরিচায়ক। সেটার অস্তিত্ব স্বীকার করলে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হয় লজ্জায়, দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করে। অথচ তা অস্বীকার করারও সাহস নেই ওর। বড়ই স্পষ্ট, বড়ই প্রত্যক্ষ।

ঘটনাটা খুবই সামান্য অবশ্য। ওর ডান হাতের কনিষ্ঠায় যে শাঁখার আংটিটা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ নিয়ে এতটা বিচলিত হওয়া—আপাতদৃষ্টিতে বড় হাস্যকর, চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলার মতো। ছ'আনা দামের আংটি, আছেও হাতে অনেক বছর। এখন অবশ্য হয়ত আর ছ'আনায় পাওয়া যায় না—পরমেশ কিন্তু ছ'আনাতেই কিনেছিল বেশ মনে আছে। এমনই কিনেছিল। কেউ যে বলেছিল তা নয়, ধারণ করার

মতো ক'রে পরেও নি। অথবা খুব একটা শখও ছিল না! নেহাৎই একদিন শাঁখার দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নিচু শো-কেসে সাজানো দেখে কিনেছিল। সেই থেকে হাতেই আছে। সে বহু দিনের কথা হ'ল, অন্ততঃ দশ-এগারো বছর। ছ'আনা দাম সুদসুদ্ধ উশুল হয়ে গেছে।

তবু যে সেই সামান্য আংটিটা হারানো নিয়েই ওর মনে এমন প্রচণ্ড তুফান উঠেছে, দুই বিপরীত মনোভাবের এমন বিপুল সংঘাত —তার কারণ আছে।

কাকতালীয় হয়ত—হয়ত ভেবে ভেবে বার করেছে বলেই সব ঘটনাগুলোকে নিজের চিন্তার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছে—তবু এ ধারণাটা তার মনের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়েছে। এখন আর তাকে বিদায় দেওয়া বা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এ আংটিটা তার হাত থেকে কখনও খোলে না, টানাটানি ক'রেও খুলতে পারা যায় না। তবু অজ্ঞাত কারণে হারায় এক এক সময় আর যখনই হারিয়েছে তখনই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটেছে। অনিষ্ট হয়েছে, প্রাণহানি হয়েছে। এমনই বিচিত্র ব্যাপার যে দুর্ঘটনা-গুলো ঘটে যাবার পর আবার ফিরে পেয়েছে সে আংটিটা। ফলে আংটিটা যে তার শুধু প্রিয় হয়ে উঠেছে তাই নয়—এটাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই কতকটা এক ধরনের রক্ষা-কবচ বলে ভাবতে শুরু করেছে। বরং এক এক সময় তার ভয়ই হয়—আংটিটার দিকে চেয়ে! কোন ভাগ্য এটা এমন ক'রে জড়াল তার জীবনের সঙ্গে, এ কোন্ দেবতা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ নিয়তি।

আংটিটাকে মধ্যে মধ্যে তার সজীব পদার্থ বলে মনে হয়। যেন ওর জীবন, ওর চিন্তা, ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে, আর কৌতুকের হাসি হাসছে। একটা এই সামান্য জিনিস এমন ভাবে ওর দেহের অংশীভূত হয়ে গেল, ফেলতে গেলে ফেলা যায় না, ফেলবার সাহসও নেই আর—এ কী জ্বালা হ'ল ওর!

একদিন একদিন রাগ ক'রে—মনের আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি পেতেই—খুলে ফেলতে গেছে। খোলা যায় নি। সাবান দিয়ে

তল দিয়ে অনেক রকমে চেষ্টা করেছে, খুলতে পারে নি। যেন সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতোই চামড়ার সঙ্গে মিশে গেছে ওর, কেটে না ফেললে এর থেকে মুক্তি নেই।

অথচ হারায় যখন—নিশ্চয়ই খুলে পড়ে যায়—কখন যায়, কেন যায় তাও বোঝে না!

প্রথম পড়েছিল যেদিন, সেইদিনই ওর সেজ ভাই বিজয়েশ স্কুল থেকে ফেরার পথে লরীচাপা পড়ে। সাতদিন হাসপাতালে ছিল, চেষ্টা বা চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি, অসংখ্য অস্ত্রোপচার হয়েছে, তবু বাঁচাতে পারা যায় নি। আট দিনের দিন মারা গেছে।

*　　　*　　　*

এই আটটা দিন খুব একটা খোঁজাখুঁজি করার সময় পায় নি সত্যি কথা। তবে মাঝে মাঝেই ঘর, বাথরুম, খাবার ঘর, বারান্দা, নিজের বিছানা—যেখানে যেখানে পড়া সম্ভব খুঁজে দেখেছে, কোথাও পায় নি। কিন্তু ভাইকে দাহ ক'রে শ্মশান থেকে ফিরে—সদরের বাইরে নিমপাতা আর মটর ডাল দাঁতে কেটে আগুন ছুঁয়ে ভেতরে যাবে—খালি পায়ে কী একটা ঠেকল। হেঁট হয়ে দেখল—সেই শাঁখার আংটিটা। কেমন ক'রে ওখানে এল, কে ফেলল, আর কারও চোখে পড়ল না কেন—এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তরই মিলল না। বাড়িসুদ্ধ সকলকে জেরা ক'রেও না।

তারপর বছর-দুই আর কিছু হয় নি। হঠাৎ আবার একদিন হারাল আংটিটা।

তখনও আংটির সঙ্গে কোন দুর্ঘটনার যোগাযোগ থাকতে পারে এমন কথা মাথাতে যায় নি ওর, এ বিষয়ে কোন সংশয় দেখা দেয় নি। তাই আংটিটা এদিক-ওদিক খুঁজেছে কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয় নি। বরং এক এক সময় মনে হয়েছে অনেকদিন তো পরল, এবার যায় তো যাক, আর একটা নতুন হবে।

পরের দিনই খবর এসেছে, দেশে ওর জ্যাঠতুতো ভাই দেবেশদা ওদের পৈতৃক বাড়ির যে অংশে থাকতেন সেই অংশের দুটো ঘর পড়ে

গেছে ক'দিন অহোরাত্র বৃষ্টির ফলে এবং দেবেশদার দুটি ছেলেই মারা গেছে—দেওয়াল ও ছাদ চাপা পড়ে। সেকালের ভারী ভারী শালের কড়ি আর ডবল টালি—তার চাপে থেঁতলে গেছে বাচ্ছা দুটো।

খবর পেয়েই ওরা সকলে দেশে চলে গিয়েছিল। দিন সাতের পরে যখন ফিরল, সেইদিনই, ছেড়ে-যাওয়া ময়লা শার্টটা কাচতে দিয়ে গিয়ে অভ্যাসমতো পকেটে হাত ঢোকাতেই হাতে পড়ল আংটিটা।

* * *

এইবার বেশ একটু ভাবিয়ে তুলল পরমেশকে। হাত থেকে খুলে পড়লে, মেঝেয় পড়বে বিছানায় পড়বে—কিম্বা কলঘরটরে। সে-সমস্ত জায়গাতেই কয়েকবার খুঁজে দেখেছে তন্নতন্ন ক'রে। কোথাও পায় নি। পকেটে যাবার কোন কারণ নেই। ইচ্ছে ক'রে খোলে নি যে পকেটে রাখবে। তাছাড়া ময়লা জামার পকেট থেকে সে নিজে পয়সা কাগজপত্র রুমাল বার ক'রে নিয়ে গেছে—যতদূর মনে পড়ছে, ভাল ক'রেই দেখেছিল আর কিছু পড়ে রইল কিনা। থাকলে তো তখনই হাতে ঠেকত। তবে ?

সংশয়টা সেই প্রথম দেখা দিয়েছিল ওর মনে। তবু তখনই ততটা আমল দেয় নি। যত স্পষ্ট হয়েছে, আকার ধারণ করেছে, ততই দূরে ঠেলে দিয়েছে।

তবে তৃতীয়বার যে দিন হারাল—সেদিন, যাকে বলে 'তোল মাটি ঘোল করা' তাই করেছে সে। কোথাও খুঁজতে বাকী রাখে নি। সবাই মিলে খুঁজেছে বাড়ি সুদ্ধ। কিন্তু কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় নি।

পরের দিন বাবা আপিসে গিয়ে শুনেছেন, তাঁরা গভর্ণমেণ্ট টেণ্ডারে আসামে যে মাল পাঠিয়েছিলেন সে মাল 'মান অনুযায়ী নয়', —মানে যে নমুনা দেওয়া হয়েছিল সেরকম হয় নি, এই অজুহাতে ফেরৎ এসেছে। যাতায়াতের সব খরচা ওঁদের, টেণ্ডারের টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ছোট ব্যবসা তাঁর, এমনিতেই নানা কারণে টালমাটাল যাচ্ছিল, তার ওপর এতগুলি টাকা লোকসান, সর্বস্বান্ত

হবার উপক্রম। সরকারী হিসাবের বাইরেও খানিকটা খরচ হয়েছে। ঘুষ দিতে হয়েছে। ঘুষ ছাড়া সরকারী ঠিকা পাওয়া যায় না— আসলে ঘুষ কিছু কম দিয়েছিলেন বাবা বলেই ঠিকা নাকচ হয়ে গেছে, অপরে নিশ্চয় বেশী ঘুষ দিয়েছে—কিন্তু তবু খানিকটা টাকা তো দিতেই হয়েছে, তার পরিমাণও কম নয়—সেটাও বাজে খরচে গেল। আরও মুশকিল এসব খরচ ইন্‌কামট্যাক্স বিভাগ মানবে না।

এ ধাক্কা বাবা সামলাতে পারলেন না। তিন চারদিন পরেই সেরিব্রাল থ্রম্‌বসিস হল, চার ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ।

এবার আংটিটা পাওয়া গেল শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হবার পর, নিয়মভঙ্গের দিন। দেরাজে কিছু খুচরো টাকা ছিল। তিন চার খানা দশটাকার নোট, দরকার পড়তে বার করতে গিয়ে দেখল, সেইখানে যেন সযত্নে কেউ আংটিটা রেখে দিয়েছে—নোট কখানা চাপা দিয়ে।...

*   *   *

এর পর একেবারে ওর বিয়ের সময়।

ততদিনে ওর রীতিমতোই ভয় ধরে গেছে। সর্বনেশে আংটিটা কোনমতে ভেঙ্গে ফেলে দিতে পারলে বেঁচে যেত—কেবল বৃহত্তর কোন অনিষ্টের আশঙ্কাতেই পারে না। সাহসে কুলোয় না।

কিন্তু এবার যখন হারাল তখন আর ফেরবার সাহস নেই।

যাত্রা ক'রে বেরোচ্ছে, গাড়ীতে উঠেছে, তখন নজরে পড়ল হাতে আংটিটা নেই।

নিমেষে হিম হয়ে গেল বুকের মধ্যেটা। এবার মনে হ'ল দেবেশদার বৌ যখন ওর বাবার দরুণ বড় পোখরাজের আংটিটা পরিয়েছেন তখন হয়ত পুরনো সস্তাদামের জিনিস বলে খুলে রেখেছেন কোথাও! কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হ'ল—অত সহজে তো খোলা যাবে না। কত টানাটানি ক'রে কত সাবান জল দিয়ে যা খুলতে পারে নি—সে আংটি খুলবে আর ও টের পাবে না, তা কখন সম্ভব নয়!

তবে ?

তবে যে কি—তা ভাবতেও মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু তখন আর ফেরবার সময় নেই। যাত্রা স্থগিত করারও না। বহু লোক যাচ্ছে সঙ্গে। বাড়িও আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে গেছে। প্রায় তিনশ লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বৌ-ভাতে। কাল বাদ পরশুই দিন—এখন বিয়ে বন্ধ করা মানে হাজারো কৈফিয়ৎ। দাঁড়িয়ে অপমান হওয়া। তাছাড়া, সে ভদ্রলোকেরও জাত যাবার প্রশ্ন আছে। আজকাল যদিও আগের মতো জাত যায় না—কিন্তু কার্যত সেই রকমই দাঁড়ায়।

সুতরাং—বসেই রইল পরমেশ স্থির হয়ে। কিন্তু এই ফুলের মালা, এই বর-বেশ, এই সাজানো গাড়ি—বন্ধুবান্ধবদের কৌতুক-বিদ্রূপ—চারিদিকের আনন্দ-কোলাহল, সমস্তই যেন একটা অকরুণ পরিহাস বলে মনে হতে লাগল। সব যেন ম্লান হয়ে গেল—আনন্দ উৎসব-সমারোহ। আশপাশে কে কি বলছে—তার এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না।

সংবাদটা পাওয়া গেল পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে।

কলকাতা থেকে মাইল চব্বিশ দূরে বিবাহ। শহর কিছু না, বড় জোর গণ্ডগ্রাম বলা যেতে পারে। বিবাহের লগ্ন গভীর রাত্রে বলে ওরা সন্ধ্যাতে রওনা দিয়েছিল। পথে 'জ্যাম্' পাওয়ায় পৌঁছতে দেরি হয়েছে। ওরা যখন গেছে তখন রাত প্রায় নটা। তবু বিয়ে বাড়িতে এমন শোকাভিভূত গৃহের মতো নীরবতা আদৌ স্বাভাবিক নয়। অথচ কেউই নিদ্রাভিভূত নয়—জেগেই আছে, লোকও কম নেই কিন্তু তারা সবাই চুপ ক'রে গুম্ খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাষাণ মূর্তির মতোই ; অধিকাংশরই মাথা নিচু। মেয়েদের সংখ্যাও যথেষ্ট, সাধারণ বিয়ে বাড়িতে যেমন হয়—তবু বর পৌঁছতে একটা শাঁখ বাজল না, অথবা কেউ ছুটে এল না গাড়ির চাকায় জল দিতে।

ফলে এঁরাও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অপমানে মুখ কালো হয়ে উঠল সকলের। বর গাড়িতেই বসে রইল—বরকর্তা ছোট কাকা অন্ধকার মুখ ক'রে নেমে এলেন।

কারণটা বোঝা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পাত্রীর বাবা ছুটে এসে ছোট কাকার হাতটা ধরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। তাঁর হাতটা ধরে কপালে আঘাত করতে লাগলেন বার বার।

সন্ধ্যা বেলায় যখন সকলে নানা কাজে ব্যস্ত, সেই সময় পাত্রী কনে-সাজ পরেই কোথায় পালিয়ে গেছে। ওঁদের যখন খেয়াল হয়েছে—খোঁজ পড়েছে তখন আর কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে কার সঙ্গে পালিয়েছে তা জানতে পেরেছেন। কারণ যে মাস্টার মশাই ওকে পড়াতেন তাকেও সেই সময় থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা কানাঘুষো অবশ্য এর আগেও উঠেছিল কিন্তু মেয়ের বাবা জগৎবাবু খবর পেয়ে পড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেটিকে যাচ্ছে-তাই ক'রে বকেছিলেন। বাড়িতে আসা বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। মেয়েকেও কোথাও বেরোতে দিতেন না। এতকাল সে শাসন লঙ্ঘনও করে নি কেউ—প্রায় বছর খানেকের ওপর হয়ে গেল, কোন পক্ষেই কোন বেচাল দেখেন নি। তাই কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বিয়ের সম্বন্ধ করতে এগিয়েছিলেন। ওরা যে ওঁর এই সর্বনাশ মনে মনে ভেঁজে আছে তা একবারও মনে করেন নি।

এর পর ফিরে আসবারই কথা। ফিরেই আসছিল পরমেশরা—কিন্তু গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি এসে বাধা দিলেন। বললেন, 'দেখুন কিছু বলবার অবশ্য আমাদের মুখ নেই কিন্তু এতে দুপক্ষেরই অপমান। বরং আপনাদের বেশী, আমাদের তো যা হবার তা হয়েই গেছে—ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে, আপনারাও বৌ না নিয়ে ফিরে গেলে ওখানে মুখ দেখাতে পারবেন না।, তার চেয়ে একটা কাজ করুন, জগৎবাবুর একটি ভাইঝি আছে, প্রায় ঐ বয়িসীই হবে, দেখতে মন্দ নয়। কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। সংসারের কাজকর্মও সব জানে, —আর সবচেয়ে যেটা বলবার—স্বভাব চরিত্র অতুলনীয়। দিদির বিপরীত একেবারে। ওকে কেউ কোন বেটাছেলের সঙ্গে আড্ডা দিতে বা ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে নি। আমরা এতগুলি ভদ্রসন্তান জামিন থাকছি—এ মেয়েকে আপনারা নিঃসঙ্কোচে নিয়ে যেতে পারেন।'

গরজ সত্যিই তখন পরমেশদের বেশী। এদের যা অপমান ব লোক-জানাজানি হবার তা তো হয়েই গেছে—এখন ওঁদেরও, যদি বৌ না নিয়ে ফিরতে হয়—কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। অগত্যা ওঁরা রাজী হয়ে গেলেন, দেবেশদা, ছোট কাকা, মামা সবাই; পরমেশকেও রাজী করালেন শেষ পর্যন্ত।

আর, সত্যি কথা বলতে কি, আংটির ফাঁড়া কারও জীবনান্ত না ক'রে অল্পে কেটে গেছে ভেবে সে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছে —তার তখন কোন প্রস্তাবেই আপত্তি নেই!

তারপর এই।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

বৌ রেবা ছ্যাবলা নয়, পরপুরুষের দিকেও দৃষ্টি নেই, সবই ঠিক মিলেছে, যা যা ওঁরা বলেছিলেন। শুধু একটা কথা কেউ বলেন নি। মেয়েটি চির-রুগ্না। কোন্ রোগটা নেই তা বলা শক্ত। হিষ্টিরিয়াই প্রধান, তা ছাড়া যাবতীয় স্ত্রীরোগ, স্নায়ু-ঘটিত ব্যাধি, হজমের অসুবিধা হাঁপানির টান—এঁরাও আছেন। কোনটাই কম নয় বা সহজ নয়। তাও যদি বা চলছিল, এক উৎকট নতুন ব্যাধিতে ধরেছে সম্প্রতি। স্নায়ুগুলো শুকিয়ে আসছে ক্রমশঃ।

গোড়াতে বোঝা যায় নি। ডাক্তাররা 'নিউরটিক' পেশেণ্ট বলে অতটা গ্রাহ্যও করেন নি। যখন ধরা পড়ল তখন অনেকদূরে এগিয়ে গেছে রোগ আরোগ্যের আশা আর নেই। আগেও নাকি বিশেষ ছিল না—আজ পর্যন্ত এ রোগের কোন ভাল চিকিৎসা বেরোয় নি।

এমনিতেই তো জেরবার, ধনে-প্রাণে মরবার উপক্রম, দিনে রাতে দুটি আয়া রাখতে হয়েছে সেবা করার জন্যে, পাশ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে হয় আজ-কাল, চিকিৎসাও একটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে—কোন ফল হবে না জেনেও—আর সেও বেশ ব্যয়বহুল চিকিৎসা, তার ওপর রেবা মহা-অশান্তি বাধিয়ে তুলেছে।

তার ধারণা হয়েছে যে পরমেশ তার দিদি শুভাকে পছন্দ করেছিল, সেই পাত্রী না পেয়ে ওর আশাভঙ্গ হয়েছে। শুভা রূপসী, স্বাস্থ্যবতী, প্রাণোচ্ছ্বল—তার বদলে বাধ্য হয়ে রেবাকে বিয়ে করতে

হয়েছে বলে রেবার ওপর পরমেশের একটা জাতক্রোধ, দু'চোখে দেখতে পারে না। তার ওপর এত ভুগছে রেবা, অবিরাম পয়সা খরচ করতে হচ্ছে পরমেশকে—ফলে সে বিদ্বেষ প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে। পরমেশ ইচ্ছে ক'রে চিকিৎসার নামে বিষ ইন্‌জেকশ্যন দিইয়ে এমন মহাব্যাধি ধরিয়ে দিয়েছে।

পরমেশ প্রথম প্রথম অনেক বুঝিয়েছে। শুভাকে সে নিজে গিয়ে দেখে নি সুতরাং তার পছন্দ করার প্রশ্নই উঠছে না,—একথা নানারকম দিব্যি গেলে বলেছে বারবার, মরা মা-বাবার নামে, মাকালীর নামে দিব্যি গেলেছে। তাছাড়া বিষ দেওয়া সম্ভব নয় এই জন্যে যে বড় বড় ডাক্তার—বত্রিশ টাকা চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে পরমেশ, ওর কথায় তাঁরা বিষ দেবার ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন খামখা? তাদের ঘুষ দিতে গেলে লাখটাকা অন্ততঃ ঘুষ দিতে হয়, সে টাকা ওর কই?

বোঝাবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণেই, প্রাণের দায়েই বলতে গেলে কিন্তু রেবা কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করে নি। প্রকাশ্যে সকলের সামনে গালাগাল দেয়, তুমি রাক্ষস, আমি মলে আমার মড়াটার বুকের ওপর নাচবে ধেই ধেই করে—তোমাকে বেশ চিনে নিয়েছি। আর একটা বিয়ে করার জন্যে ছটফট করছ—তা কি আমি জানি না।

ক্রমশঃ এটা বেড়েছে। পাগালামিতে পরিণত হয়েছে।

কথা কইতে এখন রীতিমতো কষ্ট হয়, তবু অকথ্য-কুকথা গালি-গালাজ ক'রে যায় সে স্বামীকে—দিনরাত শাপ-শাপান্ত করে। বিরক্তি তো আছেই—অপমানও বড় কম নয়। ঝি চাকর আয়ার সামনেই এইসব বলে। অশান্তির শেষ থাকে না। আয়ারা বিরক্ত হয়, কাজ ছেড়ে দেবার ভয় দেখায়। অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে টাকা বাড়িয়ে দিয়ে রাখতে হয় তাদের। ঝি-চাকরও তাই।

শেষে এমন একটা সময় আসে যে সত্যি সত্যিই স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে পরমেশ। আর তো কোন আশাই নেই, গলা পর্যন্ত বুজে আসছে, ডাক্তাররা শক্ত খাবার দিতে বারণ করেছেন; ভাত চটকে দুধে গুলে ঝিনুকে করে খাওয়ানো—পৃথিবীর কোনো সুখ কোনো সম্ভোগই আর ওর অদৃষ্টে নেই, কোনো সৌভাগ্য কোনদিন আসবে

না জীবনে, কোনো আনন্দের স্বাদ পাবে না—তবে আর কেন এ মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? ওরও—এদেরও। দৈহিক যত না হোক মানসিক কষ্টটাই অসহ্য যে। দিবারাত্র এই বিরক্তি, দুশ্চিন্তা এবং নিজের মাইনে করা দাসদাসীর কাছে এই অপমান। তারা যে আড়ালে কী পরিমাণ হাসাহাসি করে তা কি আর বোঝে না পরমেশ।....

প্রথম প্রথম, চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠত—দু'হাত দিয়ে ঠেলে বার করে দিতে চাইত মন থেকে। কিন্তু পাপের বীজাণু সহজে মরে না, কোন কোন চর্মরোগের মতো নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলেও আবার এক সময় মাথা তোলে। ওর এই চিন্তাও একটু একটু ক'রে বাসা বাঁধে, কিছু পরে সেটা স্থায়ী বাসায় পরিণত হয়—ক্রমে প্রাধান্যও পায়। শেষে একসময় চিন্তাটা আর অত অসহ্য অতি লজ্জাকর মনে হয় না।

অবশ্য, মৃত্যু কামনা করা এক জিনিস—মৃত্যু ঘটানো আর এক। সেটা পরমেশের দ্বারা হবে না। তা চায়ও না সে। যেটা হবেই, যা অবশ্যম্ভাবী—নিয়তির বিধান, সেই ঘটনাটাকে তরান্বিত করতে চায় মাত্র। চায়—মানে ঘটলে খুশী হয়। তরান্বিত করার কোন উপায় সে জানে না। চায়ও না ও পথে যেতে। শুধু পাপ বলে নয়—বা আইনের চোখে সমাজের চোখে দণ্ডনীয় বলেও নয়—এ রকম কোন নৃশংস কাজ করা ওর শক্তির বাইরে।

না বিষ ও খাওয়াতে পারবে না। গলাও টিপতে পারবে না। ওর দিকে চাইলে এখনও তার মায়াই হয় বরং। শারীরিক কোন উপায়ে নয়, সে নিজে কোন মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। এছাড়া যদি কোন উপায় থাকে—প্রার্থনাতে যদি হয় তো সে রাজী আছে। ভগবান ওকে মুক্তি দাও। ওকে—আর আমাদেরও।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন আংটিটার দিকে নজর পড়ল। এটা যদি হারাত--কোন মর্তে! এতবার তো হারাল, আর একবার হারাতে পারে না?

অবশ্য—হারালেই যে অনিষ্ট বা অমঙ্গল এই পথে আসবে, তার কোন অর্থ নেই। কিন্তু সে সম্ভাবনা পরমেশ ভাবতেও চায় না।

চায় না বলেই মাথাতেও আসে না। সে শুধু—কী ক'রে হারানো যায় এটা, অন্ততঃ খুলে ফেলা যায়, সেই চিন্তাই করে। নতুন ক'রে চেষ্টা শুরু করে আবার। সাবান দিয়ে দেখে, লুব্রিকেটিং তেল দিয়ে আস্তে আস্তে চুড়ি খোলার মতো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। শেষে একসময় আঙুলের ওপর নোড়া দিয়ে ঘা দেয়—আংটিটা ভাঙতে গিয়ে যদি আঙুলটা ভাঙে—সেও ভাল।

কিন্তু সেই নিতান্ত ভঙ্গুর শাঁখের আংটি নোড়ার ঘায়েও ভাঙে না। অগত্যা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

সেই আংটি আজ আপনিই হারিয়েছে।

আশা, যদি এতেই তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আর সেই আশার জন্য একটা দুর্নিবার লজ্জাও।

আশঙ্কা, সেটা ছাড়া যদি অন্য কোন অমঙ্গল হয়!

দুটো এই বিপরীতমুখী চিন্তার সংঘাতে বিবর্ণ হয়ে ওঠে সে, তার কপালে ঘাম দেয়। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে।

ভাল ক'রে খুঁজতেও পারে না। সে শক্তিও নেই, বিশেষ ইচ্ছাও নেই। যায় তো যাক, একেবারেই যাক।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নেয় একটু। চাকরকে ডেকে বলে আংটিটা খুঁজতে, ঝিকে বলে ঘর মোছার সময় ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে। নিজেও খোঁজে সাধ্যমতো—বিছানায়, দেরাজে, টেবিলে, তাকে—যেখানে যেখানে পড়া সম্ভব—সর্বত্র।

বলা বাহুল্য—পাওয়া যায় না। এমনভাবে পাওয়া যাবেও না তা জানে পরমেশ। সে তার সময়তো—ওর প্রতি নিয়তির পরিহাসের মতো একসময় দেখা দেবে।...

খানিকটা পরে হাল ছেড়ে স্নান করতে যায়।...

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই দিনের আয়া এসে বলে, 'বৌদি ডাকছেন আপনাকে একবার।'

মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। সাত-সকালে আবার সেই অশান্তি। গলা প্রায় বুজে এসেছে, ফিসফিস ক'রে কথা কইতেও কষ্ট হয়—তবু অব্যাহতি দেয় না!

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আয়া একটা নতুন খবর দেয়, 'বৌ আজ কিন্তু বেশ হাসিখুশী আছেন দাদা, মনে হয় আজ অনেকদি পরে মাথাটা ঠাণ্ডা আছে। কথাও কইতে পারছেন একটু—'

দেবার মতো সংবাদ নিশ্চয়ই। বিস্ময় বোধ করে, সেই স প্রবল একটা আশঙ্কাও। তার কি আংটি হারানোর ফল অ কোন দুঃসংবাদের আকারে অপেক্ষা করছে?

তখন অবশ্য অত ভাববার সময় নেই। পরমেশ স্ত্রীর ঘরে এ দাঁড়ায়।

সত্যিই আজ রেবা একটু খুশী-খুশী আছে। পরমেশ যেতে সে হেসে বলে, 'ওগো ছাখো, আজ আমি অনেকটা ভাল বে করছি। গলাটাও যেন একটু পরিষ্কাব শুনছ না?···নিজে নিজে পাশ ফিরলুম এই মাত্র—'

মিষ্টি কথাব উত্তরে মিষ্টি কথাই আসে। পবমেশও কোম কণ্ঠে বলে, 'তাহলে বোধহয় ডাক্তারেব এই নতুন ওষুধটায় কা দিল একটু।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, য়্যাদ্দিনে ঠিক ওষুধটা খুঁজে পেয়ে ডাক্তার।···সত্যি, তোমাকে কত গালাগাল দিয়েছি, নতুন ওষুধ খাওয়াতে শুরু করলে বলে।···আমি যেমন অভাগী, জ্বলে অ জ্বালিয়েই গেলুম, একটা দিনের জন্যে শান্তি পেলে না আমাকে নিয়ে!'

অভিভূতের মতো শোনে পরমেশ। এ কি সত্যিই রেবার গল তার কথা শুনছে নে?

অনেক উন্নতি হয়েছে. তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গলাটা সত্যিই অনেকখানি স্বাভাবিক। ডাক্তার যে অবশ্য শুনিয়ে দিয়ে গেছেন, 'দীপ নেভার আগে একবার জো জ্বলে ওঠে—কবিরা বলেন না?—এ ওষুধেও য়্যাক্শান একটা পাবে তবে তা কতদিন স্থায়ী হবে জানি না।'

এ কি সেই জ্বলে ওঠাই? না সত্যিই ভাল হয়ে উঠবে এব

বুকের মধ্যে কি কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন হিম-হিম ভাব অনুভব করে পরমেশ?)

'জানো, সকালে একখানা বিস্কুট চেয়ে খেলাম। নিত্য ঐ দুধে গোলা সন্দেশ আর ভাত ভাল লাগে না। বেশ খেতে পারলুমও চিবিয়ে—। তোমার চান হয়ে গেছে? জলখাবার টাবার কিছু দিয়েছে তোমায় বন্ধু?'

বলতে বলতেই কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে ওঠে, আর্তনাদের মতো শোনায়—'একি, তোমার আংটি?...হ্যাঁ।...শাঁখের আংটিটা কোথায় গেল?

কিছুপূর্বের মধুর শান্তিময় পরিবেশ যেন তীক্ষ্ণধার কোন অস্ত্রের আঘাতে ফালা ফালা হয়ে কেটে যায়।

'নিশ্চয় ইচ্ছে ক'রে খুলেছ আমাকে মারবে বলে—সে তো সহজে খোলে না। নিশ্চয় ভেঙ্গেছ বসে বসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইচ্ছে ক'রে।...হারায় নি, কিছু না। এ তোমার শয়তানী। তুমিই তো বলেছ আংটিটা হারালেই কেউ না কেউ মরে।...তুমি খুনে, তুমি পিশাচ, তুমি রাক্ষস।'

তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে গলার আওয়াজ। শেষের দিকে চিৎকারের মতো শোনায়। তারপরই হঠাৎ থেমে যায় একেবারে। স্থির হয়ে যায় সমস্ত দেহ। চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিও এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে, শুধু চোখ দুটো তেমন বিস্ফারিত থাকে।

আর কিছু করার ছিল না। তবু ডাক্তার এলেন, সার্টিফিকেটও লিখে দিয়ে গেলেন। লোকজনও ডাকা হ'ল। যা করণীয় তা তো করতেই হবে।

সে আংটিটাও পাওয়া গেল যথারীতি।

মৃতদেহটা সরাবার সময়ই পাওয়া গেল—রেবারই বালিশের নিচে।

কে নিয়ে সেখানে রেখেছে, কেন রেখেছে, কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল—হাজার জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও জানা গেল না।

॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ লেখক নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। সেই পাঁচকড়ি দের যুগ হতেই রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক গল্প এক দ্বিতীয় শ্রেনীর আর্টের পর্য্যায় ভুক্ত হয়ে আছে। তবে গজেনবাবু প্রমুখ কিছু খ্যাতিমান কথা শিল্পীর শিল্পিক প্রয়াসে ভৌতিক গল্পও ধন্য হয়েছে। গজেন্দ্র কুমারের রচনায় ঘর সংসার এবং লোক জীবনের সহজ সুন্দর রূপ নিখুঁতভাবে বিধৃত। তাঁর কাহিনীর কুশীলব আমাদের সুপরিচিত পারিপার্শ্ব থেকেই উঠে আসে। গল্প কথনের সহজ সারল্য ও ভাষার প্রসাদ গুণ তাঁর লেখার এক বিশেষ গুণ। তাঁর অসংখ্য ছোট গল্প এবং উপন্যাসে শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং নরেশ সেনগুপ্তের অনুবর্তন। চরিত্র চিত্রনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। অলৌকিক কাহিনী রচনায় তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ্যনীয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস পৌষ ফাগুনের পালা রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। এছাড়া তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত "পাঞ্চজন্য মহাভারতের অমৃত কথায় ও জনপ্রিয়তায় ধন্য।

বিয়ে !



সুমথনাথ ঘোষ

বৌমা—অ-বৌমা ! ওরে অ-নেলী। নূতন বৌমা গেল কোথায় রে। এঘর ওঘর উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন জ্ঞানদা।

এই তো একটু আগে ছিল এখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে—গেল কোথায়, সত্যি তো! বলে সেও ডাকতে লাগ্‌ল, বৌদি ও বৌদি—

সামনে ঝিকে বাসন নিয়ে যেতে দেখে নেলী জিজ্ঞেস করলে, হাঁরে বিম্‌লী নূতন বৌদিকে দেখেছিস ?

সে বললে, এই তো একটু আগে ঘরে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন।

জানিনা মা—কালে কালে আরো কত দেখবো! বলে জ্ঞানদা মুখটা কঠিন করে নেন, শাশুড়ী, ননদ সব রয়েছে তাদের জিজ্ঞেস না করেই যে নূতন বৌ কোথাও যেতে পারে, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! আজকালকার মেয়েদের মনে ভয়ডর বলে কিছু নেই!

চুপ করো মা! আজকের দিনে মন খারাপ করতে নেই। আমি দেখছি কোথায় গেল! প্রথমেই সে নীচের বাথরুমটা দেখে এলো। সেখানে দেখতে না পেয়ে আবার ওপরে উঠে আসতেই জ্ঞানদা বললেন, সন্ধ্যের আর বেশী দেরী নেই—আজ কালরাত্তির স্বামীর মুখ দেখতে নেই রাত্রে, কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলুম।

আচ্ছা আমি বলছি, তুমি কাজে যাও মা। বলতে বলতে নেলী খুঁজতে খুঁজতে শেষে ছাদে এসে নতুনবৌদিকে দেখে, নেলী যেন শিউরে ওঠে। একি তুমি ছাদে এসেছো কেন? কি করছো এখানে একা!

বলতে বলতে, বৌয়ের হাতটা খপ্ করে ধরে, এপাশে টেনে এনে বললে, দেখছো না ওখানটা বেদীর মত ইঁট দিয়ে গাঁথা, ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? এত বড় ছাদে আর বুঝি জায়গা দেখতে পেলে না?

ননদের চোখে মুখে একটা ভীত আতঙ্কের ছায়া লক্ষ্য করে, তাড়াতাড়ি ছু'হাতে জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে নতুনবৌ। তারপর অপরাধীর মত বলে, আমি বুঝতে পারিনি যে ওখানে ঠাকুর পূজো হয়।

ভাগ্যিস মা দেখেননি। তিনি তোমার সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তুমি যে চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো, তা কল্পনাও করতে পারেননি।

কেন খুঁজছেন ভাই?

নেলী এবার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে কিন্তু তবু যেন ক্রোধ ফুটে ওঠে। তোমাকে ছাদে উঠতে মা বারণ করে দেননি।

নতুনবৌ আমৃতা আমৃতা করে জবাব দেয়, বলেছিলেন তুমি যেন একা ছাদে উঠো না।

তা মা যখন বারণ করেছিলেন। তখন তাঁর কথা অমান্য করে একা এখানে এলে কেন?

অন্যায় হয়ে গেছে ভাই, মাপ করো আর কখনো হবে না।

এই বলে একটু থেমে স্নেহ কোমল কণ্ঠে ননদকে বললে, নীচেটা বড্ড গরম, গা বমি বমি করছিল, শরীর কেমন যেন আনচান করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তাই একটু এখানে চলে এসেছি! ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে এখন যেন সুস্থ বোধ করছি!

তাই বলে এতবড় ছাদে আর দাঁড়াবার জায়গা পেলে না—একেবারে ওই বেদীটার ওপর না বসলে চলছিল না। এই ভর সন্ধ্যেবেলা—তুমি একটা 'সাঁদাবৌ'—। এখানে আসার আগে আমায় একবার জিজ্ঞেস করতে পারতে তো?

কি জানি আমার কেমন লজ্জা করতে লাগল ঠাকুর ঝি, যদি

তোমরা কিছু মনে করো, তাই চুপিচুপি চলে এসেছি এখানে। বলে একটু থেমে সে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা ঠাকুর ঝি ওই বেদীটায় কি পূজো হয় ভাই?

জানি না। বলে হঠাৎ এমন ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেল নেলী যে নতুন বৌয়ের মুখেও যেন আর কথা ফোটে না। দু'জনের মধ্যে সহসা কিসের এক স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধে যায়। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আস্তে কথা বলে নতুন বৌ, কি ভাই ওখানে, বল না? কি ঠাকুর পূজো হয়।

না ওসব কিছু নয়। বলে জোর করে তাকে নীচে টেনে আনে নেলী।

যদি কিছু নয় তবে ওখানে যেতে এত নিষেধ কেন। বল্ ভাই আমার কাছে লুকিয়ো না। তার হাতটা ধরে অনুনয়ে যেন ভেঙে পড়ে নতুন বৌ।

না সে আমি বলতে পারবো না ভাই। আমায় জিজ্ঞেস করো না। বলে মুখটাকে তার দিক থেকে সহসা ঘুরিয়ে নিলে নেলী।

এতে কৌতূহল যেন আরও বেড়ে যায় নতুন বৌয়ের মনে। সব সময় ওই কথাটা তার মনে উঁকি মারে, ব্যাপার কি? তাকে ছাদে উঠতে দিতে এত কেন আপত্তি।

অথচ সে কথাটা আর কাউকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস পায় না নতুনবৌ, কে কি মনে করবে। তাছাড়া নেলীর কানে যদি তুলে দেয়, কি ভাববে সে। আমি তাকে অবিশ্বাস করে, লুকিয়ে অন্যের কাছ থেকে সেই কথাটা জানতে চাইছি যেটা ওরা গোপন করতে চায় আমাকে।

সে রাতটা কেটে গেল। কিন্তু পরের দিনটা ওইভাবে মুখ বুজিয়ে থাকলেও নতুন বৌয়ের পেট যেন ফুলতে থাকে সেই কথাটা জানার জন্যে। সেদিন শনিবার তাই ফুলশয্যা হবে, পরদিন।

সন্ধ্যে বেলা চুল বেঁধে ভাল করে ভ্রাতৃবধূকে সাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ গালে মৃদু ঠোনা মেরে ননদিনী বললে, যদিও একদিন পেছিয়ে গেছে, তবু ফুলশয্যা যখন হয়নি, তখন আজও-কালরাত্রি মনে রেখো ভাই,

চুরি করে যেন দাদার মুখ দেখো না। বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো। সে হাসির রেশ মিলতে না দিয়েই আবার বললে, তাহলে কিন্তু জানোত—সারাজীবন দাদার সঙ্গে খুঁটিনাটি লেগেই থাকবে, কোনদিন আর সুনজরে দেখতে পারবে না দাদা মনে থাকে যেন।

এই সময় একবার নতুনবৌ ভাবলে, ননদকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পারলে না লজ্জায়। রাত্তির বেলা ননদের পাশে শুয়ে কিছুতেই যেন ঘুম আসে না তার চোখে। ছটফট করে। তা' লক্ষ্য করে নেলী ঠাট্টা জুড়ে দেয় আর আজকের রাতটাও কোন রকমে কাটিয়ে দাও ভাই কুচ্ছিৎ ননদের পাশে শুয়ে, কাল থেকে একেবারে দাদার খাস কামরায়—আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই সেখানে।

নতুন বৌ ননদের গলাটা জড়িয়ে ধরে এবার বলে, ঠাকুরঝি ভাই, বলনা ছাদে কি—কথাটা না শোনা পর্যন্ত কিছুতেই চোখে ঘুম আসছে না।

হঠাৎ ননদের দেহটা একবার শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে যায়। অন্ধকারে তা' বেশ অনুভব করতে পারলে নতুন বৌ। সে শিহরণ তারও বুকে যেন কিসের এক অজ্ঞাত আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ। কারুর মুখে কোন কথা ফোটে না। শেষে গলা থেকে বৌদির হাতটা আলতোভাবে নামিয়ে দিয়ে নেলী বলে, আচ্ছা আজ নয় সে বলবোখন পরে, এখন ঘুমিয়ে পড়তো। কাল ফুলশয্যা, সারারাত দাদা জাগিয়ে রাখবে ঘুমুতে দেবে না মনে রেখো।

বলে যেন সেই অবস্থাটাকে কিছু তরল করে দেবার জন্যে নেলী সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জোর ক'রে হেসে ওঠে।

সারাদিন খাটাখাটুনি হয়েছিল সব চেয়ে বেশি নেলীর। পরদিন বৌভাত, তার কতরকর্মের আয়োজন। যদিও সরকারের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে আত্মীয়স্বজনরা বিশেষ কেউ আসে নি এবং খাওয়াদাওয়ার সমারোহও খুব কিছু ছিল না, তবু অনুষ্ঠানের ত্রুটি

হলে তো চলবে না। ক্রিয়াকর্মের সব ব্যাপারটাতেই নজর রাখতে হয়েছিল তাকে। মাকে কিছুই করতে দেয়নি।

তাই একটু পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নেলী।

ভোর তখনও ভাল করে হয়নি। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো নেলী। একি বৌদির বিছানা শূন্য কেন—কোথায় গেল সে! তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখে তখনো বাড়ীর সবাই নিদ্রামগ্ন, কেউ ওঠেনি। তবে বৌদি কোথায় গেল? নীচে গিয়ে কলঘরে দেখতে না পেয়ে থমকে একবার বারান্দায় দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত-পদে একেবারে তিনতলায় ছাদে উঠে গেল। যা মনে করেছিল ঠিক তাই! ছাদে পা দিয়ে এবার সে শিউরে ওঠে। দেখে নূতন বৌ সেই বেদীটার ওপর শুয়ে অগাধে ঘুমচ্ছে।

বৌদি ও বৌদি? বলে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই চমকে উঠে বসে সে যেন চারদিকে কাকে খুঁজতে থাকে!

ছি! বৌদি তোমাকে না এখানে আসতে নিষেধ করেছিলুম। বলে কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতেই নতুন বৌ ফিক করে হেসে ফেললে, ঠাকুরঝি, আমার কোন দোষ নেই। তোমার দাদাকে বলোগে ভাই! তোমার দাদা কোথায় গেল ভাই?

দাদা? বিস্ফারিত নেত্রে, তাকে প্রশ্ন করলে নেলী।

হাঁ, দেখ না আমাকে জোর করে ডেকে নিয়ে এসে, তারপর নিজে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

তার মানে! দাদা তো নীচে বৈঠকখানা ঘরে ঘুমচ্ছে—আমি এইমাত্র দেখে এলুম—

ওমা কি দুষ্টু! আমি যেই ঘুমিয়ে পড়েছি অমনি পালিয়ে গেছে একলা আমাকে এ ঘরে ফেলে রেখে! বলে ফিক্ করে একটু হাসলো।

কথাটায় মধ্যে কোথায় যেন একটা ঘোরতর রহস্য আছে বলে মনে হয় নেলীর! তার দাদা তো কখনো এমন কাজ করতে পারে না। বিশেষ করে এই বেদীটার ওপর সে কিছুতেই বসতে পারে না। তাই সংশয়াকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে

নেলী ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, দাদা এ কাজ কখনই করতে পারে, না, কেন মিছে তার নামে বদনাম দিচ্ছ ?

তবে কি আমি আর কোন পুরুষের সঙ্গে এখানে শুয়েছিলুম বলতে চাও—

আবার শিউরে ওঠে নেলী। কি যা-তা বলছো। চলো নীচে শিগ্‌গির, বলে তার হাতটা ধরেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে। একি! তোমার গায়ে এ আতরের গন্ধ এলো কোথা থেকে। নাকটা ওর বুকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলে উঠলো কঠিন স্বরে, নিশ্চয়ই তুমি এই ঘরে ঢুকেছিলে ?

ওঘরে কেন ঢুকতে যাবো ভাই, ও ঘর তো বন্ধ। তুমি আমাকে বলেছিলে ও ঘরে কেউ ঢোকে না। বন্ধ থাকে।

মিথ্যে কথা। তুমি নিশ্চয়ই ঢুকেছিলে ও ঘরে, নইলে লক্ষ্ণৌর এই বিখ্যাত কস্তুরী আতরের গন্ধ তোমার গায়ে এলো, কোথা থেকে ? এ আতরের শিশিটা তো ওই ঘরেই বন্ধ আছে।

আমি জানিনা। যে আমাকে এখানে এনেছে তাকে জিজ্ঞেস করোগে ভাই। আমার ওপর রাগ করছো কেন!

সে কখনো ও ঘরে ঢুকবে না, আমি ভাল করে জানি বলেই বলছি।

তাহলে ভূত এসেছিল দিতে।

কি বললে ? চমকে উঠলো নেলী।

হাঁ, আমি ও ঘরে ঢুকিনি, তোমার দাদা ঢুকলো না, তাহলে কেদিতে যাবে আতর—এ বাড়ীতে নিশ্চয়ই ভূত আছে!

চুপ! চুপ! বলে খপ্‌ করে নেলী নতুন বৌয়ের মুখটায় হাত চাপা দিতেই থরথর করে তার হাতটা কেঁপে ওঠে। ননদের হাতের এই কাঁপুনি মুখের ওপর অনুভব করামাত্র নতুন বৌয়ের সারা দেহে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ননদিনীর কঠিন মুখের দিকে চোখ পড়তেই সে থেমে গেল। তারপর যেন সত্যের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে। বলে, মাইরি বলছি, আমি এ সবের কিছু জানি না।

ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কেন এখানে আমাদের

নিষেধ সত্ত্বেও এসছো, বলো শিগ্‌গির। নেলীর চোখ-মুখের সমস্ত রেখাগুলো যেন এক সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠলো।

ননদিনীর এই উগ্রমূর্তি দেখে নতুন বৌ বলে, আমি কত নিষেধ করলুম তাকে কিন্তু কিছুতেই শুনলে্‌ না। এখানে আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে এলো বিশ্বাস করো ঠাকুর ঝি।

দাদার মুখ দেখতে তোমায় নিষেধ করিনি?

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে নতুন বৌ, নিয়মমত কালরাত্রি তো পেরিয়ে গেছে কাল। তাছাড়া মুখ আমি দেখিনি।

ন্যাকামো করো না? এই তুমি নিজেই বললে যে তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে।

শুয়েছিলুম সত্যি কিন্তু অন্ধকারে তার মুখটা কিছুই দেখতে পাইনি বিশ্বাস কর ঠাকুরঝি।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যা' ইচ্ছে তাই করতে পারো তাতে আমাদের বলবার কি অধিকার আছে? অভিমানে যেন ভরে আসে নেলীর কণ্ঠ। তবে মা যেটা বার বার নিষেধ করেছেন, সেটা না শোনা তোমার খুব অন্যায় হয়েছে। আর দাদা যদি সব জেনেশুনেও তোমায় নিয়ে এখানে এসে থাকে তো—তার অপরাধও অমার্জনীয় বলে মনে করি। ছিঃ ছিঃ মার কানে যদি ঘুণাক্ষরেও এ কথাটা যায়, তা হ'লে কি তার মনের অবস্থা হবে বলো দেখি—

নেলীর হাত দুটো ধরে নতুন বৌ বললে, ঠাকুরঝি ভাই আমায় ক্ষমা কর তোমার দাদা যদি আমায় না ডাকতো তাহ'লে এরকমটা কিছুতেই আমি হতে দিতুম না। বলে একটু থেমে অনুনয়-ভরা স্বরে আবার বললে, মার কানে একথাটা তুমি যদি না তোলো তাহ'লে তো তিনি জানতে পারবেন না—তাই আমার অনুরোধ তুমি এটা চেপে যাও ভাই।

বেশ তাই হবে। কিন্তু আর কেউ ওঠবার আগে তুমি তক্ষণ ঘরে শোবে চল তো? এখনো ভোর হবার দেরী রয়েছে।

ঘরে গিয়ে নতুন বৌ শুলো না। খাটের ধারে বসে ননদের

হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, ঠাকুরঝি ভাই, আমার কাছে লুকিয়োনা, কি ব্যাপার ছাদের ওই বেদীটার ওপর তোমার এখুনি বলতেই হবে। আমার বড় কৌতুহল হচ্ছে। আচ্ছা আমি দিব্যি করছি, এই তোমার গা ছুঁয়ে, সে কথা আর কাউকে বলবো না।

নেলী এবার আর না বলতে পারলে না। ঘরের দরজাটায় খিল দিয়ে এসে আস্তে আস্তে শুরু করলে। প্রথমেই অবশ্য খানিকটা ভূমিকা করে বললে, আজকে না শুনলেই ভাল ছিল বৌদি, মিছিমিছি তোমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে—আজ একটা শুভদিন। বলে একটু চুপ করে থেকে সে হঠাৎ বললে, আমার বড়দার ওই বেদীটি ছিল খুব প্রিয়। ওটা তিনি নিজে হাতে তৈরী করেছিলেন। অপিস থেকে ফিরে ওইখানে চাঁদের আলোয় শুয়ে থাকতেন, অনেক রাত পর্যন্ত। টবে নানারকমের ফুলগাছ করেছিলেন। তাঁর চারি পাশে গোলাপ, বেল, জুঁই, রজনীগন্ধার ফুলফুটে থাকতো। একদিন হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা ত হতবাক। সুস্থ মানুষটা বাড়ী থেকে চলে গেল, আর ফিরল না।

কেন, কি হয়েছিল? জিজ্ঞেস করে নতুন বৌ।

একটু থেমে নেলী বলে, কিছু হয়নি। আত্মহত্যা করেছিলেন।

এ্যা, কি সর্বনাশ!

তিনি বুঝি ওই বেদীটার ওপর মারা গিয়েছিলেন! নতুন বৌ সভয়ে প্রশ্ন করে।

নেলী বলে, না ভাই, তাহলেও তো খানিকটা সান্ত্বনা থাকতো। কান্না-চাপা স্বরে বললে, বড়দাকে কতদিন আমি ঠাট্টা করে বলতুম, তোমার ফুলশয্যা ওইখানে করবো। শিগ্‌গির তুমি বিয়েটা করে ফেলো! বেল, জুঁই, গোলাপ, রজনীগন্ধা সবে ফুটতে শুরু করেছে, আর দেরী করো না! দাদা হাসতো।

চোখে জল ভরে এলো নেলীর। আমরা জানতুম, বড়দা একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন

না। এইবার এর চোখের জল রাখতে পারলে না। কেঁদে ফেললে নেলী। বললে, বিয়ের সব ঠিক করে ছুটি নিয়ে এসে ঘরে নিজের পছন্দ মত খাট বিছানা থেকে আসবাব পত্র সব কিছু কিনে কেটে এই ওপরের ঘরে গুছিয়ে রেখে চলে গেল আর ফিরল না।

নতুনবৌ বললে, কোথায় চলে গিয়েছিলেন ভাই?

এলাহাবাদে। তিনি রেল অপিসের চাকরীতে বদলী হয়ে যান। সেইখানেই একটি মেয়েকে দারুণ ভালবেসেছিলেন। তাদের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তাও সব মৌখিক হয়েছিল। মার কাছে পাকা দেখা ও বিয়ের তারিখ সব জেনেশুনে নিয়ে যখন পনেরো দিন ছুটির পর ওখানে ফিরে গিয়ে দাদা শুনলেন যে ইতিমধ্যে সেই মেয়েটির সঙ্গে একটি ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের বিয়ে কেবল স্থির করেননি তার মামা মামী, পাকা দেখা হবে, তার পরের দিন।

এই খবর পেয়ে বড়দার মনে এত আঘাত লাগে যে সেই মেয়েটির পাকা দেখার দিনই ভোরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

নতুন বৌয়ের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে, আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ওঠে।

নেলী বলে, আরে তুমি কাঁদছো কেন? শোনো আগে সবটা।

—তারপর থেকে প্রায় পাঁচ বছর হতে চললো আমরা ওই ঘরে আর কাউকে শুতে দিই না। যেমন বড়দা নিজ হাতে জিনিষপত্র সাজিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আছে। লক্ষ্ণৌর ওই বিখ্যাত কস্তুরী আতর ছিল তাঁর খুব প্রিয়। দাদা যখনই কারো বিয়ে-থাতে নেমন্তন্ন খেতে যেতেন, একটু আতর রুমালে ঢেলে, মুখটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বেরিয়ে যেতেন। তাঁর সেই ব্যবহার করা আতরের শিশি তেমনি ঘরে রাখা আছে। সেই থেকে কেউ আর তাতে হাত দেয়নি। এই বলে একটু থেমে আবার বলে,

এদিকে এক কাণ্ড! আশপাশের বাড়ীর লোকেরা মাঝে মাঝে মাকে ডেকে বলেন, ঠিক দাদার মত ছায়ামূর্ত্তিকে নাকি গভীর রাত্রে ওই বেদীর ওপর শুয়ে থাকতে তাঁরা দেখেছেন!

তাই তুমি ভূতের কথা মুখে উচ্চারণ করতে, আমি তোমার মুখে হাত চাপা দিয়েছিলুম।

সত্যি ওঁরা দেখেছেন তাঁকে আসতে এখানে। নতুন বৌ জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোনদিন দেখোনি? আতঙ্কে যেন কেঁপে ওঠে ওর গলা।

মিথ্যে বলবো না ভাই, আমরা কেউ একদিনের জন্যেও দেখিনি। তবে দাদা একদিন গরমকালে ছাদে শুতে গিয়ে, ভয়ে চীৎকরে করে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর জ্ঞান হতে বললে, হাঁ, একেবারে স্পষ্ট দেখেছে। সেই মূর্ত্তি, সেই চেহারা। কিন্তু সেই একদিন। তারপর থেকে অবশ্য একলা কখনো ছাদে রাত্রে যায় না।

এই বলে চুপ করতেই নেলী দেখে নতূন বৌয়ের মুখটা যেন অসুস্থ রুগীর মত দেখাচ্ছে, হাতটাও থর থর করে কাঁপছে।

নেলীর হাতের ওপর নতূন বৌয়ের হাতটা রাখা ছিল। সে তাই বলে ওঠে, ওকি বৌদি তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, ওসব আলোচনা এখন থাক্। আমি এইজন্যে বারণ করেছিলুম—এই শুভদিনে এসব অলুক্ষণে কাহিনী শুনতে নেই।

কিছুক্ষণ পরে আবার কণ্ঠে জোর পায় নতূন বৌ। বলে, কিন্তু তোমার যে কোন বড়দাদা ছিল বা এইভাবে মারা গিয়েছেন, সেকথা ত আমরা কেউ জানতুম না।

ও কথাটা আমরা জানতে দিইনি ইচ্ছে করেই। অনেক জায়গায় আমার ছোড়দার বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে ওই শুনে—তাই।

আচ্ছা ভাই তোমার ছোড়দার এ বিয়েতে মত ছিল কি?

নেলী বললে, ছোড়দার ঐ সবের বালাই নেই—ও সেকেলে মেজাজের লোক। বলে, মা নিজে যাকে দেখে ঠিক করবেন তাকেই বিয়ে করবো!

কথাটা আবার অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় নতুন বৌ। বলে আচ্ছা ভাই, তোমার বড়দা যে মেয়েটিকে অত ভালবাসতো, আগে জানতে না তোমরা?

নেলী বললে, এতটা যে সত্যি জানতুম না। উঃ সে কি সাধারণ ভালবাসা? আমি একদিন দাদাকে অন্য মেয়ে দেখার কথা বলতে গিয়েছিলুম সে তখন কি বললে জানো, যাকে ভাল-বেসেছি তারই সঙ্গে এ জীবনে ফুলশয্যা হবে।

উঃ কি নিষ্ঠুর। বলে বুকটা চেপে ধরে নতুন বৌ বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। তারাপর চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, কেন একথাটা আমায় শোনালে ভাই।

তোমার মন যে এত নরম তা' জানতুম না বৌদি।

কোথাকার কে একটা মেয়ে তার প্রেমের কাহিনী শুনে মানুষ এত কাঁদে? চুপ করো, চুপ করো। মা উঠে পড়েছেন। লোকজনও সব উঠতে আরম্ভ করেছে।

চোখ মুছে উঠে বসল বটে নতুন বৌ কিন্তু সারাদিন ধরে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। ভাল করে কিছু খেলে না, নামে মাত্র বসলো শুধু। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, কেউ রসিকতা করলে হাসে না—শুধু যেন কি চিন্তা করে।

ফুলশয্যা হবে রাত্তির দেড়টায়। সে সময়টা নাকি খুব ভাল। পঞ্জিকা দেখে পুরোহিত মশায় বলে দিয়েছেন।

নেলী ঠাট্টা করে বৌদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, ভালই হলো তোমাদের, এতরাত পর্যন্ত জেগে কে আর আড়ি পাততে যাবে।

তার উত্তরে কিছু না বলে চুপ করে যায় নতুন বৌ।

এদিকে বৌভাতের হাঙ্গামা চুকতে চুকতেই রাত্তির সাড়ে বারোটা—কুটুম্বরা সব বিদায় নিয়ে চলে যেতে যেতেও প্রায় দেড়টাই হলো।

নেলী দাদার খাট বিছানাটা ফুল দিয়ে ভাল করে সাজিয়ে বৌদিকে নিতে এসে ঘরশূন্য, বৌদি নেই।

বৌদি—বৌদি। মা বৌদি কোথায় গেল? বলে সে মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কণ্ঠে এক প্রকার সন্দিগ্ধ স্বর টেনে বলেন, ওমা নতুন বৌ এত লোকের মধ্যে গেল কোথায়।

বৌয়ের ঘরে যে দু'তিনজন মেয়ে ছিল তারা অগাধে সেখানে

ঘুমুচ্ছে, কাজেই কাকে জিজ্ঞেস করবে? নেলীর বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে কেঁপে উঠলো। এঘর ওঘর দেখেই সে ছুটলো ছাদের দিকে। কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই ছাদের দরজাটা খোলা হাট করা দেখেই আপাদমস্তক তার রাগে রি রি করতে থাকে। কি অবাধ্য বৌ। এত করে সব কিছু বলে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে, নিষেধ করে দিলুম ওপরে না আসতে,...এখুনি ফুলশয্যা হবে, এই শুভক্ষণে কিনা— এবার ছেড়ে কথা কইবো না, হোক্ নতুন বৌ.........

কিন্তু ছাদে পা দিয়েই আঁতকে ওঠে নেলী। দেখে নতুনবৌ এবার ছাদে নয়, একেবারে বড়দার ঘরে ঢুকে, দেওয়ালে টাঙানো তার বড় ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিঃশব্দে তার দু'চোখে ধারা বইছে।

একি বৌদি, তুমি এঘরে এসে একা একা কাঁদছো কেন? কেউ কি তোমায় কিছু বলেছে? না বাড়ীর লোকেরা সব চলে গেছে বলে মন কেমন করছে।

কোন জবাব না দিয়ে, আরো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নতুন বৌ।

তখন নরম গলায় তার পিঠে হাত রেখে নেলা বলে, তোমায় এতো করে নিষেধ করেছিলুম, এঘরে ঢুকতে। সেই আজকের দিনে এই শুভক্ষণে এখানে এলে! তোমার মনে যদি কিছু হয়ে থাকে, আমায় বলতেই পারতে? ছিঃ চোখের জল আজ কি ফেলতে আছে? মুছে ফেলো। চলো তাড়াতাড়ি' সবাই বসে রয়েছে ফুলশয্যা করানোর জন্যে।

না, আমি যাবো না।

সে কি! ফুলশয্যা হবে যে এখুনি।

ফুলশয্যা আমার হয়ে গেছে, কাল। আর হবে না।

এঁ্যা! কি বলছো আবোল তাবোল। তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে?

হাঁ। আর তুমিই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছো। বলে ছোট মেয়ের মত ডুকরে কেঁদে উঠলো। তুমি যদি, না বলতে, আমি জানতেও পারতুম না যে তোমার বড় দাদা আমার

করেছিলেন যার জন্যে সে এই হতভাগিনী। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

কি বলছো তুমি। এ যে বিশ্বাস করা যায় না। বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নেলী তার মুখের দিকে।

হা বিশ্বাস করো ভাই, এলাহাবাদে আমার মামাও তখন চাকরী করতেন। তাঁর কাছে আমাকে মা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে বিয়ের একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন। ছুটিছাটার দিনে তোমার বড়দা, আমার মামার বাসায় তাস খেলতে আসতেন, সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। মামা তাঁকে কথা দিয়ে তারপর তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন সত্যি। তিনি যখন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে তাঁর বিয়ের সব জিনিসপত্তর কেনাকাটায় ব্যস্ত, সেই সময় মামার পিস্‌শ্বশুরের একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনীয়ার, হাজার টাকা মাইনে পায়, হঠাৎ এলাহাবাদে বেড়াতে এসে আমায় দেখে তার খুব পছন্দ হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের দিন তাঁর সঙ্গে স্থির করে ফেললেন মামা। ওখান থেকে চলে যাবার আগেই পাকাদেখাটা সেরে যাবার জন্যে মামাই তাঁদের অনুরোধ করলে তাঁরা রাজী হয়ে যান। ঠিক যেদিন আমার সকালে পাকাদেখা, সেই দিনই ভোরে আত্মহত্যা করেন তিনি। তিনি লিখে গিয়েছিলেন একটা ছোট্ট চিঠি, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। আমার মামার নামটি তাতে লেখা ছিল বিশেষ করে।

পাকাদেখার ঠিক আগের মুহূর্তে পুলিশ সেই চিঠি নিয়ে এসে মামার কাছে হাজির। নানা রকমের জেরা। তখন মামা বলতে বাধ্য হলেন যে তিনি আসতেন যেতেন সে বাড়ীতে। এবং আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা এমনি হয়েছিল, তবে পাকাপাকি কিছু হয়নি।

কিন্তু পাত্রপক্ষ এইসব দেখেশুনে তখনি পাকাদেখা নাকচ করে দিয়ে স্পষ্টই বললেন, যে মেয়ের জন্যে একটা মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে তার সঙ্গে কিছু প্রেমভালবাসা নিশ্চয়ই ছিল। আর থাক বা না থাক, সেই দাগী মেয়েকে ঘরের বৌ করতে পারবো না।

এই বলে একটু থেমে, আবার শুরু করলে সে, এদিকে এলাহাবাদে বাঙালী মহলে, এই নিয়ে বেশ একটা ঘোঁট শুরু হয়ে গেল। আমি আর লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

এরপর মামা আরো যা দু'চারটে সম্বন্ধ জোগাড় করেছিলেন সব একে একে ভেঙে যেতে থাকে। তখন আবার আমাকে মার কাছে দেশে তিনি পাঠিয়ে দেন। বলেন, ঘুণাক্ষরেও না এসব কথা দেশের কেউ জানতে পারে! তাহলে আর বিয়ে হবে না!

তারপর থেকে এই চার পাঁচ বছর ধরে অনেক চেষ্টা করার পর মায়ের মামাতো দেওরের এক বিবাহ অপিস থেকে এই সম্বন্ধটা মাকে পাঠিয়ে দেয়।

নেলী অবাক হয়ে শুনছিল। ওকে থামতে দেখে বললে তারপর?

নতুনবৌ আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তিনি এত ভালবাসতেন বলেই বোধহয় এমনি করে তাঁর ঘরেই আবার টেনে এনেছেন!

ছি ছি ওসব বলতে নেই ভাই, আজ শুভদিনে।

চোখের জল মুছতে মুছতে নতুনবৌ বলে, একটা কথা কাউকে বলিনি, শুভদৃষ্টির সময় তোমার দাদার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে আমি শিউরে উঠেছিলুম ভয়ে। তোমার দাদার মুখের বদলে হঠাৎ মনে হলো যেন আমি দেখছি তোমার বড়দাকে।

এ্যা, কি বলছো! এই দেখো, আমার সারা গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

মালাবদল করার সময়ও একই দৃশ্য—তোমার দাদার গলায় মালা দিতে গিয়ে দেখি আগেই তোমার বড়দা যেন তাঁর গলাটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। মালাটা তাই তোমার দাদার গলায় না পড়ে, বুকের ওপর পড়ে গেল।

কি বলছো! এসব তো শুনিনি!

শুভদৃষ্টি হচ্ছিল চাদরের তলায়, পাড়াগাঁয়ে আলোর তেমন জোর ছিল না। তাই অনেকেই ভাবলে, একেবারে উপোষ করে

না খেয়ে রয়েছি বলেই হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেছে, চোখে অন্ধকার দেখেছি। মাকে সবাই এর জন্যে তিরস্কার করতে লাগল। আজকাল সবাই বিয়ের আগে দুধ সন্দেশ খেয়ে নেয়, এখন কি সেই আগেকার কাল আছে ?

কিন্তু আমি জানতুম এর আসল কারণটা কোথায়। কাউকে সে কথা মুখ ফুটে বলিনি। জানতেও দিইনি। তোমার দাদা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন।

বলতে বলতে আবার চোখের জল মোছে নতুনবৌ। তারপর ননদকে বলে, ওই যে আতরের গন্ধ বলছো কাল যা আমার গায়ে পেয়েছিল, সে তোমার বড়দা-নিশ্চয় দিয়েছিল।

চমকে উঠে নেলী বলে, কৈ সেকথা তো তুমি কাল বলোনি ? তুমি বললে, মুখের দিকে তাকাওনি, কালরাত্রি মুখ দেখতে আমরা বারণ করে দিয়েছি বলে !

সত্যি বলছি ভাই। চোখে যেন তখন ঘুমের ঘোর লেগেছিল, তার ওপর অন্ধকার ঘুটঘুট করছিল ছাদটায় ! তুমি যখন সন্দেহ প্রকাশ করছিলে, তোমার দাদা কখনো এমন কাজ করতে পারে না, তখনো এটা আমার মাথায় আসেনি। ভাবলুম, তোমার দাদা যেটা গোপন করতে চায় তোমাদের কাছে, আমি সেটা ফাঁস করে দিই কেন, তাই চেপে গিয়েছিলুম। কিন্তু আমি যেই তোমার মুখ থেকে তোমার বড়দার মৃত্যুর কাহিনী শুনলুম, তখন আর আমার সন্দেহ রইলো না, সে-ই তাহলে ফুলশয্যা করেছে কাল আমার সঙ্গে চুপিচুপি। ওদিকে বিয়ের দিনে শুভদৃষ্টি, মালাবদলও সকলের আড়ালে তার সঙ্গে আমার হয়ে গেছে। তাই যে আমার জন্যে ঘর সাজিয়ে রেখেছিল, সে-ই আমাকে তারই ঘরে নিয়ে এসেছে বলে কাঁদছি তার কাছে ! বলছি, আমায় ক্ষমা করো। আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই। আমি গরীব দুঃখীর মেয়ে, মামার আশ্রিতা, মামার গলগ্রহ ছিলুম, তাই সেদিন মামার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করতে পারিনি। এই অপরাধের জন্যে আমায় ক্ষমা

করো। বলতে বলতে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

নেলী এরপরে কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে দাদার কাছে নেমে গেল। তারপর তাকে ওপরে ডেকে এনে নতুনবৌ যা যা বলেছে সব নিবেদন করলে। আচ্ছা দাদা, সত্যি কি মালাবদল করার সময় মালাটা তোমার গলায় না দিয়ে বুকের ওপর ফেলে দিয়েছিল বৌদি? আর শুভদৃষ্টির সময় চোখ চেয়েই, শিউরে উঠে চোখবন্ধ করে ফেলেছিল!

হাঁরে। যা শুনেছিস, সবই সত্যি!

নেলী এবার ভয়ার্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি হবে দাদা? বৌদি বলছে তার অশরীরী আত্মা যখন রয়েছে এখানে, তোমরা দেখেছো, তখন তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। বিধবা যেমন স্বামীর ঘর করে, আমি তেমনি ভাবে এই ঘরে থাকবো, তোমরা যদি তাড়িয়ে না দাও! সে কী করে সম্ভব দাদা! আর লোকজনের কাছে আমরাই বা কি কৈফিয়ৎ দেব। তুমি নিজে ওকে একটু বোঝাতে চেষ্টা কর, দেখ যদি মত বদলাতে পারো।

দাদাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, নেলী বললে, ভূতে ধরেনি তো বৌদিকে! নইলে এমন অসম্ভব কথা কেউ কখনো শুনেছে! বলে কাল রাত্রে আমার ফুলশয্যা হয়ে গেছে। আতরের গন্ধ দিয়ে সেকথা জানিয়ে দিয়ে গেছে সে। এ পাগলামী ছাড়া আর কি?

নারে! দাদা বলে নেলীকে, এ সত্যি! অতৃপ্তকামনা নিয়ে যারা মরে, তারা এইভাবে আসে আবার তাদের কামনা চরিতার্থ করতে। আমি ঠিক এই রকম দু'একটি ঘটনা ও দেশের দু'একজন মনীষীর লেখা বইতে পড়েছি! একেবারে খাঁটি সত্যি, প্রত্যক্ষ বিবরণ। এইভাবে অশরীরী আত্মার সঙ্গে মেয়েটি স্বামী-স্ত্রীর মত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে থাকে।

কি বলছো দাদা?

হাঁরে, যা বলছি সত্যি। তোকে ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে

সে বইটা এনে পড়াতে পারি। একেবারে নাম ধাম বিবরণ সব কিছু দেওয়া আছে। তুই পড়লে আশ্চর্য হয়ে যাবি, একেবারে হুবহু জ্যান্ত মানুষের মত তারা আসে যায়, খায় দায়, শোয়, এমনকি মশারী তুলে বিছানা থেকে বেরিয়ে যায়।

নেলীর গলা কেঁপে ওঠে। বলে ওই আতর বৌদির গায়ে কেমন করে এলো! ওকে ডেকে এনে ছাদে ওই বেদীর ওপর, ওর কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল, যা বলছে ও সবই তাহলে সত্যি! তুমি বিশ্বাস করো?

হাঁরে হাঁ। বিশেষ করে ওঁর যখন বিশ্বাস আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। উনি থাকুন, আমাদের বৌদি হয়ে।

নেলী বলে, মাকে আমি এসব বলতে পারবো না। তুমি নিজে গিয়ে বুঝিয়ে বলো দাদা।

আচ্ছা, আমি বলছি। তোকে ভাবতে হবে না কিছু। বলে মায়ের ঘরে গিয়ে সব বুঝিয়ে বললে। বললে, মা এমন অঘটন কত ঘটছে এই বিপুল পৃথিবীতে আমরা তার কতটুকু খবর রাখি। ভালই হলো, তোমার বড় বৌ আজ তোমার ঘরে এলো, দুঃখ কিসের? বিয়ের পর যদি হঠাৎ দাদার মৃত্যু হতো, তাহলে? যার জন্যে দাদা এত আগ্রহ করে ঘর সাজিয়ে রেখেছিল, সেই বৌ-ই আজ তোমার ঘরে এলো। এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে মা!

তুমি যদি তাকে বৌদি বলে মনে করতে পারো, তার চেয়ে বেশী আর কিছু আমি চাই নারে। ছোট বৌ না হয়ে, সে আজ থেকে আমার বড় বৌ হয়েছে।

।। সুমথনাথ ঘোষ ।। ১৯১২ সালে জন্ম গ্রহন করেন। দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী এই লেখক আজও সতেজ ও সক্রিয়। সাহিত্যের কোন ধারায় বা গোষ্ঠীতে যুক্ত না হয়েও গতানু-গতিকতার বহমান স্রোতে গা না ভাসিয়ে লেখক গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গীতে অনন্য। ১৯৭৯ সালে মতিলাল পুরস্কার পান। ভৌতিক গল্প রচনায় লেখক সিদ্ধহস্ত। উল্লিখিত "বিয়ে" গল্পটি বাংলা ভৌতিক গল্পের গতানু-গতিকতার স্রোত ধারায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তাঁর রচনা একটু স্বতন্ত্র মেজাজের।



বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলেও

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

বহু ঘটনা জীবনে ঘটে যায় ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার মতে অজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের অভাবই এর কারণ। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিটী বিষয়েরই ব্যাখ্যা একদিন মিলবে। বহু ক্ষেত্রে দেরীতে অনুসন্ধান করাতে তার প্রমান পাওয়া কঠিন হয়। আমার জীবনে ঘটা এমন কয়েকটি সত্য ঘটনার বিষয় আমি বলবো।

আমি ১৯৩৮ সনে শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত ইনেস্পেকটার। রাত্রিকালীন রোঁদ হতে থানায় ফিরে আফিসে বসেছি; এমন সময় টেবিলের উপরকার টেলিফোন যন্ত্রটা ক্রীং ক্রীং করে বেজে উঠলো।

ঐ যন্ত্রের ওপার হতে একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। মিষ্টি গলাতে শান্ত ভাবে ঐ বালকটি জানালো: মশাই। আমাদের এত নম্বরের কপি বাগান লেনে একজন গলায় দড়ীতে মারা গেছে। দয়া করে একটু তাড়া তাড়ি এখুনি এখানে আপনারা আসুন।

এতো রাত্রে খবরটা অত্যন্ত বিরক্তি-কর। এদিকে রাত তখন আড়াইটা বাজে। রাত তো আমি রাউণ্ডেতে তো জেগেছেই। এখন এত রাত্রে কোনও সহকারীকে ডাকিয়ে আনানো অন্যায় হবে। এই ভেবে—আমি একজন জমাদার ও একজন সিপাহী সঙ্গে করে তদন্তের জন্য ঘটনা স্থলে রওনা হলাম।

ঐ ঘটনা স্থলের কাছে রাস্তার মোড়ে অতো রাত্রে একজন

ালককে দেখা গেল। বছর ষোল বয়েস হবে। সুশ্রী সুন্দর ও নিটোল তার স্বাস্থ্য। বুঝলাম—ছেলেটি তাদরে আত্মীয় স্বজনকেও খবর দিয়েছে। তাদের অপেক্ষাতে সে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গলার স্বর হতে বুঝলাম যে কিছু পূর্বে সেই কোনেতে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। ছোকরা আমাকে বললো: 'স্যার। সোজা চলে যান। তারপর বাঁ দিকের গলিতে মোড় নিন। দরজাতে ঐ বাড়ীর নম্বর লেখা দেখবেন।' আমরা তার নির্দেশ মত এই গলি ও গলি ঘুরে ঐ বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেম, কিন্তু— চতুর্দিক অন্ধকার দেখে অবাক। ঐ বাড়ীর দরজা যথারীতি ভেতর হতে বন্ধ ছিল। বারে বারে আমরা দরজার কড়া নাড়ী। কিন্তু ভিতর হতে কাউর কোনও সাড়া নেই। পরিশেষে জোরে জোরে আমরা দরজাতে ধাক্কা দিতে থাকলাম।

বেশ কিছু পরে ঐ বারান্দার মধ্যেকার একটা বিজলী বাতি জ্বলে উঠলো। জনৈক প্রৌঢ় ব্যাক্তি ঘুম চোখে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে পুলিশ দেখে ভদ্রলোক ভীত ও বিস্মিত।

আমি তাঁকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। 'মশাই। আপনাদের বাড়ীতে কোনও গলায় দড়ীতে মরার কেস হয়েছে?' আমার ঐ কথাতে আঁতকে উঠে ভদ্রলোক বললেন: আরে। ষাট ষাট। একি অলক্ষনে সব কথা শুনান। এটা অতো নম্বর কপি বাগানের বাড়ী বটে। কিন্তু—এখানে কোনও জন আত্মহত্যা করে নি। আপনারা অন্যত্র কোন বাড়ীতে দেখুন।

আমি তাঁকে একটু নেমে এসে কথা কইতে বলছি। কিন্তু তাতে তিনি নারাজ। এমনি তর্কা তর্কি বেশ কিছুক্ষণ চলেছে। এমন সময় বাড়ীর অন্য জনেরাও জেগে উঠেছে। ঘরে ঘরে বিজলী বাতীও জ্বলেছে। এর কিছুক্ষণ পরেই ভিতর হতে কান্নার রোল উঠলো। ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন হয়ে ভিতরে গেলেন।

ওঁরা তৎক্ষণে একটি হৃদয় বিদারক দৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। তাদের বাড়ীর ষোল বৎসরের একমাত্র পুত্র তার পড়ার ঘরেতে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল।

ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে নিচে এলেন ও আমাদে ঐ দুঃসংবাদ জানালেন। তবে—উনি এও জানালেন যে, এই সংবা থানাতে পাঠানোর কোনও প্রশ্নই উঠে না। কারণ ঐ ঘটনা তাঁরা এই দেখলেন ও জানলেন। উপরন্তু ওখানে ও নিকটে কারুর টেলিফোনও নেই।

এবার আমরা সদলে দ্বিতলে উঠে নির্দ্দিষ্ট কক্ষেতে তথা ঘটনা স্থলেতে এলাম। কিন্তু—সম্মুখে যিনি কড়ী কাঠেতে দড়ী লাগিয়ে ঝুলছিলেন তাঁকে সরজমীনে দেখে আমরা তিনজনেই অর্থাৎ আমি এবং আমার সঙ্গের জমাদার ও সিপাহী : তিনজনেই ভীত হয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছি। কিন্তু আমি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। কিছুক্ষণ পরেতেই আমি বিষয়টা আন্দাজে বুঝলাম। ফলে আমার হৃদকম্পনও বন্ধ হলো। এবার কিছুটা লজ্জিত হয়ে আমি বিজ্ঞের মত ঐ ভদ্রলোককে বললাম : 'হুম্। বুঝলাম সব। এরা তাহলে জমজ ভাই। এখন ওদের অন্য জন গেল কোথায়? এখনো কি সে বাড়ী ফিরে নি। তাকে কোথায় পাঠালেন আপনি। তাকে আমরা এখুনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।

আমার এই প্রশ্ন গুলি শুনে অবাক হয়ে ভদ্রলোক বললেন: 'না না। এর কোনও ভাই নেই। এরা জমজ ভাই নয়। তাহলে তো ওদের একজন থাকতো।' ভদ্রলোক কেঁদে ফেলে বললেন: 'আমাদের বংশে ঐ একটি পুত্রই ছিল।'

ভদ্রলোকের এই উত্তর শুনে পুনরায় ভয়েতে আমার পূর্বের মত কাঁপুনি আরম্ভ হলো। এবার আমার মনেতে কোনও যুক্তি আর টেঁকে না। গলির মুখে একটু আগে দেখা সেই ছেলেটিই গলাতে দড়ী বেঁধে উপরের কড়ীর আংটা হতে ঝুলছে। পায়েতে ঠেলে ছুরে ফেলা টুলটা মাটিতে গড়াচ্ছে। ঐ সময় তার পায়েতে ছুটো রঙ চঙে মত স্যাণ্ডেল আমরা লক্ষ্য করে ছিলাম। ওর একটি তখনও তার একটি পা'য়ে লাগানো। ওর অন্য পাটিটি মেঝেতে পড়ে রয়েছে। পরনে তার সেই টেরলিনের প্যান্ট ও

ডোরা কাটা কুল হাতা গেঞ্জি। চোখের সেই প্যাঁচনো চশমাটা কান হতে ঝুলছে। সেই বাবরী কাটা চুল ও মিষ্টি মুখ। তবে —তা হতে কোনও মিষ্টি সুর বেরোয় না। ওরই মধ্যে তার প্রাণ দেহ হতে বিচ্যুত হয়েছে। তার মুখ হতে ঝরে পড়া লালা হতে বুঝলাম যে তার দেহ এখন নীচে নামানো বৃথা।

আর একটু ক্ষণও এখানে অপেক্ষা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এমন কি থানাতে অতো রাত্রে একা ফিরতেও আমার ভয়। আমি হেড কনেষ্টবলকে আমার সঙ্গে নীচে নামতে বলে ঐ সিপাই মাধো সিংকে বললাম: 'দেখো। তুমি ইঁহি পর লাস পাহারা দেও। মে লোক ফজীর, মে ফিন্ হিঁয়া আয়গা।' উত্তরে ওই সিপাই আঁতকে উঠে বললো: 'নেহী হুজুর! নোকরী চলা যায়গা। তভি মে হিঁয়া নেহী রহেগী।' ওই জমাদার ও সিপাহীও ঐ ছোকরাকে একটু পূর্বের পথেতে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। তাদেরও মনের অবস্থা হুবহু আমার মত ছিল।

আমরা বেরিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে ও উপর দিকে চেয়ে বুঝে ছিলাম যে এর মধ্যে ফিরে এসে কোনও গোপন পথে তার পক্ষে ঐ সদর দরজা না ভেঙ্গে ঐ বাড়ীর ত্বিতলে উঠা সম্ভব ছিল না। ওদিকে—টেলিফোনে শুনা তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার ঐ গলি মুখে থাকা কালের কথা কওয়ার স্বরে হুবহু মিল ছিল। তবু— কাউর আত্মার দেহ ধরে চলা ফিরা ও কথা বলার ক্ষমতাতে আমার বিশ্বাস আসে না। কিন্তু—অন্য সরকারী কাজে ব্যস্ত না থাকলে এর প্রকৃত কারণ নিশ্চই আমি খুঁজে বার করতাম। আমার আজও বিশ্বাস যে ঐ বালকই কোথাও হতে আমাদের ফোনে খবর দিয়ে ও পথেতে অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে কথা ব'লে। পরেতে কোনও উপায়ে ঐ বাড়ীতে ঢুকে অন্যদের অলক্ষ্যে আত্ম-হত্যা করেছিল। তবে—ঐ আত্মহত্যার কোনও কারণ এবং মোটিভ তথা উদ্দেশ্যও তখন জানা যায় নি। পথে নেমেও ভয় আমাদের মন হতে যায় নি। মধ্যে মধ্যে আমরা পিছনে কাউর পায়ের শব্দ শুনছিলাম, কিন্তু বারে বারে পিছনে ফিরে সেখানে

কাউকে দেখলাম না। পরে—যতবার এগলি ওগলি ঘুরে আমরা বাগবাজার ষ্ট্রিটে আসতে চেয়েছি। ততবারই আমরা পথ ভুলে খাল ধারে এসে পড়েছি। পরে বাধ্য হয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ঘুরে তবে আমরা থানাতে ফিরতে পেরেছিলাম।

* * * *

এবার অন্য একটি শুনা কাহিনী আমি এ সম্বন্ধে শুনাবো। এটি বাল্যকালে আমি এক অশীতী বর্ষীয় ধার্ম্মীক দাদু শ্রেণীর প্রতিবেশীর মুখে শুনেছিলাম।

"আমি পিসিমার সঙ্গে বিহারের এক বাড়ীতে থাকতাম ও সেখানে পড়া শুনা করতাম। এর পর পিসেমশাই মারা গেলেন। আমি তখন পিসিমার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বৃহৎ কোঠা বাড়ীতে ফিরলাম ও স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্ত্তী হলাম। আমাদের এ বাটী বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল। চক মিলানো বাটীর প্রাঙ্গনে আতা গাছের জঙ্গল গজিয়েছে। বাইরের একটা ঘর পরিষ্কার করে আমরা বসবাস করছি। এই বাটীতে বাল্যকালে আমার মাতার ও পিতার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত আমি বাস করেছি। এর প্রতিটী স্থান আমার চেনা। ঐ কালে পাড়ার পুঁটী বলে একটী কিশোরী আমার খেলার সাথী ছিল। তার সঙ্গে আমার বড় হলে বিয়ে হবার কথা উঠতো। আমি গ্রামে ফিরেই প্রথমে তার খোঁজ করে জানলাম যে পুঁটী দু'বছর আগে মারা গেছে।

ঐ দিন আমি স্কুল হতে ফিরে বাইরের ঘরেতে জিরুচ্ছি। পিসীমা ঐ সময় একটা আঁকাশী হাতে ঐ উঠানের আতা গাছ হতে আমার জন্য দুটো আতা ফল আনতে গেলেন।

হটাৎ পিসীমার একটা ভীষন আওয়াজ উঠান হতে আমার কানে এলো—আঁ আঁ। আঁক। আমি তা শুনে দৌড়ে উঠানের জঙ্গলে এসে দেখি পিসীমা আঁকশী হাতে চিৎ হয়ে মাটীতে পড়ে গোঁ গোঁ করছেন। আমি তাঁকে তখুনি পাঁজা—কোলা করে তুলে বাইরের ঘরেতে এনে বাড়ীর ঠিকা ঝি ক্ষেপী বাগদীর জিম্মাতে রেখে ফের ওর কারণ বুঝতে ঐ উঠানেতে দৌড়ালাম।

ওখানে এসে অবাক হয়ে দেখি আমাদের ঐ মৃতা পুঁটী একটা লাল টকটকে শাড়ী পরে গাছের ডালেতে পা রেখে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাঁসছে। বুঝলাম যে একে দেখেই পিসীমা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে পুঁটীর মৃত্যুর খবরটাই ভুল।

আমি অবাক হয়ে পুঁটীকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'আরে। পুঁটী। তুই নাকি মরে গেছিস?' পুঁটী আমার এই কথাতে হেসে বললো: 'তা কি করবো বলো। তুমি আর আমার খোঁজ করলে না। ওদিকে ওরা আমার অন্যত্র বিয়ে ঠিক করলো। তাই ঠিক বিয়ের আগের দিন আমি জলে ডুবলাম। আমি জানতাম যে, তুমি একদিন এখানে ফিরবে। তাই তোমাদের বাড়ীতেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'বাস। পুঁটীর সঙ্গে এদিন হতে গোপনে আমার মেলামেশা চললো। আমি স্কুল হতে ফিরেই খাবারের বাটী হাতে আমাদের ত্রিতলের চিলের কোঠাতে উঠতাম। আর পুঁটী ঐ সময়েই হাওয়াতে ভর করে হুম্ করে এসে দেহ ধরে পৌঁছুতো। ওখানে একটা পুরানো কাঠের সিন্ধুকে ব'সে দুজনে দুজনকে কত আদর করতাম।'

এই পর্যন্ত শুনে আমি বিস্মিত হয়ে দাদুকে জিজ্ঞাসা করলাম: পুটু দিদি'র দেহটা কি ঠিক মানুষের মত ছিল। সে দেহ ধরলে মানুষের মতই কথা বলতো।' দাদামশাইএর চোখ দুটো এ শুনে বড় হয়ে উঠলো। তিনি উত্তরে বললেন: হাঁ। কথা তো বলতই। এমন কি—আমার আনা খাবার হতে অর্দ্ধেক খাবার সে খেয়েও নিত। তার পর আদর করে আমার গালেতে ইঁদুরের মত কুট কুট করে আলতোভাবে দাঁত ফুটাতো।'

এরপর প্রায় কেঁদে ফেলে ঐ দাদামশাই আমাকে বললেন: 'কিন্তু দাদা ভাই। এতো সুখ আমার সইলো না। একদিন কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে পুঁটী বললে: আর নয়। আজি আমার শেষ দিন। তবে যাবার আগে তোমাকে একটা দ্রব্য দেবো। এতে কোনও ভূত-পেত্নী তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এই বলে সে আমার ডান বাহুর উপরে নখ

দিয়ে চিরে একটা ডেলা ঢুকালো। তারপর হাত বুলিয়ে ওটা বুজিয়ে দিলে। আমি ব্যথা তো এতে পেলামই না। এমন কি ব্যাপারটা বুঝতেও পারলাম না। এর পর হুস করে পুঁটীর দেহ হাওয়াতে মিলিয়ে গেল।'

আমরা দাদুবাবুর বাহুর ঐ স্থানে টিপে দেখলাম যে ঐ ত্বকের তলাতে একটা শক্ত ডেলা সত্যই নড়া চড়া করছে। ঐ দাদুবাবুর আ-জীবন বিবাহ না করার কারণও ঐ দিন আমরা বুঝেছিলাম। আশ্চর্য এই যে পড়শী দাদা মশাই একজন ধার্মীক ও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। সত্যবাদীতার জন্য গ্রামে তাঁর সুনামও যথেষ্ট।

পরে—অবশ্য আমি খোঁজ নিয়ে জানি যে পুটী নামে একটী গ্রামীণ মেয়ে অতীতে কোনও এক কারণে জলে ডুবে মরে। অন্যদিকে ঐ দাদা মশাই পুঁটীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে পালান ও বুয়োর যুদ্ধে যোগ দেন। ঐ যুদ্ধে বোমার স্পিলনটারে উনি আহত হন। তাঁর ঐ বাহু হতে লোহার সব কটা টুকরো বার করা যায় নি।

এখানে বক্তব্য এই যে সত্যিই কি দাদামশাই মিথ্যা বলেছেন। না। তা নয়। কেউ যদি একটা কল্পিত ঘটনা বার বার ভাবে তা হলে মনস্তাত্ত্বিক কারণে পরেতে একসময় উহা সত্যই ঘটেছিল ব'লে সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এর ফলে তারা বহু মিথ্যা কাহিনী সত্য বলে প্রচার করে। পৃথিবীতে যে সকল অলৌকিক কাহিনী সম্বন্ধে যুগে যুগে শুনা যায় তার স্থলে থেকেছে কোনও না কোনও বিশ্বস্ত ও সৎ লোকের এই মিথ্যা বাদীতা মনো রোগ। একে ইংরাজীতে প্যাথোলেজিক্যাল লাইজ বলা হয়। অপূরীত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথাহত প্রদমিত মন হতে এর উদ্ভব। কিছু ক্ষেত্রে —এরা মিথ্যা বলে একটা স্যাডিসটিক পুলক শিহরণ অনুভব করে।

তবে—কিছু অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে যে বহু সত্য না থাকে তা'ও নয়। নিম্নে এই সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মুখে শুনা নিম্নোক্ত কাহিনীটী প্রনিধান-যোগ্য। ভিতরের বিষয় না বলে দিলে এটীও মুখে মুখে প্রচারিত একটী অলৌকিক কাহিনী হতে পারতো।

"প্রাচীন যুগে গাঁয়ে ঘরে পর্দ্দা প্রথা ছিল কঠোর। বাড়ীর প্রবীণদের মত গ্রামের প্রবীণদেরও থাকতো সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তবুও আমাদের গোপন অভিসার তাতে বন্ধ করা যায় নি। এ যুগের মত ঐ যুগেও গুপ্ত প্রেম একই রূপেই হতো।

এই রাত্রে প্রচুর জোছনা উঠেছে। দাদা ও বৌদি প্রখর গ্রীষ্মেতে ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন। কিন্তু তাতে আমি গ্রাহ্য করলাম না। আমি ইয়া মোটা পৈতা গলাতে ঝুলিয়ে কষায় বস্ত্র পরে খড়ম পায়ে খট খট করে তাঁদের এড়িয়ে পাশের বেলগাছ বেয়ে পাশের বাড়ীর উঠানে নামলাম। যেতে যেতে শুনলাম যে, বৌদি জেগে উঠে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাদাকে বলছে: 'ওগো। দেখছো ? দাদা বৌদিকে ধমক দিয়ে বললেন। 'তুই চুপ কর। ও আমি রোজ দেখি। উনি আমাদের ছোড় দাদু। গয়াতে ওঁর জন্য পিণ্ডি দিই বা না দিই সে আমি বুঝবো। খবরদার। এ কথা যেন সাত কান না হয়।' অর্থাৎ আমাদের ছোড় দাদু যে মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছেন তা গ্রামের কাউকে জানতে দিতে দাদা চান না। অন্যদিকে আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে বেল গাছ হতে একটা সুপুরী গাছে উঠে সেটা ব'য়ে মড় মড় করে পাশের বাড়ীর উঠোনে নেমে ওদের গোয়াল ঘরে ঢুকলাম।

ওদিকে—পাশের বাড়ীর মেজকর্ত্তা কমিশরিয়েটের চাকুরী নিয়ে রাউল পিণ্ডিতে থাকেন। তিন বছর অন্তর ছুটীতে নৌকা যোগে গ্রামের বাটীতে ফিরেন। তাই ওঁর স্ত্রী অর্থাৎ ঐ বাড়ীর মেজ গিন্নী লাল টকটকে শাড়ী পরে কপালে সিঁদুর লেপে ঘুমুর পায়ে ঝম ঝুম করে ওদের বাঁকা সিঁড়ি ব'য়ে নীচে নামছেন। উদ্দেশ্য—ঐ গোয়াল ঘরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া। ঐ ঘুমুরের আওয়াজ শুনে তাঁর শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ গদ গদ হয়ে হাতজোর করে বলছিলেন: 'হে, মা লক্ষ্মী। আমাদের বাড়ীতে এমনি তুমি অচলা হয়ে থাকো।' ওঁর বিশ্বাস বাড়ীর জাগ্রত লক্ষ্মী ঠাকুর এত দিনে সত্যই জেগেছেন।

পর দিন ওদের বাড়ীতে এসে দেখি সেখানে ধুম ধাম ব্যাপার।

ঐ শাশুড়ী ঠাকরুণ ওঁদের বাঁকা সিঁড়িতে একটা ঝুমুরের মূর্ত্তি কুড়িয়ে পেয়েছেন। সেটা এখন নারায়ণ বিগ্রহের সিংহাসনে রক্ষিত। পুরুত ঠাকুর পূজায় বসেছেন। অন্যদের 'মত আমি লক্ষ্মী দেবীর প্রসাদ-রূপ মিষ্টান্ন মুখে বাড়ী ফিরে ছিলাম।'

এখানে আমার বক্তব্য বিষয় এই যে, সেকালের ভূত-পেত্নীগুলো আজও কেউ মরে নি। সেকালে যাদের তালগাছ, বেলগাছ ও শ্যাওড়া গাছে দেখা যেতো, তাদেরকেই এই যুগে লেকের ধারে ও রেস্তর'া আদিতে জোড়ে জোড়ে দেখা যায়। শুধু ওদের কার্য্য পদ্ধতি তথা মোডাসঅপারেণ্ডাগুলিই কিছু কিছু বদলেছে মাত্র।

পূর্ব্ব কালে কেউ মরলে অশৌচের কালো হাঁড়ী গুলো পুকুর পাড়ে ফেলা হতো। ওগুলি অশৌচের দ্রব্য ব'লে কেউ ওগুলো ছুঁতো না। তাই—ঐ কালে বাড়ীর ঘোমটা আবৃত বধুরা তাদের প্রেম পত্রগুলি ঐ অচ্ছুৎ অশৌচের হাঁড়ীর তলাতে রেখে দিত। অন্য দিকে—পাশের বাড়ীর পুরুষ প্রেমীকরা ঐ বধুটি ঘড়া কাঁকে জল তুলে চলে গেলে গাড়ু হাতে পুকুরে নামতেন এবং সুযোগ মত ঐ প্রেম পত্র ওখান হতে তুলে তার উত্তর ঐ হাঁড়ীর তলাতে রেখে যেতেন। উপরন্তু—পান চাইবার ছলে ঐ বধুদের নিকট যাওয়া ও অন্যদের অলক্ষ্যে তার হাত টিপে দিয়ে ইসারা ও আবেগ জানানও সম্ভব হতো।

অন্যদিকে—অত্যাচারীতা চাষীদের বধুরা মাঠের পথে পিত্রালয়ে পালাবার কালে মাথাতে কাঠ কয়লার আগুন সমেত মালসা রেখে পথ চলতেন। মধ্যে মধ্যে ওঁরা ঐ আগুনে ধুনা দিলে ওগুলো দপ দপ করে জ্বলে উঠতো। ফলে অন্বেষণকারীরা ওটাকে দূর হতে আলেয়া ভূত বুঝে ওদিকে যেতে সাহসী হতো না। তবে—বহুক্ষেত্রে জলীয় গ্যাসের জন্যও ওরূপ আলো দেখা যেতো ও আলেয়া ভূতের কাহিনী রটতো।

তবে ভূতে পাওয়া ও দেবতাতে ভর হওয়ার বৈজ্ঞানীক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এগুলি নিশ্চিত রূপে এক শ্রেণীর হিষ্ট্রিয়া রোগ বা মানসিক ব্যাধি। কেউ যখন রোগাবস্থাতে দেব দেবীর নামে

উচ্চাদের ধর্মের বাণী শুনায় তখন আমরা তাকে বলি ভর হওয়া। [Inspired] কিন্তু—যখন তারা অশ্লীল গালি গালাজ করে তখন আমরা তাদেরকে বলি পাওয়া। [Possessed] প্রায় দেখা ও বুঝা যায় যে ঐ মনোরোগের কারণ যৌন প্রদমন। এই জন্য চির-কুমারদের পেত্মীতে এবং বিধবাদের পায় ব্রহ্মদৈত্য। বিজ্ঞ ওঝারা [ভূতের বোঝা] এই বিষয় অবহিত। এই জন্য ভূত ঝাড়ার মন্ত্রে বহু অশ্লীল বাক্য থাকে। এই অশ্লীল বাক্য গুলি ওদের অবচেতন মনকে তৃপ্ত করে যৌন উপশম ঘটাত। আমি দেখেছি যে মন্ত্র পড়ার সঙ্গে ঐ অশ্লীল শব্দ গুলি কানে যাওয়াতে ওরা একটু একটু করে নিরাময় হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ—কিছু ক্ষেত্রে ভূতের রোঝার হিপনোটীক নির্দেশ মত হিষ্ট্রিক রোগীরা এক ঘড়া জল দাঁতে তুলেছে। এই পরিশ্রমে তারা তাদের নরম্যাল সেল্ফ ফিরে পেয়ে নিরাময় হয়েছে।

এইরূপ অশ্লীল বাক্য সমেত আমি বহু ঐরূপ ভূত ঝাড়ানোর মন্ত্র সংগ্রহ করেছি। অশ্লীলতার জন্য এই প্রবন্ধে উহা প্রকাশ করা হলো না। ঐ গুলি দ্বারা যৌন অক্ষমতা রোগ তথা মেণ্টাল ইমপোটেন্সীও সারানো যায়। পর্নো-গ্রাফি লিটারেচার গুলি এই জন্য সিলড্ কভারে রক্ষা করা উচিৎ।]

অন্যদিকে—ঐ একই কারণে নারীদের উপর দেবতা এবং পুরুষ সাধকদের উপর দেবীরা ভর করেন। তবে এ গুলির মধ্যে অভিনয় ও সুষ্ঠ বজ্জাতীও কাউর কাউর মধ্যে থাকে। নিম্নের সত্য ঘটনাটী হতে এ বিষয়ে বুঝা যাবে।

'কোনও এক নব বিবাহিত যুবক বেশ কিছুদিন সংসার করার পর হঠাৎ একদিন বাড়ীতে এসে অজ্ঞান হলো। পরে—কিছুটা জ্ঞান হওয়ার পর চোখ পাকীয়ে তার মা'কে বললো : 'মা মা। জানো তুমি আমি কে? আমি রাম চন্দ্র।' পরে ফের সে অজ্ঞান হলো। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর সে কিছুই স্মরণ করতে না পেরে বলতো। 'কৈ! সে কি। আমি রামচন্দ্র হবো কেন।' কিন্তু পরে ফের ভর হলে সে পুনরায় রামচন্দ্র হয়ে ভূত ভবিষ্যত বলতো ও

আশীর্ব্বাদ বিতরণ করতো। এমন কি তার বুড়া খুড়তাতের স্কন্ধে পা রেখে তার ঐ ভক্ত কাকা বাবুকে বলতো: 'এ বেটা পূর্ব্বে সুগ্রীব ছিল।'

ধীরে ধীরে ওখানে বহু বিশ্বাসী ভক্ত এলো। সোনা দানাতে তার সিংহাসনের তলা ভরে যেতো। এতে সকলেই খুশী। এমন কি এজন্ত তার নব বিবাহিত বধুও তার সেবা করতো। কারণ— সে নাযাত এখন সীতার পদের অধিকারিনী।

এরপর হঠাৎ একদিন বাইরে হতে বেড়িয়ে এসে ঐ যুবক হঠাৎ অজ্ঞান হলো ও চোখ পাকিয়ে তার মাকে বললো: 'মা। মা। জানো তুমি 'আমি কে?' তার মাতা গদ গদ হয়ে তাতে উত্তর করলো: 'হাঁ বাবা। জানি। এ জন্মে তুমি হত ভাগিণীকে দয়া করেছো।' এর পর ভরের মুখে ঐ শ্রী শ্রী রাম চন্দ্র আদেশ দিলেন: 'টালা ব্রীজের তলাতে হলদে রঙের বাড়ীতে চতুর্দ্দশী সীতা আছে। মহিত চাটুয্যের কন্যা। যাও। তাকে নিয়ে এসো।' এর পর সে 'সীতা সীতা বলতে বলতে জ্ঞান হারা হলো কিন্তু—জ্ঞান হওয়ার পর সে কোনও কিছুই ও সম্বন্ধে স্বীকার করে না। বরং তাতে সে অবাক হয়ে যায়।

কিন্তু—রাম চন্দ্রের আদেশ অমান্য করা কাউর পক্ষে সম্ভব নয়। মাড়োয়াড়ী ধনী ভক্তরা গাড়ী ও টাকা দিল। ভরের মুখে উনি সীতাকে বিয়ে করে এনে ঘরে তুললেন। এতদিন তাঁর প্রথম স্ত্রীও ওঁর ভক্ত ছিল। এবার তাঁর ভক্তি চটলো। তাকে চোখের জল ফেলতে ওদের ফুল শয্যার বিছানা তৈরী করতে বাধ্য করা হলো। তিনি শেষ বেশ বিগড়ালেন। ফলে রুষ্ট হয়ে ভরের মুখে ঐ রাম চন্দ্র সকলকে হুকুম দিলেন: 'ওই ওই। সূর্পনখা। ওর নাসিকা কর্ত্তন করো।' কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর যথারীতি ওঁর ও সবেতে অস্বীকার। ওদিকে রামচন্দ্রের আদেশ প্রতি পালিত হওয়া চাই। কিন্তু তখনকার ব্রিটিশ রাজ্যে ঐ কার্য্য সম্ভবও নয়। তাই সকলে জোর করে শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য তার নাকের কিছুটা নরুন দিয়ে স্বল্প চিরে দেওয়া হলো।

পল্লীর তরুণরা খবর পেয়ে ঐ বধূর বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে ছিল। তাতে তারা থানাতে এসে আমাকে ঐ বিষয়ে জানালো। আমি নিজে ঐ মামলার তদন্ত করেছিলাম।

তদন্তে জানা গেল যে—ঐ যুবক ও তার চরেরা দিনের বেলাতে ছদ্মবেশে ঘুরে ভক্তদের সকল খবর জেনে নিত। পরে রাতে ঐ কথাগুলো ভরের মুখে বলে সকলকে চমৎকৃত করতো ওরই মধ্যে সীতা নামী মেয়েটীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা চরমে উঠে।

ঐ রামচন্দ্রের স্বীকৃতি-মূলক বিবৃতিটি আমি জনৈক অনারারী হাকিম দ্বারা লিপিবদ্ধ করে একটী ৪২০ ধারার মামলা তার বিরুদ্ধে তৈরী করে ছিলাম। ফলে—একটী দারুণ অলৌকিক কাহিনীর জনসমাজে প্রচার মধ্য পথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অন্য একটী সত্য অলৌকিক ঘটনাও এখানে বলবো। এটী ফেরার খুনে আসামীরা বহু স্থানে প্রয়োগ করেছেন। এটী একটী পুরানো আত্ম গোপনের পন্থা।

কোন এক সাধু লোক এক স্থানে এসে বললো : এই কাশী হতে শিব ঠাকুর মাটি ফুঁড়ে এখুনি উঠবেন। গ্রামবাসীরা তার নির্দ্দেশ মত কলসী কলসী জল সেখানে ঢালতে থাকে। কিন্তু শিব ঠাকুরের দেখা নেই। জড় হওয়া অবিশ্বাসীরা হাসে। পরিশেষে একদিন শিব লিঙ্গ সত্যিই মাথা তুললে, মাটিতে একটু চির ধরলো। তারপর বৃহৎ লিঙ্গরাজ উপরে উঠল। চারিদিকে ঢোলের ও বোম বোম শব্দ শুনা যায়। ভক্তরা পূজার দ্রব্য ও অর্ঘ ওখানে স্তূপীকৃত করে।"

কিন্তু—পরে জানা গিয়েছিল যে, রাত জেগে সাধু বাবা এক পিপা শুখনো ছোলা ও তার উপর শিব লিঙ্গ রেখে মাটীর তলাতে পুতে রেখে ছিল। জল পেয়ে ঐ শুকনা ছোলা ফুলে উঠলে ঐ শিব ঠাকুরও ধীরে ধীরে উপরে উঠেছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা তা কখনও বিশ্বাস না করে ওটাকে একটা অলৌকিক ঘটনাই মনে করে থাকে।

বহু প্রকার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মূলে থাকে আশৈশব 'বাক-

প্রয়োগ' তথা মনস্তাত্ত্বিক সাজেস্‌শন। শৈশবে আমার এক ওয়াকীবহাল ঝি' ঠাকুমা'র মুখে শুনতাম যে ভূত-পেত্নীদের পায়ের চেটো থাকে পিছন দিকে। সে দাশুর বাগানে ফেলে রাখা মরা শিশুদের কান্না নিজে কানে শুনেছে। পরে আমি জেনেছিলাম যে এক প্রকার পাখী খোকাদের কান্নার শুরে ডাকে। বাতাস গাছের পাতা ও ছড়ানো খুলির মধ্যে বইলে কান্নার মত শব্দ রাত্রে শুনা যায়। আমাদের গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট তরুণ রাত্রে বাঁশীর সাহায্যে ওরূপ কান্না কেঁদে ভয় দেখাতো। কোনও এক ভূতের ওঝা আমাকে বলেছিলঃ বাবু! আপনি ভূত বিশ্বাস করেন না। তাই ভূত আপনাকে দেখানো সম্ভব নয়।

শব্দ দুই প্রকারের হয় যথা বায়ুবাহী [Air conditioned] এবং অস্থী বাহী [Bone conditioned] রাত্রে ছাদেতে কাঠ বিড়ালীরা মণ্ডপ আকারে গড়াগড়ি করে। ঐ গুড় গুড় শব্দ বায়ুবাহী না হওয়াতে কানে শুনা যায় না। কিন্তু—রাত্রে বিছানাতে শুয়ে থাকলে সমগ্র অস্থীময় শিরদাঁড়া বিছানাতে লেপ্টে থাকে। তাতে অস্থী সহযোগে ঐ ছাদের গুড় গুড় শব্দ শুনা যায়, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে উঠলে ঐ রূপ শব্দ আর শুনা যায় না। অন্যদিকে পুরানো বাড়ীতে পুরানো কাঠের সিন্ধুক হতে রাত্রের ঠাণ্ডা জনিত সঙ্কোচন ও প্রসারনে কট কট শব্দ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

তবে—তখুনি ব্যাখ্যা মেলে না এমন ঘটনাও ঘটে থাকে। পুলিশী কর্ম্মকৃত্যে থাকাকালে একটী বাটীতে ভূতের উপদ্রব বদমাস-দের কার্য্য ভেবে আমি তদন্ত করেছিলাম। ওখানে রাত্রে একটা কক্ষের দ্বিতলে ভূতের ছায়া নৃত্য হতো। তদন্তকালে ওখানে ডেকে আনা রোঝার ভূতের প্রতিষেধক মন্ত্রপুত শুয়ারের মাংসের তাল আমার চক্ষের সুমুখে উপরে উঠে উধাও হতে দেখে আমি অবাক হই। আমি এও লক্ষ্য করি যে, ঐ কালে ওর উঠার পথেতে একটা চক্‌চকে সূতার আকারের কিছু ওর আগে আগে উপরে উঠেছিল। পরে—ঐ সারা বাড়ী তল্লাস করেও আমি ঐ মাংসর তালের সন্ধান পাই নি। উপরন্তু সন্দেহ মত কোনও ফটো-ফিলিম বা নিক্ষেপণ

াসিনেরও খোঁজ করেছি। সেরূপ কোনও দ্রব্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও খতে পেলাম না। কোনও ক্ষীণ প্লাসটিকের সুতাও কোথাও পড়ে াকতে দেখলাম না।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল !! লেখকের অধিকাংশ লেখাই সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সুবাসিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মৌলিক গবেষণার জন্য "ডক্টরেট" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। পঞ্চানন বাবু জীবনের অধিকাংশ সময় পুলিশ বিভাগের নানা দায়িত্বে বৃত্ত থেকে সমাজ জীবন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার ফলশ্রুতি তাঁর বহু খণ্ডে প্রকাশিত 'অপরাধ বিজ্ঞান' গ্রন্থমালা। অপরাধ ও অপরাধীর গতি প্রকৃতি, কার্যকারণ বিশ্লেষণ ও অন্বেষণে লেখকের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা আমাদের চমৎকৃত করে। অবসর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে লেখক আজও অপরাধ বিজ্ঞানের নানা আলোচনায় সদা নিরত ও ব্যস্ত। ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পাঠকদের নিকট এক অতি পরিচিত নাম।

তাঁর কোন কোন গ্রন্থ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে ভিন্নভাষী পাঠকদের কৌতুহল নিরসন ও রসানুমোদন লাভ করেছে।



তারপর

আশাপূর্ণা দেবী

ট্রেনটা ঘসঘস করে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবার পর ঘটনাটা ধরা পড়লো। তাছাড়া আর কী হবে? থামবে তো মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড!

ওই সময়টুকু তো শঙ্কর এগিয়ে এসে বোর্ডটা নিরীক্ষণ করে দেখতেই খরচ হয়ে গেল।

মেঘেমোড়া আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অখ্যাত এক গ্রাম্য স্টেশনের

প্ল্যাটফর্মের মিটমিটে আলোয় চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিজের মূঢ়তায় হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেলনা শঙ্খ।

শঙ্খ স্টেশনে নেমে পড়েছে।

অথচ আমি নিজেকে বেশ স্মার্টই ভেবে থাকি, মনে মনে বললো কথাটা শঙ্খ, আর ভুল স্টেশনে নেমে পড়ার মতো একটা ভ্যাবলা কাজ করলাম আমি !

তা' কাজটা যে ভ্যাবলার মতো হয়েছে তা'তে আর সন্দেহ কি ? গন্তব্যস্থলটা ছিল শঙ্খর কাঞ্চনপুর, নেমে পড়ে দেখছে বোর্ডের গায়ে লেখা সাধনপুর।

কে জানে কোনো সাধকের সাধনা স্থান কিনা, আর কাঞ্চনপুরের সঙ্গে তার ত্যাগসূত্রে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তবে সে সব গবেষণার মতো মানসিক অবস্থা নয় এখন, ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছে, এই ভয়ঙ্কর সত্যটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে তার।

হয়তো ওই নড়বড়ে বোর্ডটার গায়ে লেখা অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে যাওয়াই এই ভুলের জন্যে দায়ী, হয়তো ওই রেড়ির তেলের প্রদীপের মতো মিটমিটে আলোটাই দায়ী, অথবা শঙ্খর রেলকোম্পানীর সময়নিষ্ঠার উপর অগাধ আস্থাই আসলে দায়ী।

শঙ্খ জানতো ট্রেন আটটার সময় কাঞ্চনপুর পৌঁছবে, তাই শঙ্খ বই পড়তে পড়তেও ঘড়ির কাঁটার উপর দৃষ্টিটা সজাগ রেখেছিল। আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা থেমেও পড়েছিল, জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলো, ওই 'পুর' শব্দটাই দেখতে পেল। নিশ্চিন্ত শান্তিতে নেমে পড়লো।

অথচ আমি বুদ্ধু, আগেও এসেছি কাঞ্চনপুরে,—ভাবলো শঙ্খ, হোক চার পাঁচ বছর আগে, তবু আমি তখন শিশু ছিলাম না !

কিন্তু এই অখাদ্য গ্রাম্য স্টেশনগুলো যে সবই প্রায় একরকম দেখতে। একইরকম শ্রীহীন দৈন্য-দশাগ্রস্ত। মিটমিটে আলো, ছটো ঝুমকো জবার গাছ, করোগেট টিনের শেড্ দেওয়া স্টেশন মাস্টারের অফিস, আর কাঠের বেড়ার ঘের।

তাছাড়া আজ আকাশ মেঘেমোড়া।

কিন্তু ভুলের কারন যাই হোক, এখন কি করতে পারে শঙ্খ পরবর্তী ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা? কিন্তু রাত আটটার পর রাতে মধ্যে কার কোন ট্রেনের গরজ পড়বে এই সাধনপুরের মাটিতে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে নিঃশ্বাস নেবার? এর জন্যে যে একবার ওই পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড সময় রেলকোম্পানী দিয়েছে এই ঢের।

তবু স্টেশন মাস্টারের উদ্দেশ্যে এগোলো শঙ্খ অনুসন্ধানের আশায়। ট্রেন যদি দৈবপ্রেরিত হয়ে আসেও একখানা, শঙ্খ জানেনা সেটায় চড়ে বসলে কাঞ্চনপুর যাওয়া যাবে কিনা। কিসে চড়বে? 'আপ' না 'ডাউন'?

কাঞ্চনপুরকে ফেলে চলে এসেছে, না আগেই নেমে পড়েছে রেলগাড়ী তার চিরাচরিত বিলম্বিত দীর্ঘ লয়ের পথ ধরে অনেক আগেই আটটা বাজিয়েছে, দ্রুতধাবনের বাহাদুরী দেখাতে কাঞ্চনপুরকে ফেলে চলে এসেছে আটটা বাজবার আগেই।

ঘড়িটাকেই প্রধান ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বই পড়াটাই ভুল হয়েছিল

ট্রেনে সহযাত্রী ছিল, কিন্তু পথ সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাটা শঙ্খর বরাবরই গ্রাম্য মনে হয়। কী আবার ভ্যাবলার মত জিজ্ঞেস করবো, 'আচ্ছা মশাই কাঞ্চনপুরটা কখন আসবে' অথবা জানলায় গলাবাড়ানো লোককে প্রশ্ন করা, 'এটা কোন স্টেশন এলো?'

অথচ আমি সেই ভ্যাবলার মতই একটা কাণ্ড করে বসলাম

একমাত্র সান্ত্বনা কেউ সাক্ষী নেই।

কিন্তু দিদির মেয়ের বিয়েতে পৌঁছতে না পারার মত দুর্ঘটনা পর আর সান্ত্বনা কোথায়?

স্টেশন মাষ্টারের অফিস রুম-এর দরজায় তালা ঝুলছে।

তার মানে শেষ ট্রেন পার করে দিয়ে তিনি কেটে পড়েছেন

কিন্তু কতক্ষনই বা অমন বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েছিল শঙ্খ? কখ কাটলেন স্টেশন মাষ্টার?

আশ্চর্য স্টেশন!

একটা কুলি কি জমাদার পর্যন্ত নেই। যেন প্রেতাহত ঠাঁই।

এই এক অজানা অচেনা জনহীন পরিবেশের দিকে তাকিয়ে হতাশ শঙ্খ ভেবে পেলনা কী করবে।

দিদির চিঠির লাইনগুলো যেন মাথার মধ্যে হাতুড়ি বসাচ্ছে।

'জানি তোর অনেক কাজ, কিন্তু সমাজে বাস করছিস যখন, কিছু সামাজিকতা মানতেই হয়। আমার জন্যে বলছিনা, তোর জন্যেই বলছি—বান্টির বিয়েতে যদি তুই না আসিস, নিজেরই তোর পরে নিজেকে একটা পাষণ্ড মনে হবে। আর এখানেও—অবশ্য জানি তুই এখানকার লোকেদের মনিষ্যি মনে করিসনা, কিন্তু আমার কাছে তো তাদের মূল্য আছে। অন্ততঃ তোর জামাইবাবুর। তারা যদি তোর নাম করে ব্যঙ্গ করে, সেটা বড় কষ্টকর। আমি তো তোর দিদি, এক মায়ের পেটের. আমি দিনের পর দিন এখানে থাকতে পারছি, আর তুই একদিন ভাগ্নীর বিয়েয় দাঁড়াতে আসতে পারবিনা? যা ভাল বুঝিস করিস।' মেয়ের বিয়েতে আগ্রহ করে 'আসিস ,ভাই' বলে মাথার দিব্যি দেয়নি দিদি, শুধু শঙ্খ যে কতটা পাষণ্ড, তাই যেন শুধু বুঝিয়ে দিয়েছে।

এর পর না গেলে?

সত্যি বলতে—মা মারা যাবার পর দিদির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্নই হয়ে গেছে, আর গেছে শঙ্খর দোষেই। শঙ্খর অবস্থা খারাপ নয়, শঙ্খ একটা মুক্ত জীব। শঙ্খই যদি যোগাযোগের সেতু রক্ষা করে উঠতে না পারে, দিদি কি করবে? কোন বাল্যকালে পাড়াগাঁয়ে গরীব ঘরে বিয়ে হয়ে যাওয়া বেচারী মেয়ে, তাও আবার স্বামী চিররুগ্ন অক্ষম।

তার কি সাধ্য, এই পরিবেশ থেকে নিজে বেড়িয়ে পড়তে পারে?

বান্টিটাকে শঙ্খ নেহাত বালিকা দেখেছিল, কোন ফাঁকে বিয়ের মতন হয়ে উঠলো? না কি বাল্য-বিবাহ? কে জানে বয়সের হিসেব করতে পারলোনা শঙ্খ ভাগ্নীর।

তবে—

একখানা ভাল শাড়ী কিনে নিয়ে স্যুটকেস হাতে করে বেড়িয়ে

পড়লো, কলেজ থেকে বেরিয়েই। ছাত্ররা কমনরুমে বসে জটলা করছে, কে জানে কোন পরামর্শ করছে বসে, কোন মতলব ভাঁজছে। পরামর্শটা—

হয়তো 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'র ফাংশনের, হয়তো বা অন্য কোনও বিষয়ের।

সেবার সোশ্যালে যে ছেলেটা—কবির 'আকাশ জুড়ে উদাব সুরে আনন্দ গান বাজে' গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল, সেই ছেলেটাই সহপাঠীর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে হঠাৎ সহপাঠীকে দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছিল।

এখানে এ চিন্তা অবান্তর, তবু—এই সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থার মধ্যে পড়ে বাজ্যের কথা মাথায় আসছে শঙ্খর। ভাবছে 'নিয়তি' শব্দটাকে মানতাম না, ক্রমশঃ মানতে হচ্ছে। যা অমোঘ, যা অনিবার্য, যা অবশ্যম্ভাবী, তা হবেই।

অতএব হে শঙ্খ, তোমার আজ নিন্দে হবেই। কারণ ওটাই তোমার আজকের নিয়তি।

বিয়েতে পৌঁছনো যাবেনা।

কিন্তু রাতটা কাটানো যায় কোথায়?

গ্রামের মধ্যে ঢুকতে পারলে হতো।

কিন্তু সেদিকেও চমৎকার।

ষ্টেশনের আর কোন বাহার না থাক তালার বাহার আছে। বেড়ার গায়ের ছোট গেটটাতেও তালা লাগানো।

অগত্যা বেড়া ডিঙোনো।

বেড়া ডিঙিয়ে স্টেশনের ওপারে পৌঁছে গেল বটে শঙ্খ, কিন্তু লাভ কী হলো? কোন দিকে এক চিলতে আলোর ইশারা নেই, নেই একটা যানবাহনের চাকার আভাস। ধারেকাছে গাড়ি নেই, কারো বাড়িও নেই, একটা দোকানও নেই।

হতাশ শঙ্খ ভাবলো, আচ্ছা এই মাঠটা ধরে এগিয়েই দেখি। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা, ঠিক সেই সময় এল ঝমঝম করে বৃষ্টি।

বৃষ্টিটা অবশ্য নেহাত আকস্মিক আসেনি, এসেছে অনেকক্ষণ তোড়জোড় করে। তবু শঙ্খ ভাবলো তার জন্যেই এলো।

তার মানে নিঝুম নিশীথে অজানা পথে হাঁটার রোমাঞ্চটুকুও গেল।

কোন পথ নেই।

যেন শঙ্খর আজকের যাত্রাগ্রহ শঙ্খর সমস্ত সম্ভাবনার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা নিয়ে চলে গেছে।

বৃষ্টির বহরে আবার ছোট্ট সেই টিনের চালাটুকুর নীচেই ফিরে এল শঙ্খ।

আর এসেই যেন ভূত দেখলো।

সেই জনমানবশূন্য জায়গায় হঠাৎ আগাগোড়া বর্ষাতি ঢাকা একটা মানুষ। হাতে তার একটা মাঝারি মাপের স্যুটকেশ।

মাঝামাঝি জায়গায় হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বোধকরি টিকিট ঘরের জানলা বন্ধ দেখে।

ট্রেন ছাড়ার পর এসেছে টিকিট কাটতে।

শঙ্খ-সদৃশ বেকুবও তাহলে আছে।

কিন্তু এল কোথা দিয়ে ও?

দেখতে পায়নি তো? এইখানেই তো রয়েছে শঙ্খ।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, শঙ্খ ভাবলো, ওই লোকটাও কাঞ্চনপুর যাবে, আর সেই নিয়ে যাবার ট্রেন এখনই এসে দাঁড়াবে।

ভেবে নিজের মনে হেসে উঠলো শঙ্খ। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো। আপনি কোথায় যাবেন।

তখন আর প্রশ্ন করাটা গ্রাম্য ভাবলো না। লোকটা কথা বললো না।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে হন হন করে হেঁটে স্টেশনের ওদিকে গিয়ে স্যুটকেশটাকে বেড়া টপকে প্ল্যাটফর্মের দিকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও বেড়াটা টপকালো।

শঙ্খর বুঝতে বাকি থাকলো না লোকটা চোর। তা না হলে অমন ছুট দেবে কেন?

ওই স্যুটকেশটি কোনোখান থেকে বাগিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে সরে পড়েছে। চালাক চোর, গায়ে মাথায় বর্ষাতি।

আর হতবাগ্য শঙ্খ ?

বিয়েবাড়িতে আসছে ভাল আদ্দির পাঞ্জাবী, কাঁচি ধুতি।

কিন্তু সেই আদ্দির পাঞ্জাবী কাঁচি ধুতি বাঁচাতে শঙ্খ কি নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা চোরকে চলে যেতে দেখবে ?

না ! তা' হয়না।

শঙ্খকেও আবার বেড়া ডিঙ্গিয়ে রেললাইনের ধারে গিয়ে পৌছতে হবে। কারণ লোকটা তাই যাচ্ছে !

তবে ছোটার ব্যাপারে সুবিধে করতে পারছে না, বৃষ্টি মুষলধারে নেমেছে হাতের স্যুটকেশটাও তার নির্ঘাৎ ভারী।

শঙ্খ গিয়ে ধরে ফেললো।

শঙ্খ একবার ভেবেছিল, যদি ছোরা থাকে সঙ্গে।...তবু সেই ভয়ে হঠাৎ হাতে এসে পড়া এই এ্যাডভেঞ্চারের মোহটা ত্যাগ করতে পারলো না, পিছন থেকে—ছ ইঞ্চি দূর থেকে বলে উঠলো, কী হলো ? এভাবে বৃষ্টির মধ্যে ছুট মেরে পালিয়ে এলেন যে ?

বর্ষাতি মোড়া মানুটা তবু উত্তর দিল না, শুধু রেললাইনের একবারে কানা দিয়ে চলতে শুরু করলো। মনে হচ্ছে - যেন দরকার হলে ওই নীচেটাতেই লাফ দেবে।

'কী হচ্ছে—'শঙ্খ অভিভাবকের সুরে প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে, পড়ে যাবেন যে ?

কিন্তু সেই দ্রুতভঙ্গীর পরিবর্তন হয় না।

হঠাৎ শঙ্খর মনে হয়, লোকটা সত্যি জ্যান্ত মানুষ তো ! না কি পাড়াগায়ের নিজস্ব মাল ব্রহ্মদত্যি-টত্যি। ছুটছে দেখ যেন ছায়ামূর্তি।

ভঙ্গীতে চোরের দ্রুততা বা চোরের ক্ষিপ্রকারিতা কই ! চোর হলে কি এতক্ষণ ওই ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে পালাবার চেষ্টা করতো ? লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ে ওপারে উঠে ছুট মারতো।

অথবা—ভাবতে অবশ্য বুকটা হিম হয়ে গেল! শঙ্খর, অজ্ঞাতসারেই ধারের দিক থেকে সরে এল।

হঠাৎ যদি ফিরে দাঁড়িয়ে শঙ্খকে, শঙ্খকে একটা ধাক্কা দিয়ে নীচের লাইনের ওপর ফেলে দেয় লোকটা।

চালাক চোর হলে তাই করতো হয়তো। ভাবলো শঙ্খ কাঁচা চোর। অতএব ওর কাছে গিয়ে পিছন থেকে বর্ষাতির কোণটা চেপে ধরা যায়। এবং বৃষ্টির শব্দ ছাপানো গলায় বলে ওঠা যায়, আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো?

শঙ্খর এরকম স্বভাব নয়।

শঙ্খ কখনো পরের ব্যাপারে নাকগলাতে যায় না। কিন্তু আজ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে শঙ্খ স্বভাব বহির্ভূত কাজ করলো।

আসলে হয়তো কারণটা চোরের বিরুদ্ধে সাধুর অভিযান নয়। আসলে হয়তো কারণ অন্য। এই জনশূন্য প্রান্তরে ভবিষ্যৎহীন রাত্রির দিকে তাকিয়ে, জলজ্যান্ত একটা লোককে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গটা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না শঙ্খর। হোক, চোরই হোক, তবু মানুষ তো! কথা বলা যাচ্ছেই তো তার সঙ্গে।

বলে ওঠা যাচ্ছেই তো, 'আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

বৃষ্টির ধারাটা বোধহয় একটু স্তিমিত হলো। গলার শব্দটা শোনা যাচ্ছে।

শঙ্খ ওর পাশ ছেড়ে সামনে গিয়ে বলে ওঠে, 'এভাবে ছুটছেন কেন?'

এবার হঠাৎ সেই ছায়ামূর্ত্তি কথা বলে ওঠে, চাপা গলায়, 'আপনাকে—

মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে যায় শঙ্খ। ছায়া নয়, মানুষই। তবে মেয়েমানুষ! পুরুষের গায়ের বড়মাপের বর্যাতি পরে আর টুপিতে মুখ ঢেকে আত্মগোপন করেছে।

পাথর হয়ে যাওয়া শঙ্খর দিকে আর একটি বাণ নিক্ষেপ করেন মহিলা, 'আপনি কি চান, ওই লাইনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি'?

এবার শঙ্খ কথা কয়।

স্থির গলাতেই বলে, 'না এমন কোনো চাহিদা আমার নেই, সুধু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বলেই—'

'অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ?'

ও আবার চলতে শুরু করে বলে, 'একটা মানুষ নিজের পথে চ'লেছে এতে অবাক হবার কি আছে ?'

'সময়টা ঠিক চলার মত নয় বলে।'

'আপনাকেও তাহলে সেই কথাই বলতে হয়।' শঙ্খও হাঁটছে সঙ্গে স'ঙ্গ।

'আমার কেস আলাদা। আমি হঠাৎ ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছি ট্রেন চলে গেছে. কোথাও কোন লোক দেখছি না, গাড়ি দেখছি না—'

'ভুল স্টেশনে নেমেছেন আপনি ?'

মেয়েটা সন্দেহের গলায় বলে, 'বাজে কথা বলছেন না তো ? চৌধুরীদের চর হয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন না তো ?'

'চৌধুরী ? চৌধুরীরা কে ?'

মেয়েটা সুতীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, 'কেন,· আমার শ্বশুরকুলের অধিপতিরা ? আমার শ্বশুর আমার ভাসুর, আমার স্বামী।···· মেয়েটার গলা দিয়ে যেন তিক্ত ব্যঙ্গ গলে গলে, পড়ে, 'এই সাধনপুরের' 'বাবু মশাইরা।' জমিদার বংশের প্রেতাত্মা।'

শঙ্খর এবার অন্য সন্দেহ হয়।

মাথার গোলমালের রোগী নয়তো ? বাড়ি থেকে পালাচ্ছে! শঙ্খ শান্ত গলায় বলে, 'না, আমি আপনার ওই চৌধুরীদের চিনি টিনি না। কলকাতা থেকে আসছি, ভুলকরে এখানে নেমে পড়ে—,

যাচ্ছিলেন কোথায় ?

কণ্ঠস্বর সমান তীব্র ও সন্দেহ-কুটিল।

'কাঞ্চনপুরে !'

'কাঞ্চনপুর ? কলকাতা থেকে অসেছেন বললেন না ?'

'তাই তো।'

'তা' এতদূরে এলেন কী করতে? সে তো সাধনপুরের দু'স্টেশন আগে। কাঞ্চনপুর ফেলে রেখে এগিয়ে এসে ভুল স্টেশনে নামলেন?

সব বানানো!

যাক, তবু একটা হদিশ পাওয়া গেল। শঙ্খ তাচ্ছিল্যের গলা আমদানি করে, 'বানানো বলে সুখ পান বলুন। আমি বলছি একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'চমৎকার! আর কখনো রেল গাড়িতে চড়েননি বুঝি?'

'না', শঙ্খ আরও তাচ্ছিল্যের গলায় গম্ভীর ভাবে বলে, 'জীবনে এই প্রথম।'

'ওঃ রাগও আছে বেশ!···কিন্তু আমার ওপর খবরদারি করতে এলেন কী করতে? ওই শেড্-এর নীচে পড়ে থাকলেই হতো।'

বৃষ্টির গতি আরো কমে আসছে। কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মূর্তিটা ঢাকা! যেন রূপকথার রাজকন্যা! যে কন্যা নিজেকে আবৃত রেখে অন্তরাল থেকে কথা বলে।

শঙ্খের আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে লেপটে গিয়ে শীত করছিল, শঙ্খর জুতো ভিজে ভারী হয়ে উঠে হাঁটার অসুবিধে ঘটছিল, শঙ্খর দিদির মেয়ের বিয়েটা বরবাদ হয়ে যাওয়ার আপশোস ছিল। তবু শঙ্খ যেন একটু কৌতুক বোধ করছিল।

শঙ্খর মনে হচ্ছিল, যেন একটা রহস্যগল্পের মত ঘটনা ঘটছে। আর আমি হচ্ছি সেই গল্পের নায়ক।

বৃষ্টি ভেজা রাত, অজানা অচেনা দেশ, জনহীন প্রান্তরে অকস্মাৎ উদিত হওয়া এক রহস্যময়ী নারী সামনে দণ্ডায়মানা এর থেকে ঘোরালো ব্যাপার—আমাদের মত সাধারণ জীবনে আর কি হতে পারে?

শঙ্খ কৌতুকের গলায় বলে উঠলো, 'শেড্ এর নীচে কতক্ষণ পড়ে থাকলে আবার ট্রেন আসবে। জানা তো নেই। এক নম্বরের বুদ্ধু তো!'

'তা' মিথ্যেও নয়।'

মূর্তির মধ্যে ঝংকার ওঠে, 'দেখছি পৃথিবীতে শান্তি বলে জিনিষটা সত্যিই নেই। বার কয়েক মরবার চেষ্টা করে করে সুবিধে করে উঠতে না পেরে বাড়ি থেকে পালাচ্ছি। হঠাৎ আপনি কোথা থেকে এসে তাতেও বাধা দিলেন। আশ্চর্য! রেলের লাইনে কাটাই পড়তে হবে শেষ পর্যন্ত!'

শঙ্খ অপ্রতিভ গলায় বলে, 'বলেন তো চলে যাই।'

'আমি বলবো? কেন? আমার অনুমতি নিয়ে তবে এসেছিলেন না-কি? তা হলেও বলবো, আপনি হচ্ছেন একটি ভদ্রবেশী অভদ্র। একটা মেয়ে নিজের মর্জিতে যাচ্ছে, তার পিছু নিয়ে কিনা— 'শুনছেন? শুনছেন? আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

আপনার ব্যাপারটা কি?·· আশ্চর্য!'

শঙ্খ এবার হেসে ফেলে।

হেসে বলে, 'আসল কথাটা শুনবেন? নাঃ, সে শুনলে আপনি রেগে যাবেন।'

'আমার রাগের ভয়ে তো আপনি মরেই যাচ্ছেন!'

'তা যাচ্ছি বৈ কি!'

'লক্ষণ তো দেখছি না। কী বলছিলেন?'

'বলছিলাম আমি কিন্তু প্রথমে আপনাকে মেয়ে বলে ভাবিনি। ভাবছিলাম কোন চোর চুরি করে পালাচ্ছে।'

'বাঃ চমৎকার! ধরে পুলিশে দিয়ে মোটা বখশিস পেয়ে যাবেন, এই আশায় বোধকরি পিছু নিয়েছিলেন?'

ঠিক অতটা না হলেও'—শঙ্খ হেসে ওঠে, 'কাছাকাছি। চোখের সামনে দিয়ে একটা চোরকে পালাতে দেব? বীরত্বে বাধলো। ভাবলাম, ধরে ফেলা মানবিক কর্তব্য।'

'আশা করি সেই অপূর্ব কর্তব্য সম্পর্কে একটু শিথিল হয়েছেন।

'হতেই হলে।' শঙ্খ বলে, 'যদিও আমার অনুমানটা ভুল হয়নি। চোরের মহিলা সংস্করণ! চুরি করেই তো পালাচ্ছেন', বললো। 'আর ভয় কিসের? একটা মেয়ে তো!'

মেয়েটা এবার হাঁটা থামিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ

গলায় বলে, 'তাতে আপনার কোন অসুবিধে হয়েছে? আপনার পাকা ধানে মই পড়েছে? আপনার বাড়া ভাতে ছাই লেগেছে?'

শঙ্খ ওই ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও ভাবে, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ! থাক বেশী ক্ষেপিয়ে কাজ নেই। হঠাৎ যদি, চেঁচায়।

বললো, 'আপনি রেগে গেছেন। আচ্ছা নমস্কার। চললাম।'

শঙ্খ ফিরে দাঁড়াতে উদ্যত হয়।

কিন্তু এবার হাওয়া উল্টো বয়।

মেয়েটাই বলে ওঠে, চললাম মানে? কোথায় চললেন? এখন কোন ট্রেন আছে?'

'জানিনা।'

'জানেননা, অথচ রাগ দেখিয়ে চলে যাচ্ছেন।'

'একটা যা হয় উপায় হবেই।'

'রাত দেড়টার আগে আর কোন উপায় নেই। দেড়টায় একটা ডাউন ট্রেন আসে, আধমিনিট দাঁড়ায়।'

শঙ্খ মনে মনে হিসেব করে নেয়।

রাত আড়াইটে, দুটো স্টেশন আগে। ধরতে পারলে অন্ততঃ আজ রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবুতো বলা যাবে, বিয়ের রাতেই এসেছি।'

বৃষ্টি? কাদা? অন্ধকার?

হোক, যা থাকে কপালে।

কিন্তু ও?

শঙ্খ মনে মনে হাসলে।

ওর দায়িত্ব আমায় কে দিয়েছে? তবু জিগ্যেস না করে পারলোনা।

'আপনি কোথায় যাবেন?

'সেটা জানা কি আপনার খুব প্রয়োজন?'

শঙ্খ আবার মনে মনে হাসে।

এখনো হয়তো আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেনা ও।

অথবা ওর প্রকৃতিই এমনি উদ্ধত। সাধারণ সৌজন্য ভদ্রতার ধার ধারে না।

সেই কথাটাই বলে ফেলে শঙ্খ, 'আপনি বোধহয় সাধারণ সৌজন্যের ধার ধারেন না?'

'না ধারিনা।' উদ্ধত মেয়েটা বলে ওঠে।

'পরিবেশটা আপনার কাছে কি সৌজন্যের পালিশ পিছলোনো ড্রইংরুমের পরিবেশ বলে মনে হচ্ছে'।

'সৌজন্য সব পরিবেশেই থাকা উচিত।

'তাই বুঝি?' মেয়েটা সেই পুরুষালি পোশাকের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ মেয়েলি গলায় ব্যঙ্গ করে হেসে ওঠে, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে সৌজন্যবোধের বাড়াবাড়ি আপনার নেই। থাকলে তার খাতিরে চোখের সামনে একটা মেয়ে একটা স্যুটকেশ বইছে দেখে উদাসীন থাকতে পারতেন না।

হাতটা থেকে স্যুটকেশটা ধুপ করে নামিয়ে হাতটা ঘষতে থাকে মেয়েটা।

বৃষ্টি ছেড়ে গিয়েছিল, প্রকৃতি যেন সদ্য স্নান করে ধোয়া কাপড় পরে দাঁড়িয়েছে। এখনো মেয়েটার মুখ দেখা যাচ্ছেনা ভাল করে কারণ ওই পুরুষালি বর্ষাতি জামার টুপিটা তখনো ওর মাথা আর মুখের আধখানা ঢেকে রেখেছে।

শঙ্খর ইচ্ছে হচ্ছিল ওর ওই আবরণটা খুলে ফেলে দিয়ে দেখে, কেমন ওর মুখ। জিজ্ঞেস করে, তোমার এই গৃহত্যাগের ইতিহাস কি? কিন্তু সেটাতো সম্ভবনা।

শঙ্খ তাই বলে, এখনো তো আমায় বিশ্বাস করতে পারছেননা, স শিভ্যালরি দেখাতে গেলে হয়তো চোখ রাঙিয়ে বলবেন, আমার এত মাথা ব্যথা কিসের? ছিন্‌তাই করতে এসেছেন কিনে বিশ্বাস কি?

মেয়েটা এবার মলিন গলায় বলে, 'আমাকে আপনার এতদূর অসভ্য মনে হচ্ছে?'

শঙ্খ এবার গাম্ভীর্য নিয়ে বলে, 'কিন্তু কথাটা তো সত্যিও হতে

পারে? আমি যে অসৎ লোক নই তারও তো কোন প্রমাণ পাননি আপনি। আপনি নিজের মনে যাচ্ছিলেন, আমি আপনাকে 'ফলো' করতে করতে এতদূর এলাম, গায়ে পড়ে আপনার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করছি, এখন এই জনমানবহীন জায়গায় আমি কি করতে পারি আর না পারি বলতে পারেন?'

'পারি।' মেয়েটা স্যুটকেশটা আবার হাতে তুলে বাড়িয়ে বলে, 'কাজ এড়াতে অনেক কথা বানাতে পারেন। কিন্তু ফাঁকি চলবে না নিন ধরুন। আপনারটা বোধহয় হালকা ওটা আমায় দিন।'

'থাক, কোনোটাই নিতে হবে না—শঙ্খ হেসে বলে, 'আমারটা বন্ধক রেখে কোনো লাভ হবে না' নেহাৎই ফাঁকা। যাক, কোথায় যাবেন সেটা কিন্তু এখনো অনুক্ত আছে।'

মেয়েটা আনমনা গলায় বলে কি বলবো? নিজেই জানি না।'

'নিজেই জানেন না?'

নাঃ! যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলে যাব বলে বেরিয়েছি। আজ বাড়ির সবাই এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়েতে বহরমপুর গেছে, আমার জ্বর হয়েছিল তাই নিয়ে যাবার জন্যে জোর করতে পারে নি। এই সুযোগে—'

'জ্বর হয়েছিল।' শঙ্খ বন্ধুর গলায় বলে, তা' জ্বরের মিস্রচারটা ভালই হলো! মুষলধারে বৃষ্টি!'

'যাকগে! মরে গেলেই বা পৃথিবীর কি এসে যাচ্ছে। তবে আগে ভাবতাম মরব, হঠাৎ মনে হচ্ছে মরবোই বা কেন? এতবড় পৃথিবীতে এই সাধনপুরের চৌধুরীদের বাড়িটা ছাড়া কি আর জায়গা নেই?'

কিন্তু আশ্চর্য লাগছে এমন অদ্ভুত জায়গাটা আপনার শ্বশুরবাড়ি হলো কি করে?'

'লোভ জিনিসটা জগতে অনেক অদ্ভুত জিনিসই ঘটায়। মেয়ে জমিদার বাড়ির বৌ হবে এ কি গরীবের পক্ষে কম লোভ?'

শঙ্খ একটু চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু আমরা এমন উল্টোদিকে হেঁটে চলেছি কেন?'

মেয়েটা হেসে ওঠে বলে, আমি যাচ্ছি ওদিকটায় ভয় বলে, আর আপনি যাচ্ছেন আমায় 'ফলো' করতে।' তারপরই সহসা গম্ভীর হয়ে বলে, 'মানুষের মন জিনিসটা কি আশ্চর্য। দেখুন আমি আপনার সঙ্গে এত কথা বলছি হাসছিও অথচ কিছুক্ষণ আগেও ভেবেছি জীবনে কখনো হয়তো হাসতে পারবো না, প্রাণ খুলে কথা বলবো না।'

মৃদু চাঁদের আলো উঠেছে হালকা দুধের সরের মত যেন পৃথিবীর গায়ে একটা সর পড়েছে। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটছে পাশাপাশি।

শঙ্খর হাতে দুটো স্যুটকেশ।

শঙ্খর গায়ের জামার জলঝ'রে আস্তে আস্তে শুকোচ্ছে। শঙ্খর চুলগুলো থেকে তখনো জল ঝরছে।

শঙ্খ আস্তে বলে কারো একান্ত ব্যক্তিগত কথা জিগ্যেস করা সভ্যতা বহির্ভূত কিন্তু একটু আগে আপনি যা বলেছেন, সেই কথাটাই আমি বলি, এই অদ্ভুত পরিবেশটিকে বুঝি সাধারণ সামাজিক রীতিনীতির আওতায় ফেলা চলে না। তাই মনে হচ্ছে—

মেয়েটাও আস্তে বলে, কিন্তু কি লাভ বলুন? আর ঘণ্টা কয়েক পরেই তো কে কোথায়? জীবনেও আর দেখা হবে না।'

'তা বটে !!

শঙ্খ আরো একটু পরে বলে, 'কিছু ভাবছি—এমন ঘটনা কি ঘটবে যে আপনি এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি ট্রেনে উঠে পড়বো?'

মেয়েটা যেন ভয় পায়।

তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না, আমিও ট্রেনে উঠবো। আর হয়তো শেষ অবধি কলকাতায়ই যাবো।'

'সেখানে বুঝি আপনার মা-বাবা আছেন?'

'না তাঁরা বক্সারে থাকেন। তাঁরা জানেন মেয়েকে খুব ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, খুব সুখে আছে মেয়ে। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের আম, ঘরের গরুর দুধ, আর কি চাই।

শঙ্খ বলে, কলকাতায় যাবো, বললেই তো হয় না। থাকবার জন্যে ভালো একটা জায়গা তো থাকা দরকার?'

মেয়েটা এবার বিদ্রূপের গলায় বলে, আপনার যা আগ্রহ দেখছি, ...নে হচ্ছে জায়গাটা আপনিই বাতলে দেবেন।'

'আমার কী স্পর্ধা?'

'ওঃ সেই রাগ! দেখুন যা নিজেই জানিনা তার উত্তর দেওয়া ...ক্ত। তবে বুদ্ধি করে কিছু টাকা আর বড়-লোকের বৌয়ের গহনা ...খানা নিয়ে এসেছি। অবশ্য যা আমার নিজের কাছে ছিল। ...বণীগুলো তো শ্বশুরের লোহার সিন্দুকে। তবু—যা পেরেছি হাতিয়ে ...নিয়ে এসেছি—মেয়েটা হেসে ওঠে, নিঃসম্বল হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, ...ত কবিত্বে লাভ নেই। তবে নেহাৎ চুরিও হল না। এতদিন ...দের দাসীত্ব করলাম, তার মাইনে বলেও ধরতে পারি।'

শঙ্খর ভারি অদ্ভুত লাগছিল।

কোথায় তখন সে দিদির মেয়ের বিয়ের আসরে বরের মামাশ্বশুর ...য়ে তদারকী করে বেড়াবে তা নয় গল্পের নায়কের মত এক ...অপরিচিতা নায়িকার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রার ...তো। রাত কতই বা; অথচ মনে হচ্ছে পৃথিবীতে বুঝি কোনো ...জীবিত প্রাণী নেই। আছে শুধু অনন্ত আকাশ, আর একজোড়া ...সাপের মতো ওই রেল-লাইনটা পড়ে আছে বহুদূরের ইশারা বহন করে।

কিন্তু তবু মনে রাখতেই হবে আর একটা ট্রেন আসছে, এবং তাতে চেপে বসতে হবে শঙ্খকে।

তাই শঙ্খ বলে ওঠে, কিন্তু স্টেশনের কাছাকাছি থাকলেই ভাল ছিল, হঠাৎ ট্রেন এসে পড়লে—

'হঠাৎ? বললাম না—সেই রাত দেড়টায়!

'দেড়টা বাজে হয়তো—

'পাগল!! এই তো বেরোলাম আমি পৌনে আটটার সময়! এখন বড়জোর—দেখুন না ঘড়ি।

ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করে শঙ্খ, সেই মৃদু আলোয়।

কাছে থেকে দূরে থেকে। অবশেষে কানে দিয়ে। আর তখনই একটা ভয়ঙ্কর সত্য ধরা পড়ে যায়, ঘড়ি বন্ধ।

আটটা বেজে বন্ধ।

অর্থাৎ এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে ভুল ষ্টেশনের জন্য ঘড়িটাই দায়ী।

বন্ধ ঘড়ি বড় ভয়ানক।

বিশেষ করে ট্রেনের সময়।

মনে জানছে এখনো অনেক সময় আছে, তবু ওরা স্টেশনের কাছাকাছি একটা জায়গাতেই এসে বসলো। জায়গাটা হচ্ছে একটা অশ্বত্থতলায় বুড়ো শিবের' মন্দির। মন্দির বন্ধ তবু চাতাল আছে। ষ্টেশনের কাছেই কেউ বানিয়ে রেখেছে বিগ্রহ, যাতে যাত্রী সংখ্যা বেশী হয়।

ওরা চাতালটাতে এসেই বসলেন, শেড-এর নীচে।

তারপর কেমন করে যেন খুলে গেল মনের রুদ্ধ দুয়ার। রহস্যময়ীর জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়ে গেল টুকরো, টুকরো কথায়।

কিন্তু কী এমন নতুন সেই ইতিহাস?

পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসে অসহায় নারীর যা ইতিহাস তাই।

নিঃসম্বল, জীবন, সহানুভূতিহীন সমাজ, অত্যাচারী স্বামী।

চিরকালই পড়ে মার খেয়েছে এরা। আজকের যুগেই হয়তো তাদের শেখাচ্ছে—বেরিয়ে পড়ে দেখ না পৃথিবীটা কত বড়।

অনেকক্ষণ কথাবলার পর হঠাৎ কেমন চুপ হয়ে গেল ওরা। যেন কথাহীন একটা গভীরতায় তলিয়ে গেল। আচ্ছা, শঙ্খ যদি কাঞ্চনপুরের জন্যে আর ছুটোছুটি না করে?

শঙ্খ যদি ওই অপরিচিতকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দেয় রেলপথ থেকে জীবনপথে!

শঙ্খর অসুবিধে কি? ওর জীবন তো ওর নিজের হাতে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ওই গভীর স্তব্ধতার উপর ছুরির মত এসে বিঁধলো একজোড়া জ্বলন্ত চোখ, আর তার সঙ্গে মাটি কাঁপানো তীব্র একটা গর্জন।

এসে গেছে।

আধমিনিট দাঁড়াবে মাত্র।

গাড়ির মধ্যে আলো নেই।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শঙ্খ হাত বাড়িয়ে দেয়, বসে, আপনি উঠেছেন?'

হাতের উপর একটা হাত এসে পড়েঃ ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

অন্ধকারে হারিয়ে যাবার ভয়ে ওই ভিজে হাতটা কি আর একখানা বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে আশ্রয় নিতে চাইছে?

কিন্তু ওটা ভুল কল্পনা।

ওতো কোনো বলিষ্ঠ হাতের ভরসা করে পথে বেরোয়নি! তবু তেমনি একটা কল্পনা নিয়েই বসে রইল শঙ্খ। যেন অনন্তকাল বসে থাকবে।

কিন্তু কতক্ষণই বা! হঠাৎ সেই অন্ধকারকে ধাক্কা মেরে কোনো এক স্টেশনের আলো দেখা গেল, গাড়ি থামলো। আর কোথা থেকে যেন একটা ভাঙা ভাঙা বুড়ির গলা বলে উঠলো, 'অ মদন নেমে পড়, নেমে পড়। কাঞ্চনপুর এসে গেছে।'

কাঞ্চনপুর এসে গেছে।

শঙ্খর সমস্ত চৈতন্য যেন একটা চাবুক খাওয়ার অনুভূতিতে লাফিয়ে উঠলো।

শঙ্খ অজ্ঞাতসারেই বুঝি সেই ভেজা ভেজা হাতটার বন্ধন থেকে পিছলে পড়ে গেল।

হয়তো শঙ্খ ভেবে চিন্তে কিছুই করেনি। হয়তো ভুল স্টেশনে নেমে পড়ার সেই লজ্জার গ্লানি তার অবচেতনে কাজ করেছে। আর সেই 'কাজ' যেন শঙ্খকে 'কাঞ্চনপুর' শব্দটার ওপর আছড়ে ফেলে দিয়েছে।

চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা ঘস ঘস করে চলে যাবার পর তবে খেয়াল হয় শঙ্খর সে নেমে পড়েছে। স্যুটকেটাকেও নামাতে ভোলেনি, পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে সেটা।

শঙ্খ কি আবার ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়বে?

শঙ্খ কি অন্ততঃ ছুটে গিয়ে দেখবে কোনো কামরায় জানলা কোনো মুখ দেখা যাচ্ছে কি না ?

কিন্তু শঙ্খ পাগল নয়।

শঙ্খ সহজ সুস্থ স্বাভাবিক, মানুষ।

তাই শঙ্খ গ্রামের কাঁচা রাস্তায় পা বসিয়ে বসিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চার-পাঁচ বছর আগের স্মৃতি স্মরণ করে করে এগোয়।

হাতের সুটকেশটা যেন বোঝার মত লাগছে, জুতোটা এক মণ ভারী। কর্তব্য করতে পাবার সুখানুভূতি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।...

শঙ্খকে দেখে দিদির বাড়িতে যত আনন্দ ততো বিস্ময় !

আনন্দ তো আবির্ভাবে। বিস্ময়—এ সময় কোন গাড়িতে ?

ট্রেন ফেল কথাটাও চলে না এখন। ফেল করলেও এলো কিসে, সেটাই কথা। কাজে কাজেই সবাইকে বলতে হলো, সে একটা কাণ্ড ! পরে বলবো।'

তারপর শঙ্খ যেন স্রোতে ভেসে গেল !

কথা, কাজ প্রণাম, আদর ! ভেসে যাওয়া আশ্চর্যের নয় প্রত্যেকেই আলাদা করে শঙ্খর বিলম্বের হেতু জিগ্যেস করছে। আর শঙ্খ যে এ-বাড়িতে দুর্লভ অতিথি সে কথা ধরা পড়ছে সকলের চোখে মুখে কথায়।

তারপর ওরই মধ্যে কথাটা একবার মনে পড়ে যায়, শঙ্খর আর এক ভগ্নীকে ডেকে বলে, এই বৃান্টির জন্যে শাড়ি এনেছিলাম আমা সুটকেশে আছে, বার করে নে।'

'চাবি ?'

'চাবি দেওয়া নেই।'

'আপনিই বার করে দিন না ?'

'কী আশ্চর্য ! সুটকেশ খুললেই তো পাবি !'

তারপর জামাইবাবু, ডেকে নিয়ে গেলেন নতুন কুটুম্বদের সা পরিচয় করাতে। দেখাবার মত একটা আত্মীয়ও আছে তাঁর সো দেখাবেন বৈ কি।

তারপর কতক্ষণ যেন গেল, কে যেন এসে কি বললো, কোথায় যেন অনেক মেয়ের কলকণ্ঠ ধ্বনি পুলক উচ্ছ্বাস। কিছু একটা দেখে যেন আনন্দে উত্তেজিত হয়েছে কণ্ঠে সেই উত্তেজনা।

কী দেখে এত খুশি হচ্ছে ওরা?

বর?

এতটা খুশি হবার মতো কি?

কিন্তু না, খুশি হয়েছে ওরা বান্টির মামার সৎবিবেচনায়। সাত-জন্মে খোঁজ খবর না নিক, ভাগ্নীর বিয়ের সময় অবস্থাপন্ন মামার মতোই ব্যবহার করেছে।

কে যেন বললো, "বাবাঃ, ঠিক যেন তত্ত্ব সাজিয়ে এনেছেন!"

কে বললো, 'নিজের তো বিয়ে হয়নি, এত সব জানলেনই বা কোথা থেকে?

কে বলছে, 'বললেন, শাড়ি আছে বার করে নে। বাব্বাঃ এক গোছা শাড়ি, সায়া ব্লাউজ! আরো কত কি!"

শঙ্খর মাথার মধ্যে সমুদ্রের রোল উঠেছে। শঙ্খর সামনে কারা যেন স্যুটকেশ খুলেছে, ধন্যি ধন্যি করছে শঙ্খকে।

তারপর ধন্যি' টা গেল।

দিদি এসে তিরস্কারের সুরে বলে উঠলেন, 'এসব কি পাগলামি করেছিস শঙ্খ, কাপড়চোপড় দিলি দিলি দু'খানা ভালভাল গয়না কেন! বালাটা তো খুব ভারী। হারটাও কম নয়। কে জানে কত পড়েছে তোর। আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করছে। এত কি জন্যে করতে গেলি।

কিন্তু এত কথা কি শঙ্খর কানে ঢুকছিল?

একটা লাইনই তো বোলতার মত কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে।

'দু' দুখানা ভাল ভাল গয়না'—

শঙ্খর বুদ্ধিবৃত্তি চেতনা অব-চেতনা সব যেন পাথর হয়ে যাচ্ছে। শঙ্খ ওই আনন্দে উল্লসিত নারী-কুলকে পাথর করে দিতে পারছে না। তাহার হাত চেপে ধরে বলতে পারছে না, 'ওটা নয়! ওটা নয়।

আর শঙ্খ কিছুতেই অনুমান করতে পারছে না সেই ভাল করে না

দেখা মুখটা ঘৃণায় আর ব্যঙ্গে কঠোর হয়ে কী রকম দেখতে হয়ে উঠেছে। শম্ভু কিছুতেই আশা করতে পারছে না, সেই ঘৃণার মুখটা উদারতায় শিথিল হয়ে গিয়ে ভাবছে, 'লোকটা ভুল করে ভুল ষ্টেশনে নেমেছিল।

শম্ভুর হৃৎপিণ্ডটা শম্ভুর ঘড়ির মত হয়ে যাচ্ছে যেন!

॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র জন্য ১৯৭৮এ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (যার মূল্য এক লক্ষ টাকা) লাভ করেন। আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের গল্পকারদের মাতৃস্বরূপিণী অনুভবনীয় জীবন্ত এক অস্তিত্ব। বর্ষীয়সী লেখিকা বর্ত্তমানে বৃহত্তর কলিকাতার গড়িয়াবাসিণী। আশাদেবীর লেখায় সমস্যা পীড়িত সভ্যতাশাসিত নাগরিক জীবনযাত্রা ও গাছপালা লতাপাতায় ঘেরা কল্লোলিত নদনদী মুখরিত শ্যামল মাটির এই পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মধ্যেও অনন্ত কালের মানব জীবন সম্পর্কে তাঁর সীমাহীন কৌতুহল ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর শিল্পী হৃদয়ের উত্তপ্ত সহানুভূতির সিঁড়ি বেয়ে মানব মনের গভীর রহস্যের উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। আর আমাদের সহজ সাধারণ বাঙ্গালী সংসার যাত্রার বিষয় বৈচিত্রের প্রেক্ষাপটে, বর্ণালী প্রলেপ দিয়ে অনন্যকরণীয় আস্বাদ্য শিল্প সৌকর্য সৃষ্টি করেছেন।



অমর-গ্রাম

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মাসখানেক ধরে শরীরটা খারাপ হয়েছে। যা খাই, অম্বল হয়। বিকালে মাথার যন্ত্রণা। রাতে ঘুম নেই। কাজে একেবারে উৎসাহ পাচ্ছি না। পাড়ার ডাক্তার বলল, ওষুধে সাময়িক উপকার হতে পারে, স্থায়ী কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং ভাল জায়গায় চেঞ্জে চলে যান। মাস দুয়েক থাকলেই সেরে যাবেন।

কোথায় যাব তাই নিয়েই সমস্যা। এক এক বন্ধু এক এক রকম উপদেশ দিতে লাগল। কেউ বলল ভুবনেশ্বর, কেউ হাজারিবাগ আবার কেউ দেওঘর।

কি করব, কোথায় যাব যখন ভাবছি, তখন হঠাৎ অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফাঁকা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি, আচমকা পিঠে কার স্পর্শ।

ফিরে দেখি অমল। কলেজ ছাড়ার পর অমলের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

আমাকে দেখে অমল বলল, চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। কি ব্যাপার?

কি ব্যাপার বললাম।

শুনে অমল বলল, ওসব ভুবনেশ্বর দেওঘরের চিন্তা ছেড়ে দাও। ওখানে কিছু হবে না। তুমি মিলনপুরে চলে যাও। তিন দিনে তোমার অম্বল সেরে যাবে।

মিলনপুর কোথায়? কখনও তো নাম শুনি নি।

অমল হাসল. বেশি লোক নাম শোনে নি বলেই তো জায়গাটা এখনও ভাল আছে। ভিড় হলেই জলবায়ু বদলে যায়।

যাব কি করে? থাকব কোথায়?

কোন অসুবিধা নেই, আমার বাবা একটা বাংলো কিনেছিল মিলনপুরে। এখন কেউ যাই না। আমিও তো এখন অন্য জায়গায় থাকি, তবে লোক আছে। তার কাছে আমার নাম কর। কোন অসুবিধা হবে না।

অমল আরও বলল, গিরিডি স্টেশনে নেমে বাসে তের মাইল। মিলনপুরে নেমে অমরধাম বললেই যে কোন লোক দেখিয়ে দেবে। তুমি চলে যাও। শরীরটা সারিয়ে এস।

তাই গেলাম।

মিলনপুরে যখন নামলাম, তখন রাত প্রায় আটটা। চারিদিক অন্ধকার। একদিকে নীচু নীচু পাহাড়। তার কোলে ঘন অরণ্য। আর একদিকে সরু নদী, প্রায় নালার মতন, কিন্তু কি জলের গর্জন। স্রোত পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে।

টর্চ জ্বেলে কোন রকমে এগোতে লাগলাম। সরু পায়ে চলা পথ। লাল মাটি। মাঝে মাঝে কালো পাথর। অন্যমনস্ক হলে হোঁচট খাবার আশঙ্কা।

পথের একপাশে একটা মুদির দোকান। মুদি ঝাঁপ বন্ধ করছিল, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখানে অমরধাম কোথায় বলতে পার?

মুদি লণ্ঠন তুলে কিছুক্ষণ আমার দিকে দেখে বলল, সেখানে তো কেউ থাকে না। বাড়ি একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে।

বুঝলাম, মুদি বাড়িটার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখে না। জঙ্গল হলে কি অমল আমাকে আসতে বলত। এমন হতে পারে মালী হয় তো বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করে না। তাতেই আগাছা জন্মেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, বাড়িটা কোন্ দিকে বল?

মুদি বলল, সোজা চলে যান। সামনে একটা নীচু টিলা দেখবেন, সেটা বাঁদিকে রেখে ঘুরে যাবেন। এক জায়গায় গোটা চারেক শাল গাছের মেলা। পাশে সাহেবদের গোরস্থান। সেটা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই সাদা পাঁচিল ঘেরা অমরধাম।

এক হাতে সুটকেস, আর এক হাতে টর্চ। সাবধানে এগোতে লাগলাম! রাত নটার বেশী হয় নি, কিন্তু এই জনমানবহীন ঘন জঙ্গলে ঘেরা অন্ধকার জায়গায় মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক, মাঝে মাঝে পায়ের কাছে খর খর শব্দ করে কি যেন সরে যাচ্ছে। সাপ হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক সময়ে নীচু টিলা পেলাম। গোরস্থানও। অন্ধকারে অনেক-গুলো আলোর ফুটকি। সম্ভবতঃ শেয়ালের চোখ। বড় শেয়াল অর্থাৎ বাঘ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

যাক, অবশেষে অমরধাম পাওয়া গেল। বেশ ভাল বাংলো। অন্ততঃ এক সময়ে বেশ ভালই ছিল, এখন অযত্নে জায়গায় যায়গায় পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। জলের পাইপে আগাছা হয়েছে সামনের চাতাল শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে।

গেট ঠেলতে ক্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ করে গেট খুলে গেল।

ভিতরে গিয়ে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলাম। বার দশেক কড়া নাড়ার পর দরজা খোলার শব্দ হল।

বারান্দায় গলা শোনা গেল, কে ?

আমি ওপর দিকে মুখ তুলে বললাম, আমি অমরের বন্ধু। আমার আসার কথা ছিল।

আরে পার্থ না ? তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করে রয়েছি। দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।

আমার নিজের খুব অবাক লাগল। কে লোকটা ? আমার নাম জানল কি করে ? তবে কি আমাদের কোন বন্ধু আমার মতন শরীর সারাতে এখানে এসে উঠেছে।

নীচের দরজা খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে এক ঝাঁক চামচিকে উড়ে গেল। আর একটু হলেই তাদের ডানা আমার মাথায় লেগে যেত।

লম্বা চেহারার একটি লোক আমার দু' কাঁধে দু' হাত রেখে বলল, ও পার্থ, কত যুগ পরে দেখা বল তো ?

টর্চের আলোটা তার দিকে ফেললাম।

লম্বা পুলক। আমাদের কলেজে দুজন পুলক ছিল, তাই একজন লম্বা পুলক আর একজন বেঁটে পুলক।

তারপরের কথাটা মনে হতেই মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা প্রবাহ নামল। বুকের শব্দ দ্রুততর।

তাই তো শুনেছিলাম, বছর পাঁচেক আগে টালা ব্রিজের কাছে লম্বা পুলক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। পুলক মোটর সাইকেলে ছিল। সামনা-সামনি এক লরীর সঙ্গে ধাক্কা, পুলক আর তার মোটর সাইকেল দুইই একেবারে ছাতু হয়েছিল।

কি, সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ?

পুলক তাড়া দিল।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, না, চল। একটা কথা ভাবছিলাম।

কি কথা ?

শুনেছিলাম দুর্ঘটনায় তুমি মারা গেছ। বছর পাঁচেক আগে।

পুলক খুব জোরে হেসে উঠল।

আরে এক রকম মরাই তো। দেখ না, বাঁ পায়ে একদম জোর পাই না। হাসপাতাল থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। বলতে নেই এখন খুব ভাল আছি ভাই, এখানকার জল হাওয়ায় খুব উপকার পেয়েছি। এস, ভিতরে এস।

শরীর খুব পরিশ্রান্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে আমারও ভাল লাগছিল না। কোন রকমে কিছু, মুখে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি!

স্নান করবে তো? পুলক জিজ্ঞাসা করল।

এত রাতে? নতুন জায়গায়? সাহস হচ্ছে না।

আরে গরম জলে স্নান করে নাও। শরীর ঝরঝরে লাগবে। গরম জল এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান সেরে বাইরে আসতে দেখি টেবিল সাজিয়ে পুলক বসে আছে। প্লেট ভর্তি গরম ভাত আর মুরগির মাংস।

এখানে রান্না করে কে?

পুলক বলল, রান্না বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার সবই মুংলা করে। এদেশী লোক। ভারি কাজের।

তুমি খাবে না?

আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে খেয়ে নিই। নাও, তুমি আর বসে থেক না? নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়। এটা তোমার ঘর।

এ ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সিঙ্গল খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা। মাথার কাছে টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস। ভোরে উঠে আমার যে জল খাওয়ার অভ্যাস, এটা পুলক জানল কি করে?

শুয়ে পড়লাম। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র গভীর নিদ্রা।

মাঝরাতে পেঁচার বিদকুটে ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই চমকে উঠলাম। বরফের মতন ঠাণ্ডা স্পর্শ। চোখ খুলেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমারই বালিশে মাথা দিয়ে একটা কঙ্কাল শুয়ে। একটা হাত প্রসারিত। সেই হাতটাই আমার শরীরে ঠেকেছিল।

আর্তনাদ করে উঠে বসলাম।

কি, কি হল পার্থ?

পুলক খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কালের দিকে আঙ্গুল দেখাতে গিয়েই দেখলাম, বিছানা খালি! কোথাও কিছু নেই।

না তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সর, আমি না হয় তোমার পাশে শুই।

লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, না, না, তোমার শুতে হবে না। তুমি যাও।

পুলক সরে গেল।

ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে নতুন এক চিন্তা মনে এল। শোবার আগে আমি তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তা হলে পুলক ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে? উঠে আর পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এল।

পরের দিন সকালে উঠেই দেখলাম ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল দেওয়া। এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ভিতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই।

তাহলে পুলক কাল রাতে ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে।

দরজা খুলতেই পুলককে দেখলাম। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল রাতে তার ঘরে ঢোকার কথা বলতেই সে হেসে উঠল খুব জোরে।

তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ। আমি আবার কখন তোমার ঘরে ঢুকলাম?

স্বপ্ন? তা হবে! কিন্তু এত পরিষ্কার স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখি নি। এখনও চোখের সামনে যেন ঘুমন্ত নরকঙ্কালটা দেখতে পাচ্ছি।

মুখ হাত ধুয়ে নাও। মুংলা এখনই চা দিয়ে যাবে।

বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ার পাতা। মাঝখানে গোল বেতের টেবিল।

হাতমুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। উল্টোদিকের চেয়ারে পুলক বসে বলল, মুংলা পার্থবাবুর চা নিয়ে এস।

চা আর টোস্ট নিয়ে যে এল, তাকে দেখে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। এমন বীভৎস চেহারা আমি জীবনে দেখি নি!

গায়ে চিমটি কাটলেও এক তিল মাংস উঠবে না, এমনই শীর্ণ চেহারা। চোখ দুটো এত ভিতরে ঢোকা যে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সরু কাঠির মতন হাত পা। ঝকঝকে দাঁতের পাটি সর্বদাই বাইরে।

চা টোস্ট দিয়ে চলে যেতে আমি বললাম, লোকটার চেহারা দেখলে ভয় করে।

পুলক বলল, মানুষের চেহারা আর কতটুকু? ছাল ছাড়ালে সবাই সমান। মুংলার চেহারা যেমনই হোক, লোকটা কিন্তু খুব কাজের। তাছাড়া নিজের লোক ছাড়া আমরা তো আর যাকে তাকে রাখতে পারি না।

নিজের লোক মানে!

মানে খুব জানাশোনা। একেও এখানকার গাঁ থেকে অমলই যোগাড় করে এনেছে। খেতে খেতে বললাল, তোমার চা টোস্ট কই?

পুলক উত্তর দিল, আমি এসব খাই না ভাই। সহ্য হয় না। ভোরে উঠে ছোলা ভিজানো খাই আদা দিয়ে।

একটু থেমে পুলক বলল, তুমি বস! আমি একটু ঘুরে আসি।

এখন আবার কোথায় যাবে?

একবার পোষ্ট অফিসে যাব, তাছাড়া আরও দু এক-জায়গায় ঘুরে আসব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর না। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।

সারাটা দিন পুলক ফিরল না। সন্ধ্যার সময়েও না।

মুংলাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, বাবুর ফেরার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোথায় কোথায় যে যান –

খাবার সময়ে এক কাণ্ড। বসে খাচ্ছি, পাশে মুংলা দাঁড়িয়ে। তাকে বললাম, একটু তরকারি নিয়ে এস তো আর দু'খানা রুটি।

মুংলা চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত গিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে তরকারি আর রুটি এনে দিল। ঠিক মনে হল এগুলো নিয়ে কে যেন বাইরে অপেক্ষা করছিল।

কিছু আর জিজ্ঞাসা করলাম না, কিন্তু এ বাড়ির বাতাসে কেমন যেন ভয়ের গন্ধ। মনে হয় অশরীরী আত্মারা আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে।

সেই রাত্রেই দারুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। পুলক তখনও ফেরে নি।

ঘুম আসে নি, বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। হঠাৎ বাইরে খরখর আওয়াজ। পাতা দু-হাতে রগড়ালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনই!

আস্তে আস্তে উঠে জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরে চোখ রাখলাম। ম্লান চাঁদের আলো। খুব স্পষ্ট নয়, আবার একেবারে অস্পষ্টও নয়।

উঠানে একটা গুঁড়ির ওপর দুটো কঙ্কাল ঘেষাঘেষি বসে। একজনের হাত আরেক জনের গলায়। আর একটু দুরে একটা গাছের ডাল ধরে মুংলা দোল খাচ্ছে। কি লম্বা চেহারা! সারা দেহে কোথাও এক তিল মাংস নেই। চোখের দুটো গর্ত থেকে গাঢ় লাল রং বের হচ্ছে।

অজান্তেই মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাল দুটো ফিরে দেখল। চোখ নেই, তবুও কি মর্মভেদী দৃষ্টি। বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হয়ে গেল।

আশ্চর্য কাণ্ড! একটু একটু করে কঙ্কাল দুটোয় মাংস লাগল। সেকেণ্ড কয়েক-এর মধ্যে দুটি পূর্ণ মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল।

তখন আর চিনতে অসুবিধা হল না। একজন পুলক, আর একজন অমল।

কাঁপ'ঃ কাঁপতে বিছানায় ফিরে গেলাম।

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। যা দেখেছি তারপর ঘুমানো সম্ভব নয়। বাইরে খটখট শব্দ। মনে হল একাধিক কঙ্কাল মূর্তি উঠানে পায়চারি করছে। সেই শব্দের সঙ্গে পেঁচার ডাক, বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি মিশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল।

ভোর হতে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করি নি। সুটকেসটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। বের হবার সময় রান্নাঘর থেকে বাসনপত্রের আওয়াজ আসছিল। একটু পরেই হয় তো মুংলা চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। দিনের আলোতেই মুংলার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই।

ছুটতে ছুটতে যখন মুদির দোকানের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন মুদি সবে দোকানের ঝাঁপ খুলছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, এক গ্লাস জল।

মুদি আমাকে দেখে অবাক। বোধ হয় জীবন্ত দেখবে আশাও করে নি। জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি অমরধাম থেকে আসছেন ?

হ্যাঁ।

খাওয়াদাওয়ার কি করতেন ?

মুদির কাছে কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। শুধু বললাম, কেন, মুংলা রাঁধত। মুদির মুখটা হাঁ হয়ে গেল। দুটো চোখ বিস্ফারিত।

কাঁপা গলায় বলল, মুংলা মানে মুংলা মুণ্ডা ? মুংলাকে তো বছর পাঁচেক আগে অমরধাম-এর এক গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

আত্মহত্যা ?

কি জানি, অনেকে বলেছিল, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় ভাইপোরাই নাকি মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

আর দাঁড়াই নি। গিরিডি না পৌঁছানো পর্যন্ত শান্তি নেই। অমরধাম-এর বাসিন্দারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হলেই সর্বনাশ।

বাকিটা শুনলাম গিরিডির স্টেশন মাস্টারের কাছে। ওই বাড়ির অমলবাবু মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করতেন। বছর

ছয়েক আগে তাঁকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে পাওয়া গিয়েছিল। গিরিডি থেকে পুলিসের কর্তা গিয়েছিল, কিন্তু খুনের কোন হদিস হয় নি।

মাথাটা ঘুরে উঠল। তাহলে কলকাতার রাস্তায় অমলের সঙ্গে দেখা, আমাকে মিলনপুরে আসার আমন্ত্রন করা, এ সবের কি ব্যাখ্যা হতে পারে!

আর পুলকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু, এ তো আমার জানাই ছিল। নিজেদের দল বাড়াবার জন্যই কি আমাকে ডেকে আনা হয়েছিল? তাহলে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিল যে!

গলায় পৈতা আছে বলেই কি?

কি জানি, যত ভাবি এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই না।

॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৯২৬ সালে রেঙ্গুনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রবাসে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় তাঁর লেখায় ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার এক বিশেষগুণ। মানুষের প্রতি অপার ভালবাসা অপরিসীম অনুভূতি ও মমতা তাঁকে মনুষ্য চরিত্রের দুর্জ্ঞের রহস্যের অন্বেষণে ব্রতী করেছে। হরিনারায়ণ বাবু রেঙ্গুনে আইনের স্নাতক হওয়ার পরে ভারতে আসেন। বসবাস করেছেন কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে। গল্পের গল্পত্ব তাঁর রচনার এক আকর্ষণ। যদিও মূলতঃ তাঁর রচনা চরিত্র ভিত্তিক তবুও বৈঠকী ধরণের ভঙ্গী তার লেখায় স্পষ্ট। লেখকের প্রথম উপন্যাস ইরাবতী এক অসাধারণ সৃষ্টি। তাঁর লেখায় শরৎচন্দ্রের মতো ব্রহ্মদেশের পটভূমি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। লেখক ১৯৮১ সালে পরলোক গমন করেন।



অশান্ত কবরের বিভীষিকা

বীরু চট্টোপাধ্যায়

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল। স্থান: বার্বাডোজ দ্বীপের একটি কঙ্কাল।

ছয়জন মানুষ মাথা নীচু করে পথ বেয়ে নেমে আসছিল। তাদের মুখাবয়বে ছিল আতঙ্ক এবং বিহ্বলতার সংমিশ্রিত অভিব্যক্তি।

নিচে জমায়েত হওয়া শহরবাসীদের কাছে তারা মুখে বিশেষ কিছু ভাঙল না। তবে কয়েক ঘণ্টা বাদে তাদের তিনজন কাগজে কলমে যে বিবৃতি দিল তা যেমন ভয়াবহ তেমনি বিস্ময়কর। অশান্ত কবরের বিভীষিকা বিশ্বের অনুদ্ঘাটিত রহস্যের শ্রেষ্ঠতম কাহিনী।

আপনি যদি আজ ঐ দ্বীপে যান তো স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন সেই ভয়াবহ এলিয়ট ভল্টটিকে। অইস্টিন উপসাগরের কোল ঘেঁষা সুউচ্চ পর্বত টিলা কুঁদে একে তৈরী করা হয়েছে একদিকে।

ক্যারিবিয়ানের নোনা হাওয়া অধ্যুষিত এই ছোট্ট গীর্জা প্রাঙ্গণে বহু কবর ও ভল্টের মধ্যে রয়েছে উক্ত শয়তানাশ্রিত এলিয়ট ভল্টটি।

আজ আপনি গেলে দেখবেন যে সবগুলির মধ্যে একমাত্র এই ভল্টটিই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রবেশ মুখে কোন দরজা নেই। আপনি যদি কৌতুহলী হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভেতরে উঁকি মারেন তো সেখানে কফিন বা ঐ ধরনের কোন অবশেষ পাবেন না। নজরে পড়বে রাবিশ এবং কিছু আগাছা। এক শতাব্দীরও বেশী সময় এটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কেন? সে বড় ভয়াবহ ঘটনা। এর মধ্যে বুঝি কোন মৃত দেহেরই শান্তি ছিল না। শবের অশান্তির বিবরণ দিতে গেলে বহুকাল আগে থেকে কাহিনী শুরু করতে হয়।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অনারেবল জন এলিয়টের মরদেহ রাখবার জন্যে এই ভল্ট তৈরী হয়। অথচ মজা এই যে উক্ত এলিয়টকে এখানে কি এক অজ্ঞাত কারণে কবর দেওয়া হয়নি। তাই ভল্টটি সুদীর্ঘ তিরাশি বছর ধরে শবশূন্য অবস্থায় পড়েছিল।

চার্চের খাতায় লিপিবদ্ধ দেখা যায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই তারিখে সর্ব প্রথমবারের মত মিসেস টমাসিনা গডার্ডের দেহ সমাধি দেওয়া হয়। বছরখানেক বাদে হাত পাল্টাই হয়ে ভল্টটি চলে যায় 'চেজ' পরিবারের হাতে। ১৮০৮ এর ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মেরি অ্যানা মেরিয়া চেজ নাম্নী ছোট্ট একটি শিশুর কফিন এসে প্রবেশ করে ভল্টে।

১৮১২র ৫ই জুলাই পরিবারের আরেক বয়স্কা কন্যা ডরকাস চেজ এর মৃতদেহ রেখে যাওয়া হয়। এর ঠিক চৌত্রিশ দিন বাদে ৯ই অগস্ট পিতা অনারেবল টমাস চেজ-এর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় ওখানে।

এবারেই ঘটল অঘটন। এই ভদ্রলোকের শোক যাত্রায় শহরের বহু মান্যগণ্য মানুষেরা যোগ দিয়েছিল। তারা সশ্রদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল সামনে কয়েকজন পালোয়ান নিগ্রো ভল্টের মুখের বিপুলকায় ওজনের মার্বেল পাথরের দরজাটি কাঁধে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল।

এর কয়েক মুহূর্ত বাদে দেখা গেল সেই সংস্কারাচ্ছন্ন নিগ্রো জোয়ানেরা 'ওরে বাবারে মারে' চিৎকার করতে করতে উৎরাই পথে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

শোকযাত্রীরা হতচকিত হয়ে ব্যাপারটি দেখতে সিঁড়ি বেয়ে ভল্টের মুখে নেমে এল। তারপর ভেতরে এক নজর চাইতেই ক্রোধে ও আতঙ্কে তারাও চিৎকার করে উঠল।

ভল্টের ভেতর লণ্ড ভণ্ড। কোন এক অদৃশ্য দানবীয় শক্তি যেন সবকিছু লণ্ড ভণ্ড করে গেছে। মিসেস গডার্ড এবং ছোট্ট মেরি চেজ এর কফিন দুটোকে যেন মনে হল কেউ তুলে নিয়ে দেওয়ালেতে ছুড়ে মেরেছে। ছোট কফিনটা মাথা নীচু করে খাড়া অবস্থায় দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া রয়েছে উত্তর পূর্ব কোণে। বড়টিও তদাবস্থায়, তবে এর কয়েক ফুট দূরে। শুধু ডরকাস্ চেজ-এর কফিনটিই যথা পূর্বং আছে, সেটা অস্পৃষ্টই রয়েছে দেখা গেল।

ক্রুদ্ধ আত্মীয় স্বজনদের স্বভাবতই মনে হল এগুলো হল নিগ্রো কবরচোরদের দুষ্কর্ম। কিন্তু এর পর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর দেখা গেল কোন বস্তুই খোয়া যায় নি। অতএব কবর চোরদের কাহিনী মিথ্যা প্রমানিত হল।

বেশ কিছু উত্তেজনা এবং কোলাহলের পর সমাধিকার্য শুরু হল। পুরনো কফিনগুলো যথাযথ সাজিয়ে গুছিয়ে, বিশালকায় পাথরের চাঁইটি দিয়ে দরজা নিশ্চিদ্র ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল।

এরপর চার বছর কেটে গেল। আবার দেখা গেল একটি শোকযাত্রা এগিয়ে আসছে ভল্টের দিকে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর সেটা। এবার শব একটি শিশুর, নাম স্যামুয়েল ব্রুমেস। এবারও দেখা গেল ভেতরটা লণ্ডভণ্ড করা······

এবার ব্যাপারটা চতুর্দিকে হু হু করে রাষ্ট্র হয়ে গেল। 'শব বমি করা কবর'—নাম কুখ্যাত হয়ে গেল উক্ত ভল্টটি। মৃতদের আত্মীয়েরা ফের দোষারোপ করল নিগ্রো শ্রমিক চোরদের। নিগ্রোরা সরবে অস্বীকার করে বললে, এগুলো হল 'জাম্বি' ও 'ডপ্পি'দের কার্য অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের কাজ। বারবাডোজের একমাত্র

আলোচনার বিষয় ছিল এই কবরটির অদ্ভুত কাহিনী পরবর্তী মাস দুই। অতঃপর যখন ১৭ই নভেম্বর শ্যামুয়েল ব্রুষ্টারের মৃতদেহ নিয়ে ভল্টের দিকে শোক যাত্রা এগিয়ে গেল, তখন দেখা গেল সেই মিছিলে শহরের বিরাট এক কৌতুহলী জনতা যোগ দিয়েছে।

পাঁচজন বিশাল জোয়ান নিগ্রো শ্রমিক সামনের পাথরের চাঁইটাকে অতিকষ্টে সরিয়ে দিয়ে দরজা উন্মুক্ত করল। আবার দেখা গেল সেই একই অবস্থা ভেতরের, চূড়ান্ত লণ্ড-ভণ্ড সব।

একটা জিনিস বড় বিচিত্র দেখা গেল। সবচেয়ে পুরনো কফিনটি অর্থাৎ মিসেস গডার্ডয়ের কাঠের কফিনটি সময়ের ভারে খুবই ঝরঝরে হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনে হল সেটার গায়ে কেউ হাত দেয়নি। অক্ষত অবস্থায়ই রয়েছে সে কফিনটি।

এ দ্বীপে নানা পোকার উপদ্রব থাকায়, দ্বীপবাসী মানুষের বেশীর ভাগ কাঠের কফিনের বাইরে একটা দস্তার আবরণ দিয়ে দিত। কাঠের হালকা কফিনটা যথাযথ আছে অথচ দস্তা-ঘেরা ভারী কফিনগুলোকে নিয়ে লোফালুফির মত কাণ্ড কারখানা দেখে দর্শকেরা বিহ্বলতায় প্রায় হতবাক হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ এই ভুতুরে ভল্ট এসে দেখে গেল।

পরবর্তী কয়েকদিনে সারা দ্বীপে এ ব্যাপারে এমনই আলোড়ন দেখা দিল যে শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষকে ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করতে হল।

বার্বাডোজের গভর্নর লর্ড কম্বার মিয়ার একজন জবরদস্ত কঠোর জাতের মানুষ। তিনি সৈনিক, সুতরাং তিনি ছিলেন কুসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী। তিনি শুনলেন সব, দেখলেন সব রিপোর্ট। বহু সাক্ষীর বাচনিক কাহিনী শ্রবণ করলেন। এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন পরবর্তী মৃত্যু আর শোক যাত্রার।

সুযোগ এল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই। সেদিন তিনজন সহকারী-সহ টমাসিনা ক্লার্ক নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের মৃত-দেহের পেছনে পেছনে গভর্নর সাহেব সেই গীর্জা প্রাঙ্গনস্থ এলিয়ট ভল্টের দিকে এগোলেন।

চতুর্থ বারের মত ভল্টের ভেতরে সাংঘাতিক লণ্ডভণ্ড অবস্থা পরিদৃষ্ট হলো। পুনরায় দেখা গেল কোন অজ্ঞাত ও অদৃশ্য শক্তি তার তুমুল কাজ করে গেছে ......

দর্শকগণ ভয়ে পিছিয়েগেল। সহসা চতুর্দিকে নেমে এল সাময়িক নীরবতা। কারুর মুখ থেকে একটাও বাক্য উচ্চারিত হল না। প্রত্যেকে বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু লৌহ মানব গভর্নর এত সহজে কাবু হন না। এক কালে ওয়েলিংটনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রণক্ষেত্রে লড়েছেন। অতএব ভয় কাকে বলে তিনি জানেন না। গট-গটিয়ে তিনি নেমে গেলেন ভল্টের অভ্যন্তরের আধা আলোতে। হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে তিনি একটা লণ্ঠন আনবার আদেশ দিলেন।

এবারে অপর লোকজনও সাহস পেয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। লণ্ঠনের কম্পিত আলোকে তারা ভল্টের মেঝে দেওয়াল ছাদের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখলেন, না কোন গুপ্ত পথ, দরজা, ফাঁক এমন কি কি ফাটলের চিহ্ন মাত্রও কোথাও নেই।

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে সুগভীর ভাবে গভর্নর কম্বার মিয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। ভল্টের মধ্যে যখন কফিনগুলোকে ফের সাজিয়ে রাখা হচ্ছিল সে সময় তিনি প্রখর রৌদ্রলোকে গভীর চিন্তিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

তাঁর সৈনিক-মন কিছুতেই ভাবতে পারছিল না যে এর পেছনে কোন চোরা-কৌশল নেই। ঠিক আছে। এমন ব্যবস্থা করব যাতে বাতাস পর্যন্ত ভল্টের ভেতরে না ঢুকতে পারে।

শোকযাত্রী এবং কৌতুহলী জনতা চলে যাবার পর তিনি বিশ্বাসী কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে যন্ত্রপাতি ও মালমশলা আনবার অর্ডার দিলেন। মিসেস গডার্ডের কফিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল সেটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পেছনের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা হল।

ভল্টের মেঝেতে সূক্ষ্ম বালি এনে ছড়িয়ে দেওয়া হল, যাতে এতটুকু গতিবিধি হলে আঁচড়ের দাগ পড়ে যায়। মার্বেল পাথরের বিশাল দরজা কুলিদের দিয়ে স্বস্থানে এনে সিমেন্ট দিয়ে নিশ্ছিদ্রভাবে গেঁথে দেওয়া হল।

এলিয়ট ভল্‌ট এইভাবে পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল। সিমেন্ট শুকোবার আগে গভর্নর তাঁর নক্সাকৃত আংটি দিয়ে তাতে বহু শীলমোহর করলেন। সঙ্গের অন্যান্যেরাও নিজ নিজ ইচ্ছামত তাতে দাগ কাটলেন।

অতঃপর তাঁরা উৎরাই পথে নিশ্চিন্ত মনে শহরে ফিরলেন। যাক, এবার আর কোন মানবীয় শক্তির কাজ নয় ভলটের মধ্যে গিয়ে শয়তানি করার। ছয়টি কফিন এবার শান্তিতে থাকবে, অক্ষত থাকবে।

এ ব্যাপারে নিগ্রো অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক দেখা দিল। আর ইওরোপীদের জনগণের মধ্যে 'এবার ভল্‌টে কি দেখা যাবে, গোছের কৌতূহলী প্রশ্নের আলাপ আলোচনা চলতে লাগল।

টরাসিয়া ক্লার্ক-এর সমাধির ঠিক নয় মাস বাদে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল গভর্নর লর্ড কম্বার মিয়ার একদা উক্ত গীর্জার পার্শ্ববর্তী এলড্রিজ প্লান্টেসনের অতিথি হয়ে তথায় গমন করেন। ওখানকার বাংলোর বারান্দায় মালিক স্যার রবার্ট ও অপরাপর অতিথিসহ গভর্নর বসে ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এক সময় আলোচনা কেন্দ্রীভূত হল ঐ ভূতুড়ে ভল্টের ব্যাপারে।

স্বপক্ষে-বিপক্ষে বহু আলোচনার পর গভর্নর এক সময় গরম হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বেশ, এবারে না হয় আমরা নিজেরা গিয়েই চক্ষু কর্ণের বিবাধ ভঞ্জন করি। চলুন এলিয়ট ভল্ট আজই খুলে দেখা যাক।

আটজন নিগ্রো শ্রমিক নিয়ে ওরা সবাই গিয়ে ভল্টের সামনে উপস্থিত হলেন। বাইরে থেকে ভল্টের কোন পরিবর্তন হয়নি দেখা গেল। গীর্জার রেক্টর রেভারেণ্ড টমসন অণ্ডারসনকে ডেকে আনা হল। তখন সেখানে ছয়জন অতিবিশিষ্ট মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত রইলেন।

গতবছর ১৭ই জুলাই যেমন সিমেন্ট দিয়ে ভল্ট বন্ধ করে যাওয়া হয়েছিল, ঠিক তাই আছে অক্ষত শীল মোহর। ব্যক্তিগত ছাপগুলিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

গভর্ণর নিগ্রোদের প্রস্তর দরজা সরিয়ে ভল্ট উন্মোচিত করতে আদেশ দিলেন। আটজন নিগ্রো খুব ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল। বহু আঘাতের পর সিমেন্ট তোলা গেল। কিন্তু প্রস্তরের চাঁই বহু চেষ্টা করেও এক ইঞ্চি নড়ানো গেল না। নিগ্রোদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়তে দেখে গভর্ণর তাদের কঠোর শাস্তির ভয় দেখালেন। প্রায় প্রাণভয়ে ভীত কালো মানুষগুলি প্রাণান্তকর পরিশ্রমে বেঘৎখানেক ফাঁক করতে সমর্থ হল প্রস্তরের চাঁইটাকে। এবার বোঝা গেল কেন চাঁইটাকে সরাতে এত পরিশ্রম লেগেছে। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল একটা বিরাট ওজনের দস্তায় আবৃত কফিনের মাথা নিচের দিকে এই চাঁইটির গায়ে ঠেসান দেওয়া রয়েছে।

প্রস্তরটাকে আরেকটুকু ফাঁক করা হল। গভর্নর হাতে লণ্ঠন নিয়ে ভল্টের ভেতরে এক পা প্রবেশ করলেন, পেছনে তাঁর ভি, আই, পি, পাঁচজন মানুষ। প্রত্যেকেই বিস্মিত, বিহ্বল, বিস্ফারিত চক্ষু। একমাত্র, দড়ি বাঁধা ভগ্নস্তূপ প্রায় মিসেস গডার্ডের কাঠের কফিনটা যেমন রাখা হয়েছিল ঠিক হুবহু তেমনি আছে। বাদবাকি আর সব কফিন লণ্ডভণ্ড হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে অদ্ভুত ভাবে। লণ্ঠন নামালেন গভর্নর। দেখা গেল মেঝেতে ছড়ানো বালি যেমনকে তেমন আছে এতটুকু আঁচড়ের দাগও কোথাও নেই।

অ্যা—? তাহলে? এ দৃশ্যটিই বুঝি যথেষ্ট। গভর্নর ফিরলেন, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ঠোঁটে কোন রা নেই।

এর কিছুক্ষণ বাদে তিনি লিখিত আদেশ দিলেন, কফিনগুলো অন্যত্র সমাহিত করে এই শয়তানের আবাস এলিয়ট ভল্টকে চিরতরে বন্ধ করে দেবার।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছিলেন যে সেদিন ভল্ট খোলার পর আমি ভল্টের সমস্ত দেওয়াল, ছাদ, মেঝে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার সঙ্গে একজন রাজমিস্ত্রীকেও নিয়েছিলাম, হাতুড়ি মেরে দেখেছি। কিন্তু কোন ফুটো বা কোন তঞ্চকতার নিদর্শন পাইনি। তাহলে? এটা কে বা কারা করল? না—মানুষ নয়। এত বড় বড় দস্তার কফিন লোফালুফি করার শক্তি আছে একমাত্র

.... । ভূমিকম্প ? এতটা ওলট পালটে যে ভূমিকম্পের দরকার, তাতে সমস্ত দ্বীপটাই ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। একমাত্র জবাব, প্রেতাত্মাদের কর্ম।

এছাড়া আর কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি বিগত প্রায় দেড়শ বছরের মধ্যে।

কে এই কফিনগুলি নিয়ে লোফালুফি করেছে? কেন করেছে? কেনই বা মিসেস গডার্ডের কফিন অস্পৃষ্ট রইল? এর উত্তর নিয়ে মাথা ঘামাবার মুখে নিম্নলিখিত ঘটনাটি স্মরণে রাখলে গবেষকের হয়ত সুবিধে হবে।

এলিয়ট ভল্টে রক্ষিত ছয়টি কফিনের তিনটি হল ভয়ঙ্কর ভাবে মৃত মানুষের শবপূর্ণ। আর টমাস এবং ভরক্যাস দুজনেই আত্মহত্যা করে মরেছিল। পরিশেষেরটি অর্থাৎ স্যামুয়েল ব্রস্টারকে হত্যা করে তাঁর বিদ্রোহী ক্রীতদাসেরা।

অতএব এই অপঘাতে নিহত অশান্ত আত্মাদের দৈত্যপনাতেই বুঝি এলিয়ট ভল্টের মধ্যে আদৌ শান্তি ছিল না ...এছাড়া এ রহস্যের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কোথায়?

॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ গল্প, কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রবন্ধ-অনুবাদ, ছোটদের এবং বড়দের উভয় বিভাগেই লেখনী সচল রয়েছে। রেডিওতে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং অননু-করণীয় বলার ভঙ্গীতে কর্তৃপক্ষ ও শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা পেয়েছেন। বীরুবাবু এককালে সাহিত্যিকদের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে সাবলীল অভিনয়ে সুনাম কিনেছেন। ছোটদের বড়দের প্রত্যেকের জন্য ইতিমধ্যেই প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন—তাছাড়া বীরুবাবু গোয়েন্দা, গুপ্তচর ভৌতিক ও রহস্য রচনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। লেখক ১৯১৭ সালে নোয়াখালি শহরে জন্মগ্রহন করেন।



বুদ্ধির বাইরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব অচল। পাড়াগাঁয়ের ভূতের ভয় থেকে প্লাঁসেৎ মিডিয়ামতত্ত্ব, রাত-বিরেতে সম্ভব অসম্ভব ছায়ামূর্তি দেখে চমকে ওঠা—এসব অনেক কিছুই তর্কের উপাদান জোগায়। ভৌতিক অস্তিত্বও ঈশ্বরের মতই নানা মতবাদে বিড়ম্বিত—সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, স্কেপটিক বা অ্যাগনস্টিক কারুরই অভাব নেই।

সোজা কথায়, যুক্তির জগতে ভূতের জায়গা নেই। ভূত মানতে গেলে চোখ বেঁধে পিছু হটতে হয় একেবারে প্যালিয়োলিথিক আদিম যুগে। অশরীরী তত্ত্বে যারা আস্তিক্যবাদী, তাদের সঙ্গে আজ আর তর্ক চলবে না—চরম নিষ্পত্তির জন্যে হাতাহাতি করতে হবে।

তবু সবকিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তর্কের মধ্যেও একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। এমন কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে—যাদের উত্তর মেলে না। তার মানে এই নয় যে কোনদিন তাদের উত্তর একেবারেই পাওয়া যাবে না। হয়তো বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি একদা সবকিছুর বিশেষ সমাধান করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ তা হচ্ছে, ততক্ষণ কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা আমাদের মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করতে থাকে।

এই রকম একটি ঘটনা এখানে আমি বলব। এটা ভূতের গল্প কিনা জানি না। চোখ কিম্বা মনের ভুল কিনা, সে সম্বন্ধেও কোন রায় দিতে আমি প্রস্তুত নই। শুধু যা ঘটেছে, সেইটুকুই আমি বলব। যাঁর যা খুশি, তিনি সেই ভাবেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। মাত্র একটি কথা জানিয়ে রাখি—এগুলি সম্পূর্ণ খোলা এবং অপ্রস্তুত চোখের সামনে—গঞ্জিকা বা মনের কোন প্রভাব এসব ক্ষেত্রে ছিল না।

প্রায় বারো-তেরো বছর আগেকার কথা। তখন পশ্চিম বাংলার একটা ছোট গ্রাম থেকে আমি শহরে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতুম। সাইকেলে করে আসতে হত আট মাইল দূরের স্টেশনে। একটা ছোট দোকানে সাইকেল জমা রেখে আমরা ট্রেন ধরতুম, সন্ধ্যের গাড়িতে ফিরে আবার সাইকেল নিয়ে গ্রামে চলে আসতুম।

'আমরা' বললুম এই জন্যে যে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতুম দুজনে! আমি আর প্রিয়নাথ। মুনসেফ্ কোর্টে চাকরি সেরে পাঁচটা নাগাদ প্রিয়নাথের সাইকেল রিপেয়ারিং-শপে এসে আমি আড্ডা দিতুম, চা খেতুম। তারপর সাতটায় দোকান বন্ধ করে সাতটা বাইশের ট্রেন ধরতুম দুজনে। কোন একজনের বাড়ি ফেরবার খুব বেশি তাগিদ না থাকলে এই ছিল আমাদের দৈনন্দিন প্রোগ্রাম।

স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামের প্রায় সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল একটা অনুর্বর কাঁকর মাটির মাঠ—যাকে বলে ব্রহ্মডাঙা। জেলা-বোর্ডের রাস্তাটা ঢেউ খেলানো মাঠের ভেতর দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ে চলে গেছে—কোথাও কোথাও কুড়ি-বাইশ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠেছে দু-ধারের ঢাল জমি ছাড়িয়ে। পথের পাশে দেড় মাইল দু-মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নেই; শুধু এলোমেলো ফণী মনসা আর আকন্দের ঝোপ ছড়িয়ে আছে।

এককালে মাঠটা ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত ছিল। পাঁচশো বছরের ভেতরে ওসব উপদ্রব আর শোনা যায় নি। কিন্তু তবুও একা এ-পথে ফিরতে সন্ধ্যের পরে গা ছমছম করত। দু-একটা ভূতের কাহিনীও যে মাঝে মাঝে কানে আসত না এমন নয়। কিন্তু ও-ভয়টা কোনদিন আমাদের মনে যে এতটুকু ছাপ ফেলেছে, তা নয়। অন্তত সচেতন ভাবে তো নয়ই।

সেদিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে কতকগুলো সরকারী কাজ সেরে নিতে আমার রাত হয়ে গেল। প্রিয়নাথের দোকানে আসতেই তার ছোকরা চাকরটা জানালে যে আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে যথানিয়মে সাতটা বাইশের ট্রেনই ধরেছে প্রিয়নাথ।

আমার মনটা দমে গেল। শুধু একা ফিরতে হবে বলেই নয়, দিনটাও দুর্যোগের। একটু আগেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে—সেই সঙ্গে আকাশ-চেরা বাজের ডাক। বৃষ্টিটা আপাতত থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনো ঘন-মেঘে একটা আলকাতরার আস্তরন দিয়ে মোড়া। যে কোন সময় ঝমঝম করে নেমে পড়তে পারে। এরই মধ্যে রাত ন'টার পরে ওই সীমাহীন কালো মাঠটার ভেতর দিয়ে একা আট মাইল সাইকেলে করে আমার ফিরতে হবে। কারণ, সন্ধ্যের পরে স্বভাবতঃই নির্জন পথটাতে এই বৃষ্টি-বাদলের রাতে যে কোন সহযাত্রী মিলবে, এ আশা করাই বিড়ম্বনা।

কিন্তু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। ঘন কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম, তারপর স্টেশনে এসে আটটা আটাশের গাড়ি ধরলুম।

ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই বৃষ্টি নামল। এমন প্রবল বৃষ্টি সচরাচর দেখা যায় না। সারা আকাশটা যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে—অন্ধকার সাদা হয়ে গেছে বৃষ্টির কুয়াশায়। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাটা আরো থিতিয়ে বসতে লাগল। উঁচু কাঁকরের রাস্তায় জল দাঁড়াবে না, কিন্তু মাঠের ভেতরে বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া মিশলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়।

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। আধঘণ্টার মধ্যে আমি স্টেশনে এসে নামতেই দেখি বৃষ্টিও ধরে গেছে। মেঘ হালকা হয়ে গেছে, শুধু অল্প অল্প ইলশেগুঁড়ি পড়ছে তিরতির করে।

যে মুদিখানায় সাইকেল জমা থাকে, সে লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করবার উপক্রম করছিল। আমাকে দেখে হাই তুললে। হেসে বললে, 'এই রাতে ফিরবেন? থেকে যান না আমার দোকানে।

বললুম 'সে হয় না, বাড়িতে সবাই দুশ্চিন্তা করবে। আর একটা কথা অবশ্য বলা গেল না—সে তাগিদটাই প্রবলতর। অর্থাৎ মাস-খানেক আমি বিয়ে করেছি এবং মাত্র তিনদিন আগে স্ত্রী এসেছে বাপের বাড়ি থেকে।

দোকনদার সাইকেলটা বের করে দিলে। জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রিয়নাথ চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, উনি তো সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িতেই নামলেন। তখন ভেঙে বৃষ্টি আসছিল, বাজ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। ওঁকেও দাঁড়িয়ে যেতে বলেছিলুম, রাজী হলেন না। বললেন, বোঁ বোঁ করে চলে যাবেন।

বোঁ বোঁ করে চলে যাব—আমিও ভাবলুম। তারপর সেই ঘন কালো অন্ধকারে তিরতিরে বৃষ্টির ভেতরেই সাইকেল নিয়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই মাঠের রাস্তা এসে পড়ল। দু-ধারের নিবিড় কৃষ্ণতার ভেতরে ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝিঁর আওয়াজ আর ছোট-বড় নালার বর্ষার জলের কলধ্বনি। ল্যাম্পের ছোট আলোটিতে সামনের পাঁচ-সাত হাত দূর পর্যন্ত বাঁকুড়ার রাঙামাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না! কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটুকুও আর রইল না

ল্যাম্পে তেল ছিল না—খেয়াল করি নি। ক্ষীণ হতে হতে দপ করে নিভে গেল সেটা।

এইবার আমার ভয় করতে লাগল। চেনা রাস্তা—যতই অন্ধকার থাক, ঠিক নির্ভুল ভাবেই চলে যাব। তবু—তবু এই অন্ধকার, এই নির্জনতা। একবার যদি অসাবধান হই, তাহলে সাইকেল নিয়ে একেবারে দশ-বারো হাত নিচে গড়িয়ে পড়ব।

দু-চোখকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে আমি সাইকেল চালাতে লাগলুম। তাড়াতাড়ি যেতে সাহস হচ্ছে না, তবু উত্তেজনায় আপনা থেকেই দ্রুতবেগে পা ঘুরছিল প্যাডেলে ; সেকেলে বি-এস-এ বাইক—আমার মনের শাসন না মেনেই সে যেন শোঁ শোঁ করে উড়ে চলল।

থামো হে সেন, থামো !'

অন্ধকার ছিঁড়ে যেন তীরের মত স্বর উঠল একটা। প্যাডেলে আচমকা পা থেমে এল আমার। পেছন থেকে পরিষ্কার গলায় ডাকল প্রিয়নাথ : 'অত তাড়া কিসের হে? আমি যে সেই এক ঘণ্টা ধরে মাঠের ভেতরে তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি।'

বিস্ময় এবং আনন্দে আমি সাইকেল থেকে নেমে এলুম। অন্ধকারেও দেখা গেল, পেছন থেকে প্রিয়নাথ দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

'ব্যাপার কি হে ? সেই সাতটা পঞ্চান্নর ট্রেন নেমে এতক্ষণ মাঠের ভেতরে কী করছিলে ?'

প্রিয়নাথ বললে, সে অনেক কথা। ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে একটা।'

'এই বর্ষার রাতে মাঠের ভেতরে কী এমন মজার ব্যাপার হতে পারে ? আর তোমার সাইকেলই বা গেল কোথায় ?'

অন্ধকারে প্রিয়নাথ একবার অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'বলছি তো, সে অনেক কথা। গ্রামে ফিরে শুনবে। আপাততঃ তোমার ক্যারিয়ারে আমায় তুলে নাও।

'বেশ, উঠে পড় চটপট।'

প্রিয়নাথ কাছে এল: দেখেছ কাণ্ড! জল-কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছি। হাড়ের ভেতরটা শুদ্ধ কাঁপছে ঠকঠক করে।'

'পড়ে গিয়েছিলে নাকি?'

হুঁ, সে আর বল কেন! আছাড় বলে আছাড়। একেবারে অতল জলের ভেতর। কাদার মধ্যে প্রায় বসে গিয়েছিলুম। যাক বাড়ি ফিরেই শুনবে সেসব কথা।'

আমি সাইকেলের প্যাডেল ঘোরালুম। তড়াক করে প্রিয়নাথ পেছনে উঠে বসল। একটা ঝাঁকুনি লাগল, টের পেলুম, সীটের আংটাটা প্রিয়নাথ আঁকড়ে রয়েছে।

এই ভিজে রাস্তায়, এমন অন্ধকারে আরেকটা মানুষকে ক্যারিয়ারে তুলে নেওয়া যে কী দুর্ভোগ, সে বলে বোঝাতে হবে না। কিন্তু অনুভব করলুম, হঠাৎ যেন আমার গায়ে দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেছে। প্রিয়নাথের অতখানি ওজন আমাকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারল না। সেকেলে মজবুত বি-এস-এ সাইকেল শনশন করে চলতে লাগল। এমন, কি, অন্ধকারের সম্ভাব্য বিপদটাও যেন কখন নিঃশেষে মুছে গেল মন থেকে।

প্রিয়নাথ কোন কথা বলছে না—আমিও না। নিঃশব্দে প্রায় পনেরো মিনিট চলবার পর হঠাৎ দূর থেকে জলের একটা উগ্র গর্জন শোনা গেল। আমি চমকে বললুম, 'ওকি—খোয়াইতে বান এল নাকি?'

এইবার বিচিত্র ব্যাপার ঘটল একটা। প্রিয়নাথ আমার কথার জবাব দিলে। কিন্তু পেছনের ক্যারিয়ার থেকে নয়! পরম বিস্ময়ে দেখলুম, আমার সাইকেল থেকে প্রায় পনেরো হাত সম্মুখে দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়নাথ। হ্যাঁ, অন্ধকারেও দেখতে পেলুম, প্রিয়নাথই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়নাথ ডেকে বললে, 'নামো সেন নামো। বানের জলে খোয়াইয়ের পচা কাঠের পুলটা ভেসে গেছে। আর এগোলে খাড়া ত্রিশ হাত নিচে আছড়ে পড়বে।'

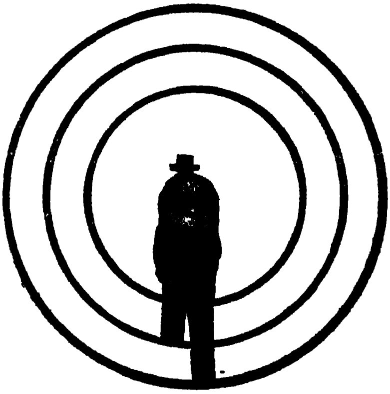
মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরে আমার বিদ্যুৎ বয়ে গেল। কখন

ক্যারিয়ার থেকে নামল প্রিয়নাথ, কখনই বা এমন করে পনেরো হাত দৌড়ে গেল সে? সাইকেলের গতি মন্দা করতে করতে আবার শুনলাম: এখনো নামো সেন, এখনো নামো! নইলে আমার যা হয়েছে, সে দশা তোমারও হবে।'

ক' সেকেণ্ডের মধ্যে সবটা ঘটল জানি না! দেখলুম, প্রিয়নাথের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপর যেন করোটির কোটর ছেড়ে সে দুটো চোখ দুটো তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আলোর মত উড়ে আসতে লাগল আমার দিকে। যেন ফসফরাসের দুটো অতিকায় পতঙ্গ।

পরদিন সকালে আমাকে পাওয়া গেল রাস্তার ওপরে সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে আমি পড়ে ছিলুম। আর প্রিয়নাথকে পাওয়া গেল ভাঙা পুল থেকে তেইশ-চব্বিশ হাত নীচে, আরো তিন-চার ফুট জলকাদার তলায়। ওপর দিকে পা দুটো তুলে তাঁর পেট পর্যন্ত প্রায় কাদার মধ্যে গাঁথা। ভাঙা সাইকেলটা খানিক দূরে একখানা বড় পাথরের ওপরে ঝুলে রয়েছে।

॥ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়** ॥ লালমাটি, শিলালিপি, উপনিবেশ, স্বর্ণসীতা, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, অমবশ্যার গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনি সৃষ্টি করেছেন। সমকালীন সাহিত্যে বুদ্ধির দীপ্তি, ভাষার প্রাঞ্জল্য ও বৈদগ্ধের অভিভাব তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নারায়ণ বাবুর লেখায় বারেন্দ্রভূমের বিশেষত দিনাজপুরের ভৌগলিক দৃশ্যপট অনিবার্য ভাবেই উপস্থিত। তবে নদীমাতৃক দক্ষিনের পলিসঞ্চিত উপনিবেশের চিত্রন মাধুর্য্যও তাঁর অনেক লেখায় সমুপস্থিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৭১ সালে পরলোক গমন করেন।



গহন রাত্রে

বাণী রায়

"রাত্রি ছাড়া তোমার আসা হয়না, না ?"

স্বাহা পল্লবকে তিরস্কার কবলেন, "দেখছনা, আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি আসছে। চতুর্দ্দিকে ঘনঘোর অন্ধকার। এখন লোকে রাস্তায় বার হয় কি ? রাত্রি দশটা বেজে গেছে।"

ডক্টর পল্লব সাহা ঘরে ঢুকল, হাতে বর্ষাতি, মাথায় ওয়াটারপ্রূফ, ক্যাপ খুলে হ্যাটষ্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে বলে উঠল, "বৃষ্টি আসছে না, এসেছে। টিপ টিপ ঝরছে বাইরে।"

"এলে কেন ?"

কোনের সোফায় জুতোমোজা শুদ্ধ পা ঝুলিয়ে বসে পা টান করে আরামে শব্দ করে উঠল পল্লব—"আঃ, কি আরাম! সারাদিন বড় খাটুনি গেছে। আজ হাসপাতালে আউটডোরে যেন পৃথিবীর যত রোগী এসে ভীড় করেছিল। বাবাঃ বাবাঃ। অতঃপর চেম্বারে বসলাম। শেষ রোগীটাকে বিদায় দিয়ে এলাম। কফি আনো। বড় ক্লান্ত আমি।"

"এত ক্লান্তির মধ্যে ট্রাম থেকে নেমে এতটা হেঁটে না এলেই হ'ত।"

"শ্রীমুখচন্দ্রদর্শন করা যেতনা তবে। আবার গোটা একদিন বাদে সন্ধ্যা বা রাত্রি আসবে।"

স্বাহার মুখ প্রেমিকের প্রেমের পরিচয়ে উজ্জ্বল, কিন্তু বাইরে যে পরিহাস করে, "ওহো মরে যাই, মরে যাই! এতই যদি টান তবে যুদ্ধে কেন যান?" "বাঃ কবিতা লিখে ফেললে যে, স্বাহা," পল্লব বলল।

স্বাহার অন্দরে গিয়ে আদেশদানের পূর্ব্বেই স্বাহার ছোট বোন স্বধা উপস্থিত ট্রেভরে কফি ও পাকোড়া হাতে। ঠিক করে ট্রে নামিয়ে গানের সুরে বলে সে:

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা
পল্লবে তবুরে বিজুরির ছটা—

ও পল্লবদা, ডাক্তার দাদা, "আর কতদিন থাকব বসে, দুয়ার খুলে বন্ধু আমার?"

"কি ছ্যাবলেমি করিস যে, স্বধা! সাহা মহাশয় স্বাহাকে ছেড়ে যুদ্ধের ডাক্তার হয়ে যাচ্ছেন, জানিস তো? এখন এসব কথা কেন?"

বোনের হাতের ট্রেথেকে সযত্নে কফির কাপ তুলে পল্লবের হাতে দিয়ে, পাকোড়া এগিয়ে স্বাহা বিরক্তি প্রকাশ করে।

"আরে, এখনি তো ঠাট্টা করে নেব। শৈলাবাসে সৈন্যের ছাউনির সঙ্গে ডাক্তার ভ্যানে করে ঘুরতে ঘুরতে এইসব কথা মনে পড়ে গেলে চটাস্‌করে চলে আসবেন।"

স্বাহা হাতের ঝিরঝিরে চুড়িগুলো গুঁজে, ডালিমফুলী আঁচল উড়িয়ে বলে, "চটাস করে তো চড় মারে, চট্ করে আসবেন বল্‌তে চটাস্ বলছিল? এবার বি, এ, পরীক্ষায় বঙ্গভাষায় কূপোকাৎ হ'তে হবে দেখছি।"

"কার সাধ্য 'স্বধা' নামের মেয়েকে কূপোকাৎ করে ফেলে? দেবতার আহ্বান মন্ত্র, আহুতি দেবার মন্ত্রে নাম রেখে ঠাকুরদা যে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন পাব্‌লিককে। তোমার নামটির অবশ্য অন্য মানেও

আছে, অগ্নির স্ত্রী তুমি। কিন্তু পল্লবদা, আপনার নামটি আমাদের ইউনিটে অ-চ-ল, অ-ধ-ম। শুধু রবিঠাকুরের গানে শুনি আদর—

'পল্লবে পল্লবে, হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে'—"

"আঃ, স্বধা, বিরক্ত করছিস কেন? দেখছিস না কত ক্লান্ত হয়ে এসেছে ও?"

দিদির তিরস্কারে কর্ণপাত করলে স্বধার চলেনা। সাহার উল্টো সে। ঝর্ণার মত কোলাহলময় গতি তার। দিদির পাশে ধপ করে বসে সে বলল, "এত রাত্রে, নিষ্প্রদীপ রাত্রে কেউ আসে? পড়ার ঘরের জানালায় বসে বসে পরীক্ষার পড়া পড়তে পড়তে চমকে উঠেছি দেখে, 'ওমা, এ কে? মাথাখাকী-টুপী-ঢাকা ভূতের মত কে? বোধহয় ভূত।' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাব, হঠাৎ দেখা গেল পল্লবিত একটি মানুষ। বাবাঃ, কি ভয়না আমি পেয়েছিলাম গো!"

স্বধার জামাকাপড় এলোমোলো, বুকের জামায় পেন্ গোঁজা। বোধহয় কাজ করতে করতে আসন্ন পরীক্ষার্থিনী উ'ঠে এসেছে। স্বাহার মত ফিট্‌ফাট্ পরিচ্ছন্ন নয় ছোট বোনটি। চোখে মুখে হাসি, গলায় গান লেগেই আছে।

পল্লব সহাস্যে প্রশ্ন করল, "ভূতের ভয় আছে নাকি তোমার?"

"খু-উ-ব।" স্বধা মাথা ঝাঁকায়, "নেই আবার? ছাদে একা যেতে পারি না দুপুর বেলা।"

"আর রাত্রে"? কফির কাপ নামিয়ে রেখে পাকোড়া খেতে খেতে পল্লব জিজ্ঞাসা করল।

"ওমা, মা। রাত্রের কথা বলবেন না। অন্ধকার হলেই রাজ্যের ভয় চাপে আমার ঘাড়ে। আমাদের গোষ্টের মা বলেনা?

"যেহানে যতো ভূত পেরত্, দিদিমণি, এই আত হলেই আমার ঘাড়ে চাপে। ব্রেহ্মদত্যি, শাঁকচুন্নী, মামদো, ডাকিনী, কি না দিদিমণি। আমারে আতে বাড়ীর বা'র পেঠাবেন না।" পুরাতন ঝি গোষ্ঠের মায়ের-নকল দিয়ে স্বধা গড়িয়ে পড়ল হেসে।

"চুপ চুপ, ওপরে বাবা তোর হাসি শুনে, শাঁকচুন্নী ভেবে নেমে আসবেন, বুঝলি। তোর নাম স্বধা না হয়ে 'শ্ব' হওয়া উচিত ছিল, যেরকম কুকুরের মত হাসছিস গভীর রাত্রে গলা ছেড়ে।"

দিদির কথায় স্বধা বক্রস্বরে বলে, "রাত এখনি বেশী? আগে কলকাতায় এ রাতকে বলত, 'night is young yet."

দুই বোনের মধ্যস্থতা করে পল্লব কফি পাকোড়া শেষ করার পরে, "কথা নিয়ে দুই পণ্ডিতানীর বাচ্‌কচানি মূর্খ ডাক্তার বুঝতে পারছে না। স্বাহার নামের সঙ্গে আমার সাহা পদবীটুকু একই রকম এটুকু বুঝি, শুধু 'ব' ফলাটা বাদ।" "স্বাহা সাহা, আহা, আহা!" হাততালি দেয় স্বধা। 'চুপ, অসভ্য মেয়ে।' স্বাহার লাবণ্যময় মুখশ্রী আরক্তিম। "কেন বালা ব্রীড়ানতা? শুধু অনুষ্ঠানটুকু বাকী। নইলে কি আর পড়া ফেলে,"দিদির ভাষায়, গভীর রাত্রে নেমে আসি বৈঠকখানায় পরপুরুষের সঙ্গে আড্ডা দিতে? এটা যে জামাইবাবু।"

পল্লব বলল, "ঠিক বলেছ। আমি লজ্জা পাচ্ছিনা, কিন্তু তোমার দিদি লজ্জাশীলা' কিনা। তা আমাকে ভূত বলে ভেবে আঁৎকে উঠে ভাগ্যিস চেঁচাওনি। তোমার দিদি তাহলে তো ভূত ভেবে আমাকে ঘরে ঢুকতে দিত না, তাড়িয়েই দিত।"

"ও পল্লবদা, এখনও জানেন না দিদি যে ভূত মানেনা। ওর মতে এসব আমাদের মনের কুসংস্কার। ভূত বলে কিছু নেই।"

"যদি তুমি নিজের চোখে ভূত দেখ, স্বাহা? তাহলে বিশ্বাস করবে?"

পল্লবের কথায় স্বাহা বলে উঠল, "তুমি দেখেছ?"

"না, তবে দেখবার ইচ্ছা আছে।"

"সে তো আমারও আছে।" স্বাহা বলে।

টক্‌টক্ করে পেণ্ডুলামের ঘড়ির মত দু'জনের কথার মাঝখানে স্বধা।

"দেখলে তবে বিশ্বাস করবে?"

"কেউ তো দেখেনি।"

"কেউ দেখেনি মোটেই নয়, দিদি। বলুন না পল্লবদা, কেউ

দেখেনি কথাটা কি ঠিক ? কত লোক, বড়লোক, গরীব লোক, রাজা বাদশা থেকে কয়লা-খাদের কামিন পর্য্যন্ত ভূত দেখেছে। মাঠে-ঘাটে, হানাবাড়ীতে, রাজপ্রাসাদে এরা সকলে নানা সময়ে নানা ভাবে দেখেছে।"

স্বধার কথায় স্বাহা বিদ্রুপহাস্যে বলে "যেমন গোষ্ঠের মা।" হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করে স্বধা "মোটেই না। ইচ্ছা করলে যে অশরীরি আত্মা দেখা দিতে পারে নিজের আগের মূর্ত্তিতে, এ কথা কত বইতে লেখা আছে। পল্লবদা, দিদিকে একবার ভূত দেখিয়ে দিন, তবে ও বিশ্বাস করবে।"

পল্লব হাসিমুখে বলল, "আমি যেদিন অতীত বা ভূত হয়ে যাব, সেই দিনই ও দেখতে পাবে ভূত।" স্বাহা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "কিযে বল ?" তুমি ভূত হয়ে ভূত দেখালে আমি কোথায় থাকব ?

"থাকবে নিজের কাজ নিয়ে, এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছ তুমি। কাজই যথেষ্ট।"

"থাকগে এ কথা, পল্লবদা। কিন্তু আজ যেন ভূত দেখারি রাত। অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। এই রাত্তির ম্যাকবেথের তিন ডাইনী বা'র হ'বার রাত্রি। সেই যে ওরা গান গাইছিল,

"Fair is foul and foul is fair
Hover through the fog and filthy air"

"স্বধা, তুমি পরীক্ষায় সেক্স্পীয়রের ম্যাকবেথের উপর, পুরো নাম্বার পাবে। কিন্তু দয়া করে এই উৎকট আলোচনা থেকে বিরত হও।"

স্বাহার গাম্ভীর্য্য ও বিরক্তি দেখে স্বধা আর কথা বলতে সাহস পেল না। ট্রেখানা তুলে নিয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি। রাত্রি এগারোটা বাজে প্রায়। বাকী রাতটুকু গল্প করে কাটান আপনারা। আমিও লেখা পড়া নিয়ে আবার বসি।"

"তোমাদের খাওয়া হয়নি ?"

"আপনার প্রতীক্ষায় দিদি বসে ছিল। দেখা না হলে খায় কেমন করে ?" বেণী দুলিয়ে স্বধা ছুটে চলে গেল।

"বড় দুষ্টু হয়ে গেছে মেয়েটা।" স্বাহা বলল।

"এখন আমরা যদি এত দীর্ঘ সময় পূর্ব্বরাগের পালা শেষ না করি, ও বেচারী ঠাট্টা করে বাঁচবে না, বলো, স্বাহা?"

স্বাহা আস্তে উত্তর দিল, "কিন্তু আমিতো পালা গুটিয়ে তুলতে চাইছি। তোমারি আরও সময় দরকার।"

পল্লব স্বাহার পাশে এসে বসল। এতক্ষণে আলোর নীচে স্পষ্ট দেখা গেল তাকে। দীর্ঘ দেহ অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন শ্যামবর্ণের অতি সুশ্রী তরুণ। স্বাহার উজ্বল গৌরবর্ণ, অতি সুন্দর ফীচার তার নেই, কিন্তু গভীর-দৃষ্টি চোখ দুটি বিদ্যুতের মত উজ্বল।

স্বাহার পিঠে হাতের বেড় দিয়ে অতি মোলায়েম অনুরাগভরা কণ্ঠে পল্লব বলল, "তুমি তো জান স্বাহা, আমি আজ সম্ভব হলে আজই তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই। কিন্তু একখানা গাড়ি করতে পারিনি, ডাক্তারের যা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ফ্ল্যাটটা ভালো ফার্নিচারে সাজাতে পারিনি। লক্ষ্মীর আসন পাতব কোথায়? এভাবে তোমাকে যা প্রয়োজন দিতে যদি না পারি, কিসের সংসার? তাই একবার যেতে দাও, ক'দিনের ছুটী দাও, স্বাহা। প্রচুর টাকা, অভিজ্ঞতার মূল্যও পাব। এটুকু কষ্ট না করলে চলে না। যে কটা দিন দরকার তার বেশী একদিনও থাকবনা, কথা দিচ্ছি।"

স্বাহা নিরুত্তরে বসে রইল।

দুইহাতে সেই সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে পল্লব অজস্র চুম্বনে পরিপ্লাবিত করে দিল। আকাশ ভর্ত্তি মেঘে একবার দুবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। গহন রাত্রি।

দুই

আবার অন্ধকার রাত্রি এসেছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি না এলেও বাতাসে ঝোড়ো বেগ। বসবার ঘরের জানালায় আজও স্বাহা প্রতীক্ষায়। জানালার পাশে প্রতিবেশীর একটুকরো জমি। সেখানে নীপশাখায় বহু ফুল।

'নীপ' কথাটার ব্যাখা করা বোধহয় দরকার। বর্ত্তমানের সাহিত্য 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' প্যাটার্ণে ঢেলে নাকি গাঁথতে হয়, নচেৎ পাঠক পাঠিকা বিরক্ত হন, পড়তে বা বুঝতে তাঁদের কষ্ট হয়। সাহিত্যে যে কিছু লেখাপড়ার প্রয়োজন থাকে, একথা তাঁরা ভুলেই যান। তাই বলি, কদমগাছে কদম ফুটেছে, আকাশে মেঘ করেছে। ব্যাস্।

স্বাহার সন্ধানী দৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হলনা সেই দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখা দিল অন্ধকার রাত্রে। পোষাক ডাক্তারের মত, হাতে অ্যাটাশে।

"এসেছো?"

"ভাবলাম আজ বোধ হয় পারলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ, না?"

পল্লব সোফায় বসল।

পা দুটি প্রসারিত করে পূর্ব্বদিকের মত সে স্বস্তি ও আরামের শব্দ করল, "আঃ।"

স্বাহা ততক্ষণে অন্দর থেকে কফি, কেক এনে রেখেছে। "এত কেক-পেস্ট্রি? এতো নিউ মার্কেটের কেক দেখছি।"

"দাদা এনেছেন। তুমি চলে যাবে। যাবার আগে অবশ্য খাওয়ানো হবে।"

স্বধা আজ বন্ধুর জন্মদিনে গেছে।

সুতরাং বাড়ী নির্জ্জন।

স্বাহা সোফার ওপর পাশে বসল পল্লবের। হাতখানা দুহাতে ধরে সে বল্ল, "এত করে নিষেধ করলাম, তুমি আমার কথা শুনলেনা কেন তুমি যুদ্ধের কাজে নাম দিলে?"

"তোমার নিষেধ আমি তখনই শুনতে পারিনা, যদি আমি তোমার হিতের জন্য কোন কাজ করি। তোমার ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সহজ করে তোলার আশায় যাচ্ছি। তুমি সম্পন্ন ঘরের মেয়ে, নূতন ডাক্তার তোমাকে কি দিতে পারে?"

"পল্লব, আমি সম্পদ চাইনি। তোমাকে চেয়েছি।"

কফি শেষ করে পল্লব দু'একটা পেষ্ট্রি, কেকের খণ্ড অন্যমনস্ক ভাবে খেল।

হাতের গুঁড়ো ঝেড়ে রুমালে হাত মুছে স্বাহার অতি কাছে সরে এলো। আরও, আরও কাছে।

"আমি ভেবেই পাইনা স্বাহা, তোমার মত সাহসী, স্বাধীন মনের মেয়ে কি করে এমন হতে পারছে? কত লোক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যায়, এতো ডাক্তার সেজে যাওয়া। তাও মাত্র ছয় মাস থাকব। দ্বিতীয় দফা আর আমি থাকব না। তোমাকে ছেড়ে ছ'মাসের বেশী থাকা সম্ভব নয়।"

স্বাহা আজ পরেছে সাদা শাঁড়ী, বিষণ্ণ মূর্ত্তি তার, মুখ ভার। চোখে যেন জলের ছায়া উঁকি দিচ্ছে।

"কি, জানি আমার বড় ভয় হচ্ছে। কত লোক যুদ্ধে যায়, আর ফেরে না।"

"দূর বোকা, তারা যায় যুদ্ধ করতে। আমি যাব আহত যোদ্ধাদের ভাল করতে। দলের পেছনে রেডক্রসের গাড়ী, অ্যাম্বুল্যান্স চলে। কোন ক্ষতি হয় না। ওখানে বোমা ফেলা, কোন ক্ষতি করা নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক আইন আছে না?"

"যদি ছিটকে পড়ে টুকরো বোমার?"

"তাতে এমন কোন ক্ষতি হয় না, প্রাণ যায় না। বোকা মেয়ে, তোমার কাছে আমি ফিরে আসব। না এসে পারি? না এসে যাব কোথায়?"

"কি জানি, আমার কেমন কেমন লাগছে।"

স্বাহার বিষণ্ণতা যায় না।

"শোন, তুমি প্রায়ই ট্যুরে যাও কাজে। আমাদের ছাউনি বড় শহরে থাকবে। সেখানে যেও একবার, দেখে এসো।"

"যাব। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কেন? আমার কথা শুনলে না?"

"পাগল"

পল্লব স্বাহাকে আরও একটু কাছে টানতে চাইল।

"না, না।"

"কেন নয়? চলে যাবার আগে অতৃপ্ত রাখবে, স্বাহা?"

"অতৃপ্ত রাখলে ফিরে আসবে তুমি।"

"আমি অতৃপ্ত না থাকলেও ফিরে আসব, স্বাহা, জানো তুমি।"

পল্লবের দিকে ফিরে দুজনের বুকের মাঝখানে হাতের বাধা রেখে একদৃষ্টে স্বাহা চেয়ে রইল।

তারপর আস্তে বলল, "তা হয়না পল্লব, তুমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে কত পেতে চাও, জানি। তাই ওটুকু রেখে দিলাম বাদ। তুমি অতৃপ্ত থাকো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।"

"আমি কথা দিচ্ছি, স্বাহা, যেমন করে পারি তোমার কাছে ফিরে আসব।"

দুজনে পাশাপাশি, সামনে অন্ধকার।

এবার বৃষ্টি নামল।

তিন

সরু পাহাড়ী পথ।

টীলার উপরে ডাক্তারের কোয়ার্টার।

গহন রাত্রি অন্ধকারে ভর্ত্তি।

একজন মেয়ে পা টিপে টিপে উঠছে, একহাতে ছোট একটি স্যুটকেশ, অন্যহাতে টর্চ্চ বাতি।

রাত্রি আটটায় যে গাড়ী পৌঁছবে, সে গাড়ী এল রাত্রি দশটায়।

পাশের শহরে স্বাহা ইচ্ছা করে ট্যুর ফেলেছিল। এখন সেখানকার কাজ অন্তে পল্লবের ডেরায় আসছে।

জমাটবাঁধা অন্ধকার। তবে বৃষ্টি নেই। এটি শীতকাল।

স্বাহা পল্লবকে ষ্টেশনে যেতে নিষেধ করেছিল। পল্লবের বাড়ীর ছবি সে দেখেছে। ষ্টেশনের কাছেই।

তাছাড়া, কোন গাড়ীতে যাবে ঠিক ছিল না।

স্বাহা ভ্রূকুঞ্চিত করে সাবধানে পথ চলছে আর নিজের মনে মনে কথা বলছে।

মনের কথাগুলো কি?

—পাঁচ মাস পুরে গেছে। একবারও দেখা হয়নি। আর থাকা যায়? একমাস পরেই চলে আসবে জানি। তবু পাশের শহরে যখন কাজ করেছি, এখানেই চলে এলাম। চারপাঁচদিন আগে চিঠি পেয়েছি। আমিও উত্তরে জানিয়ে দিয়েছি যে আসছি।

একটা রাত মাত্র থাকব। কাল সকালেই ভোরের ট্রেনে ফিরে যাব।

পুরনো চাকর কাঞ্চি আছে। সেই শ্যাপেরণ হতে পারবে।

স্বাহার মুখে ঈষৎ হাসি।

—কতদিন দেখিনা! শুধু ছবি আর ছবি। প্রত্যেক ডাকে ছবি পাঠায়।

আমাকেও পাঠাতে হয়।

কিন্তু আর পা চলছে না। শীতে জমে যাচ্ছি। কাল তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে রাত জাগতে হয়েছে।

চোখ যে ঘুমে ভেঙ্গে আসছে। দু'দিন যা ধকল গেছে। তায় নার্ভের ঔষধটা বোকার মত ট্রেনে বসে খেয়েছি। এখন কি করে ওর সঙ্গে কথা বলব?

রাত্রে জাগতে পারব না।

অবশ্য কথার কি আছে? কথা তো চিঠিতেই হয়। দেখা হলেই ঢের।

যেয়েই বলব, 'ক্লান্ত শ্রান্ত অতিথি। এক্ষুনি শুতে দাও!'

ক্রমেই আরও ক্লান্ত, আরও নিদ্রালু হয়ে স্বাহা অবশেষে দরজায় ঘা দিল।

চারিদিক বন্ধ ছোট বাড়ীটাতে, যা স্বাভাবিক শীতের দিনে। আলো নেই, কারুর সাড়াশব্দ নেই। চারপাশ নির্জ্জন।

পল্লব আছে তো? দ্বিধার সঙ্গে চিন্তা করতে করতে স্বাহা বন্ধ দরজায় ঘা দিল। পল্লব না থাকলেও কাঞ্চি থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল পল্লব। শীতের পোষাক, গলা ও মাথায় মাফলার জড়ানো।

"এসো, স্বাহা।"

"বাবা, আমার যা ভয় হয়েছিল, তুমি বোধ হয় চলে গেছ।"

"কোথায় যাব ? তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।"

"যা ক্লান্ত লাগছে। এক্ষুনি একটু শুয়ে না নিলে দাঁড়াতে পারছিনা। বরঞ্চ ঘুমিয়ে নিয়ে উঠব, তারপর রাত জেগে গল্প করা যাবে। তোমার মিলিটারী জীবনে রাতজাগা অভ্যাস আছে, নয় ?"

"হ্যাঁ"

সম্মুখে বসবার ঘরে কোণে গোল টেবিল ঘিরে কয়েকখানা চেয়ার; এপাশে দেওয়ালে ঠেসানো ছোট তক্তপোষে বিছানা করা। "দেখেই লোভ হচ্ছে, শুয়ে পড়ি। আচ্ছা, পল্লব, তোমার এ জায়গাটা কি আরভিং এর 'ঘুমন্ত উপত্যকা' নাকি ? পা দিলেই রাজ্যের ঘুম চোখ জুড়ে আসে। বাবাঃ, বিছানায় বসি।" পায়ের জুতো মোজা খুলে স্বাহা বিছানায় গা এলিয়ে বসল। পল্লব একটু দূরে। ঘরের আলো স্তিমিত।

"ওঃ, কত কথা যে জমে আছে, পল্লব। স্বাহা বলেছে যে এক রাত্রি কেন একশো রাত্রি জাগলেও কথা শেষ হবে না। তুমি কিন্তু একদম শেষ ছবির মতই দেখাচ্ছো।"

"শেষ ছবিই বটে !" পল্লব চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

"তার মানে ?"

"মানে, যুদ্ধ তো শেষ হয়েই যাচ্ছে।"

"কিন্তু অত দূরে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ যে ? এতদিন পরে দেখা। কিছু জিজ্ঞাসা করছ না কেন ?"

"আমি তো সব জেনেছি।"

"চিঠিতে অবশ্য আমি খুলে লিখি সমস্ত কথা। কিন্তু শেষ চিঠির পরেও কিছু ঘটতে পারে না ? চার পাঁচ দিন কি কম সময় ?"

"চারপাঁচদিন কম সময় নয়।"

"বুঝলাম। কিন্তু বুঝছিনা, অত আড়ষ্ট হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চোখদুটো জ্বলজ্বলে। জ্বর হয়েছে নাকি ? দেখি।"

স্বাহা হাত বাড়াল।

"আরে দাঁড়াও, আগে তোমাকে কিছু খেতে দেই। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।"

"কাঞ্চি কোথায় ? আমি ট্রেনটা দেরী হচ্ছে বলে পথেই রাত্রের খাবার খেয়েছি কাঞ্চিকে শুধু এক কাপ চা বা কফি দিতে বল। তুমি বোসো এত ব্যস্ত হোয়ো না, পল্লব। গলাটা ভারী ঠেকছে। সর্দ্দি-জ্বরের লক্ষণ।"

"কিছু হয়নি। কাঞ্চিকে ওর ঘরে আউট্‌হাউসে পাঠিয়ে দিয়েছি। এত রাত হয়েছে।"

"আমার দেরী দেখে বুঝি ভাবছিলে আমি আর আসব না ?"

"জানতাম তুমি আসবে। তোমাকে একটু চা আমিই করে খাওয়াব। তুমি আমার মত কফি তো ভালবাসোনা।"

স্বাহা হেসে উঠল, "তুমি কফি খাবে, না ? তাহলে আমি তৈরী করব। কিন্তু আমার আর জেগে থাকার সাধ্য নেই। স্লিপীং বিউটির রাজকন্যার মত আমি ঘুমিয়ে পড়ি পরীর মন্ত্রে। চা লাগবেনা। রাজপুত্র, আমাকে একটু পরে জাগিয়ে দিও।"

"রাজপুত্রের কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু কিছু না খেয়ে তোমার ঘুমিয়ে পড়া চলবে না। স্বাহা, একটু কষ্ট করে জেগে থাকো। এক্ষুণি আসছি।"

পল্লব পাশের দরজা দিয়ে চলে গেল।

স্বাহা চোখের পাতা টেনে টেনে চোখ রগ্‌ড়ে ঘুম তাড়াবার কসরৎ করতে লাগল। প্রিয়সকাশে আসছে, বলে ট্রেনের বাথরুমে নামবার আগে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে সে এসেছিল। এমন ঘুম কেন চোখে নামছে তার ? চারদিকে নিস্তব্ধ অন্ধকার। শীতের রাত্রি সার্সির বাইরে সবুজ লম্বা পরদার আড়ালে বহিস্কৃত। কোথাও যেন শব্দ নেই, প্রাণ নেই।

পল্লব এমন জায়গায় থেকে যেন কেমন হয়ে গেছে। চিঠিগুলো অবশ্য স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ও যেন কেমন হয়ে গেছে। যুদ্ধ কি সকলের ধাতে পোষায় ? যাইহোক কাগজে দেখা গেছে সীমান্তের শত্রু পশ্চাৎ অপসারণ করেছে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়েছে। তা নইলে মা-বাবা হয়তো স্বাহাকে আসতেই দিতেন না। যাহোক আর ক'দিন মাত্র। শীতের রাত্রি ছোট বাড়ীখানার বাইরে

ক্রমেই জমে নিথর হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের গহন রাত্রির বুকে কি এতই অন্ধকার? একটু উঠে চারিদিক দেখার ইচ্ছা করল স্বাহার কিন্তু, ঘুম যে তাকে ঘিরে ধরেছে।

ওঠা সম্ভব নয়।

পল্লব এলে বাঁচা যায়। একা ঘরে গা ছম্‌ছম্ করছে।

পল্লব এল।

হাতে একখানা ট্রেভর্ত্তি, টি পট্‌কাপ, ছাঁকুনি, চামচে। প্লেটে রুটী, ডিমের অম্‌লেট।

"এসো, এই টেবিলটায় বসে যাহোক কিছু খেয়ে নাও। তারপরে শুয়ে পড়। পরে গল্প হবে। ভেতরে শোবার ঘর—"

"না না, আমি এক্ষুণি এখানেই শোব। কি আশ্চর্য্য! এমন ঘুম তো আমার কখনও হয় না।"

স্বাহা অতি কষ্টে উঠল, "আবার ডিম রুটী আনলে কেন? আমি খেতে পারব না। আমি শুধু ঘুমোব।"

"না, না, তুমি এতদূর ট্রেনে আমার কাছে এসে না খেয়ে কেন ঘুমোবে? খেয়ে নাও যা পার।"

এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে ডিম অর্দ্ধেকটা ছিঁড়ে মুখে তুলল স্বাহা, "তুমি কিছু খাও।"

"আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।"

"আমারও তো হয়েছে। তুমি খাও, তোমার জন্যে কলকাতার কড়াপাক সন্দেশ এনেছি। কি একটা ছাই রংয়ের গলাবন্ধে অর্দ্ধেক মুখ ডেকে বেড়াচ্ছো। স্বধা চমৎকার গে-রঙের মাফলার বুনে দিয়েছে। বিয়ের সময় তোমাকে দেবে মোজা, কার্ডিগান, সমস্ত হাতে বোনা। বাবা বই পাঠিয়েছেন। মা আচার করে দিয়েছেন। দাদা দিয়েছেন একবাস্ক সৌখিন রুমাল।"

"হুঁ! তোমরা তো পার্শেল পাঠাতে। আর কেন?"

"বা, এখনই তো পাঠাবে। কাজে লাগবে যুদ্ধজয়ী বীরের। যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা দারুণ হয়েছে, না? চিঠিতে আপশোষ করতে কেন এসেছ। যাক যুদ্ধজয়ী বীরের যুদ্ধ ভালোয় ভালোয় মিটল।"

"আর একটু চা নাও, স্বাহা।"

"এত গম্ভীর কেন তুমি? একটু ঘুমিয়ে উঠে আমি কফি তৈরী করব। দুজনে রাত জেগে গল্প করব। না হয়, কাল ভোরের ট্রেনে যাব না। বেলায় যাব, কি বল? তোমার যুদ্ধের গল্প শুনবো।"

স্বাহা চা শেষ করে কাপ সরিয়ে রাখল। রুটি ছুঁল না, ডিমও অর্দ্ধেক মাত্র খেল।

"অভিজ্ঞতা শোনার জন্য রাত জাগতে হবে কেন? দু'কথায় এখনই বলে দেওয়া যায়। অভিজ্ঞতা ভয়াবহ।"

স্বাহা পল্লবের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে বলল, "সেই অভিজ্ঞতা শেষ হয়েছে—ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, বেঁচে ফিরেছ।"

পল্লব চঞ্চল হয়ে বলে, "কিন্তু যারা বেঁচে ফিরল না, তাদের কি হল? মনুষ্যত্বের চরম অবনতি দেখেছি আমি। যুদ্ধবিরতির এক মুহূর্ত্ত আগেও যারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে পারে, তারা কি মানুষ?"

"কি হয়েছে, পল্লব?"

"থাক পরে শুনবে। আজ তুমি বসে থাকতে যে পারছ না, স্বাহা, এখানেই শোবে না কি?"

"হ্যাঁ, জামাকাপড় পরে ছাড়ব। একটু ঘুমিয়ে নিই। তুমি কাঞ্চীকে ডেকে তুলে কফির জল করতে বলে দাও। এক্ষুনি উঠে আমি কফি তৈরী করে খাওয়াব তোমাকে। কত কথা বলার আছে।"

স্বাহা কোনমতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, হাত বাড়িয়ে বলল, "হাতটা ধরনা একবার। তুমি কি বদলে গেছ—আমার কি হবে?"

স্বাহার গলায় ব্যথা, হতাশা সংশয়।

আধো অন্ধকার, স্তিমিত-আলোক কক্ষে পল্লবের গলায় শোনা গেল, "ভয় নেই স্বাহা, আমি কখনও বদলে যেতে পারি না। তুমি ভালো করেই জানো। এখন ঘুমিয়ে পড়ো।"

"দিদি, ও দিদি, উঠুন। বেলা হয়ে গেছে অনেক।"

চোখ মেলে স্বাহা দেখল স্বপ্ন নয়, পল্লবের ঘরের বিছানায় সে শুয়ে আছে। পায়ের কাছে জুতোমোজা খোলা, সুটকেশ রাখা।

লম্বা লম্বা সবুজ পরদায় ঘর আবৃত্ত হলেও ফাঁকদিয়ে শীতের উজ্জল রোদ এসে পড়ছে। কাঞ্চি ডাকছে তাকে। চোখ রগড়ে উঠে বসল স্বাহা। লজ্জিত হাসি হেসে বলল, "রাত্রে আর কফি বানানো হোল না, গল্প করা হোল না। গোটা রাতটা ঘুমিয়ে কাটালাম। ছিঃ ছিঃ! কাঞ্চি তুমি কোথায় ছিলে?"

"কেন দিদি, আমি তো আপনাকে দরজা খুলে ঘরে আনলাম।"

"তুমি আনলে!" স্বাহা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, "সে কি?"

"ভুলে গেছেন, দিদি? আপনি ব্যাগ হাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বাবু আছেন তো? আমি ঘাড় নাড়লাম। আপনি বল্লেন, এখানেই শুয়ে পড়ি, কাঞ্চি। কাল সমস্ত শুনব। সারারাত না খেয়ে কাটল। জুতো খুলে ব্যাগ ফেলে তক্ষুনি শুয়ে পড়লেন যে।"

"না খেয়ে কাটল! তোমার বাবু কোথায়?"

"বাবু আর নেই।" অবার কাঞ্চি ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল, "শত্রুরা অন্যায় করে অ্যাম্বুলেন্সে বোমা ফেলেছিল, তাইতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচমিনিট আগে বাবু শেষ হয়ে গেলেন। এতক্ষণে তাঁর বাড়ীতে, আপনার বাড়ীতে হয়তো তাব চলে গেছে। কি হবে দিদি? সেই কদিন আগে যদি আসতেন—" কাঞ্চি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

"বাবু শেষ হয়ে গে-ছে-ন। তবে আমাকে কে ঘরে এনে বসাল? কে খাওয়াল?"

"কি বলছেন দিদি? শোকে আপনার মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে গেল। সেইজন্যে কাল রাতে হঠাৎ করে খবরটা দেইনি। আমি পাশের ঘরে শুয়েছিলাম, একবারও তো আপনি ওঠেন নি!"

স্বাহা পাগলের মত কোনের গোল টেবলের দিকে ছুটে গেল। এখানে কাল রাত্রে তারা বসে চা খেয়েছে, গল্প করেছে।

সেখানে স্বাহা দেখল, পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে, আর কোনের দেওয়াল থেকে মাকড়সার জাল নেমে এসেছে। জাল বুনে রেখেছে মাকড়সা, একটি তন্তুও ছিড়ে যায়নি কোন স্পর্শের আঘাতে।

॥ **বাণী রায়** ॥ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবন মোহিনী স্বর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ করেন। বাণী রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে নানা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক ভারতীয় নারীবর্ষে সদস্যা হিসাবে পূর্ব বার্লিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। মৌলিক রচনা ছাড়াও বিভিন্ন অনুবাদেও লেখিকার সুনাম সুবিদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জীবনে লেখিকা তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পুনরাবৃত্তি' লেখেন। বাণীরায়ের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'জুপিটার', 'সকাল সন্ধ্যারাত্রি' এবং 'প্রেম'। বাণীরায় ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রোমান্টিক গল্প ছাড়াও ভৌতিক ও রহস্য গল্পের জাল বুনতে লেখিকার কুশলতা অনন্যসাধারণ।



বিকেল সাড়ে চারটার পটভূমি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাদেব সান্যাল দিল্লি গেছলেন। ফেরবার পথে এখানে নামার কথা একবারও ভাবেন নি। এমন কি স্টেশনে আসার দু'ঘণ্টা আগেও ভাবেন নি।

কলকাতা যত কাছে এগিয়ে আসছিল তত মনে হচ্ছিল আর কটা দিন পরে গেলে কি হয়? ·········একেবারে সেইদিন সকালে গিয়ে উপস্থিত হন যদি? ···········সেই দিনের আরো চারটে দিন বাকি মাঝে।

এই ক'টা দিন তিনি না থাকলেও কিছু আটকাবে না। ব্যবস্থা পত্র সব করাই আছে। দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে এই ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা। তারই দুই উকিল কেস বুঝে নিয়েছে। তারা দুজন দুজনের হয়ে আইনগত বিচ্ছেদ চাইবে। ব্যবসায়ের কাজে তিনি

দিল্লি রওনা হবার আগেই দুজনের বোঝাপড়া সইসাবুদ সব হয়েগেছে। এখন ওইদিনে তিনি উপস্থিত না থাকলেও কিছু আটকাবে না। তবে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছেও তাঁর নেই।

যা ঘটতে যাচ্ছে গোড়ায় গোড়ায় তাতে তাঁর সায় ছিল না। প্রতিভাকে বরং অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করে ছিলেন তিনি। এই তেতাল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রীটি তাঁর আর কারো ঘরনী হবে সেটা এক বারও মনে হয়নি। তাঁর আটচল্লিশ পেরুতে চলল, স্ত্রীর তেতাল্লিশ হবে। বয়েস ছাড়া অন্য বাস্তব দিকও আছে। তিনটি ছেলেমেয়ে, তাদের প্রতি স্ত্রীর দরদ নেই একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তারা মা অন্তঁ প্রাণ। তা ছাড়া স্ত্রীটিকে তিনি নির্বোধ মনে করেন না, তার স্তাবক সংখ্যা যতই হোক, আর উঁচু সামাজিক মহলে তার যত সমাদর থাক সব কিছুর মূলেই যে স্বামীর অঢেল বিত্ত, এটা তার না বোঝার কথা নয়।

আসলে এটা রাগ আর গোঁ। তাঁর উপর আক্রোশ। মহাদেববাবু তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন আমরা যেমন আছি তেমন থাকতে দোষ কি? কেউ কারো ব্যাপারে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি না করলেই হল।

গাড়ির দোলানিতে চোখ বুঝে যেন প্রতিভার সেই মুখখানাই দেখছিলেন। মহাদেববাবু। চোখের সামনে হাসি মুখও যেন দুলছিল। প্রতিভার এই আশ্চর্য গুনটাই লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। তার যত রাগ হয়, চোখের কোণে আর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তত বেশি লুকোচুরি খেলে।

হ্যাঁ প্রতিভা ঠিক তেমনি করেই হেসে ছিল আর দেখছিল আর বলেছিল। বলেছিল, তোমার আপত্তি কেন? তুমি উঁচু মহলের মাথায় বসে আছ, তোমাকে নিয়ে লোকে আলোচনা করবে, কানা-কানি করবে, তোমার সম্ভ্রম নষ্ট হবে—সেই জন্য?

মহাদেব বাবু অস্বীকার করেন নি। বলেছিলেন, তাও সত্যি। তা ছাড়া ছেলে-মেয়ে আছে—

ছেলে-মেয়ের কথা ছাড়ো, তারা তোমাকে আমাকে দু'জনকেই

দেখছে। তোমার যে সমস্যা সেটা দু'দিনের, লোকে চিরকাল কিছু পরের কথা নিয়ে থাকে না। তা ছাড়া তোমার মণিমালা আছে, ভাবনা কি, দেখতে দেখতে মন ভাল হয়ে যাবে।

গম্ভীর মুখে পাল্টা খোঁটা দিয়েছিলেন মহাদেব বাবু, একজন ছেড়ে তোমারও মন ভাল করার মত পাঁচ সাত জনের নাম আমি করতে পারি।

পারো? প্রতিভার সেই হাসি প্রায় নির্লজ্জ মনে হয়েছিল— তাহলে আর আমাদের সমস্যাই বা কি বাধাই বা কি?

না, প্রতিভাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা যায়নি। ফলে মহাদেববাবুকে ভাবতে হয়েছে। আর, যত ভেবেছেন ভাবনাটা তত যেন ফিকে হয়ে এসেছে। একটা সহজাত সংস্কার বশেই ধাক্কা খেয়েছিলেন প্রথম। নইলে এমন কি চিন্তাচ্ছন্ন হবার মত বাজার। এ রকম হামেশাই হচ্ছে। ক্রমশ উল্টো ধরনের স্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

তাঁর এত টাকা, এত ঐশ্বর্য, এত প্রতিপত্তি, কিন্তু ভিতরটা যেন মনের মতন স্বাধীন নয়। প্রতিভা তাঁর খবরও রাখে না, তার নিজের আচরণই এমন কিছু গঙ্গা জলে ধোয়া নয়—তবু মহাদেববাবুর কেমন মনে হত, স্ত্রীর চোখ যেন সদা পাহারা দিয়ে চলেছে। তাই নিজেদের অগোচরে দুর্নীরিক্ষ এক অস্বস্তির হাওয়া ভিতরে ভিতরে জমাট বেঁধে উঠছিল কেমন।

সেটা হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। অস্বস্তি কমছে। এক ধরণের নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন তিনি। মুক্তির স্বাদ পাচ্ছেন।

তিনি রাজী হয়েছেন। রাজী হবার পর আরো হাল্কা লেগেছে।

·····না, কাউকে তিনি বঞ্চিত করলেন না। ছেলে-মেয়ে কোনো অভাব টের পাবে না। কলকাতার অতবড় বাড়িটা তো স্ত্রীর নামেই লেখা। ছেলেমেয়ের নামেও তিনখানা বাড়ি লিখে দেবেন কথা ছিল। তাই দেবেন। আর টাকাও দেবেন। আর প্রতিভা যদি হাস্যকর কিছু না করে বসে তো তারও কিছুর অভাব রাখবেন না তিনি। সে আশ্বাস তাকে দিয়েই রেখেছেন।

আর নিজে তিনি কি করবেন? এই আটচল্লিশ বছর বয়সে

মণিমালাকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন আবার ? না, তা তিনি করবেন না। মণিমালা অতটা প্রত্যাশাও করেনা। প্রতিভার মত সে তাঁর জীবনটাকে সুদ্ধু দখল করে বসতে চায়নি। অন্ধ পিপাসায় তিনি যখন ছুটে যান তার কাছে, প্রসন্ন উদারতায় মণিমালা কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করে। সে স্কুল মাস্টারি করত। সেই স্কুলের মানী সেক্রেটারী হিসাবে সামান্য পরিচয় ছিল মহাদেব বাবুর সঙ্গে। মাকড়সার জালের মত এক চক্রের মধ্যে জীবন বিপন্ন হতে চলেছিল তার। দেশের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত বলে সেই চক্র রাজদ্বারে অভিযুক্ত। পরদেশীর সঙ্গে বেআইনী সংযোগ তাদের। শিক্ষিতা উচ্চাভিলাষী সুরূপা রমণীর প্রয়োজন হয়েছিল তাদের। সেই জটিল প্রয়োজনের বলি হতে চলেছিল মণিমালা।

এখন তার জেলে থাকার কথা। নয়ত তার আগেই ভয়ে এসে নিজের জীবনের ওপর শেষ কিছু একটা করে বসে থাকার কথা। তাই করত; যদি না মহাদেব সান্যালের অভয় পেত। মণিমালা তাঁর কাছে এসে ভেঙে পড়েছিল, তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। নিজেকে তার পায়ে সমর্পণ করেছিল।

ভয়াবহ এক অনিবার্য বিপদ থেকে এত সহজে মুক্ত হয়েছিল সে নিজেই অবাক মণিমালা। যারা তাকে আইনের কাঠ-গোড়ায় এনে দাঁড় করানোর জন্য খোঁজাখুঁজি করছিল, তাদেরই দণ্ডমুণ্ডের মুরুব্বিরা তাকে খাতির করেছে, তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। মহাদেব সান্যালের নিভৃত জীবন যে রমণীর সঙ্গে যুক্ত, সে তাদের খাতিরের পাত্রী। সমাদরের পাত্রী। আর যে চক্রের কালো ছায়া পড়েছিল তার ওপর ? সেটা ছায়াই। একটা ভুলের ব্যাপার মাত্র। ভুল বুঝলে কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় ?

সেই মণিমালা ইচ্ছে করলে এখন মহাদেব বাবুকেও জীবন থেকে ছেঁটে দিতে পারে। মহাদেব বাবুর চেষ্টাতেই সে অভিনেত্রী জীবনে প্রবেশের পথ পেয়ে ছিল। এখন সে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। রোজকার ভাল করে, অপচয় নেই। তার গুণ মুগ্ধের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশ তার সংযত অভিনয়ের সমালোচক উদার।

কিন্তু এখনো তার প্রীতির অন্দর মহলে প্রবেশের পথ একমাত্র মহাদেব সান্যালের জন্যেই খোলা। সেখানে দ্বিতীয় আগন্তুকের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। তার যাবতীয় ব্যয়ভার মহাদেব সান্যাল বহন করেন। প্রশ্রয় পেলে সে ভার বহনে অনেকেই সাগ্রহে এগিয়ে আসবে এখন। কিন্তু রওনা হবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের খবরটা মণিমালাকে জানিয়ে ছিলেন মহাদেব বাবু। শুনে মণিমালা দুঃখিত হয়েছিল। আর সেই জন্যেই এত ভাল লেগেছিল মহাদেব বাবুর।

সবশুনে সে চুপ করে বসেছিল খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, আসার জন্যে।

মহাদেব বাবু মাথা নেড়েছেন।—না, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। এ হতই, আমার জীবনের ওপর সে মাষ্টারি করতে পারল না বলেই এরকম হল। সেটা বরদাস্ত করার ধাত নয় আমার।

তারপর একটু যেন ভয়ে ভয়েই মহাদেব বাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এরপর আমরা কি করব বিয়ে ?

মণিমালা জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি বলো ?

···ভাবছি। এই বয়সে আবার একটা হৈ-চৈয়ের মধ্যে ঢুকব।

মণিমালা আশ্বস্ত করেছে তক্ষুনি, কি দরকার, বেশ তো আছি····।

মহাদেব সান্যাল নিশ্চিত হয়েছিলেন। নিশ্চিত হয়ে ব্যবসার কাজে দিল্লী গেছেন। সেখানে অবসর সময়ে প্রতিভার কথা নয়, মণিমালার কথাই ভেবেছেন। যত ভেবেছেন তত তাঁর ভাল লেগেছে। মনে মনে কলকাতায় ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন শুধু তার টানেই। এমন কি দু'ঘণ্টা আগেও তিনি তার কথাই ভাবছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল।

বিকেল তখন ঠিক সাড়ে চারটা। মহাদেব বাবু দেখছেন।

শরীরটা কেমন অস্থির করতে লাগল। হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী তিনি। একটা মানসিক ভয়ে প্লেনে চলাফেরা করেন না। ট্রেনেই যাতায়াত করেন। রিজার্ভ কুপেতে একা যাত্রী তিনি। ভাবলেন প্রেসারটা বেড়েছে, তাই অসুস্থ বোধ করছেন।

কিন্তু অস্থিরতা ক্রমে বাড়তে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাকে মনে পড়ল তাঁর। শরীর একটু অসুস্থ হলে আগে কি কাণ্ডই না করত। একেবারে সেরে না ওঠা পর্যন্ত সমস্তক্ষণ কড়া পাহারায় রাখতে তাঁকে, ডাক্তারের নির্দেশ এক চুল নড়চড় হতে দিত না।—হাজার জরুরী কাজ থাকলেও তার শাসনে পড়ে সব সিকেয় তুলে রাখতে হত।

না। প্রতিভার চিন্তা থাক্। তাড়াতাড়ি অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ফলে তার কথাই বেশি মনে হতে লাগল। সেবারে মুসোরিতে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর জীবনে মণিমালা এসে গেছে। মানসিক সমাচার দুজনের একজনেরও কুশল নয়।

কিন্তু সত্যিই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে প্রতিভা এক সময় তাঁর শয্যার পাশে এসে বসল। আর তারপর কটা দিন দুজনেই যেন সেই আগের দিনে ফিরে গেল। মহাদেব বাবু এ-কথা অস্বীকার করতে পারেন না, অসুখ হয়ে পড়লে প্রতিভার থেকে বেশী নির্ভর আর কারো ওপর করা যায় না। অসুখ হলে তাঁর পুরনো ডাক্তার ঠাট্টা করত, আপনার স্ত্রী এসে বিছানার পাশে বসুন, জানতে কতক্ষণ।

যা ভাবতে চান না তাই ভাবছেন বলেই নিজের ওপর বিরক্ত মহাদেব সান্যাল। কিন্তু আশ্চর্য, ভাবতে না চাইলেই অসুস্থতা বাড়ছে, কিরকম যেন একটা অস্বস্তি। উঠে আয়নায় মুখ দেখলেন। না মুখ তেমন লাল হয়নি। প্রেসার বেশি বেড়ে গেলে মুখ লাল হয় তাঁর। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। কিন্তু তেমন কষ্টও হচ্ছে না। অথচ কি রকম যেন ফাঁপর লাগছে।

উঠে পাখাটা পুরোদমে খুলে দিলেন। তবু যতটা বাতাস পেলে ভাল হয়, ততটা বাতাস নেই যেন।

কলকাতায় পৌঁছেই সোজা মণিমালার ওখানে চলে যাবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু অসুস্থ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার চিন্তাটা যেন মণিমালার চিন্তাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। তিনি অসুস্থ আর

প্রতিভা তাঁর সামনে আছে ভাবতে চেষ্টা করলেই আর অতটা খারাপ লাগে না, ভিতরের অস্বস্তিকর চাপ ভাবটা কমে আসে।

তাজ্জব ব্যাপার—অসুস্থ বোধ করা মাত্র প্রতিভা যেন তাঁর কাছে এসে গেছে। আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলেন মহাদেব সান্যাল, ছাড়াছাড়ি হবেই যখন, এ-রকম মানসিক দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু মনের খবর কে রাখে। এই স্টেশনটা আসার আধঘণ্টা আগেই শরীরের কথা ভুলে গেলেন মহাদেব সান্যাল। নিজের সঙ্গে খানিক খুলে হঠাৎ স্থির করে ফেললেন, এখানে নামবেন তিনি ক'টা দিন থেকে যাবেন। অসুবিধে কিছু হবে না, তাঁর নিজের বাড়ি এখানে—মস্ত কাম্পাউণ্ড ঘেরা বাড়ি, দুটো চাকর আর দুটো মালী আছে। আগে বছরের মধ্যে কতবার যে বিনা নোটিসে প্রতিভাকে নিয়ে হুট করে চলে আসতেন এখানে, ঠিক নেই। চাকর আর মালিরা জানে মনিব তাদের যে কোনো সময়ে এসে হাজির হতে পারে। কেউ আসুক বা না আসুক, একটা সংসারের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে তারা সর্বদা প্রস্তুত।

সাঁওতাল পরগণার এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদেই এতবড় বাড়ি কিনে বসেন নি মহাদেব সান্যাল। এই জায়গাটার সঙ্গে তাঁর জীবনের একটা বড় স্মৃতির যোগ। শুধু তাঁর জীবনেই না, প্রতিভার জীবনেরও। এইখানেই প্রথম দেখা দুজনের। প্রথম আলাপ, প্রথম পরিচয়। সেই দেখা সেই আলাপ সেই পরিচয়ের এই পরিণাম কল্পনারও অগম্য ছিল সেদিন। নির্জন জায়গায় অতবড় একটা বাড়ি মহাদেব বাবুই জোর করে কিনে ছিলেন। প্রতিভা বলেছিল, আমার এখানে থাকতে ভয় করবে!

কিন্তু বাড়ি যখন কেনা হলই, তার মনের মত করেই সে সাজিয়ে ছিল বাড়িটাকে। দেখার মত বাগান করেছিল। গোটা বাংলোটাকে তকতকে করে তুলেছিল মহাদেব বাবু তাকে নিয়ে যখনই আসতেন, সঙ্গে বাড়তি কয়েকজন লোক আর বন্দুক দুটো নিয়ে আসতেন। বন্দুক ছাড়া এই নির্জনতা খুব নিরাপদ নয়। পাঁচ সাতবার আসার পর ভয় কমে গেছল, তবু বন্দুক থাকতই সঙ্গে।

এখানে না নেমে পারলেন না মহাদেব বাবু। পুরনো স্মৃতি যেন তাকে টেনে নামালো। না নামার কথা যতক্ষণ ভাবছিলেন, ততক্ষণই শারীরিক অস্থিরতা আর অসুস্থতা বুঝি চারগুন হয়ে বুকে চেপে বসছিল। নামবেন স্থির করতেই ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হল, সুস্থ হল। তারপর অসুখের কথা মনেও থাকল না। তিনি নেমে পড়লেন।

ঘোড়ার গাড়িতে যখন বাড়ির ফটকে এসে পৌছুলেন তখন সবে সন্ধ্যা। হাওয়া নেই বেশী। চারদিকের গাছ-পালাগুলো যেন রাত্রির অভ্যর্থনায় মৌন প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে। গাড়োয়ান ভাড়া নিয়ে চলে গেল। অদূরের পাহাড়টাও আকাশের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

মহাদেব বাবু বিস্মিত একটু। সামনের ফটক হা করা খোলা, আরো বিস্মিত বাংলোর দিকে চেয়ে। সবক'টা ঘরে, বারান্দায়, জোরালো আলোগুলো জ্বলছে। আরো আশ্চর্য, যে-ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকবার কথা, সেগুলোও খোলা মনে হচ্ছে। তিনি আসছেন জানা থাকলে যেমন হয় তেমনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন তিনি। তক্ষুনি যে হঠাৎ কেন বন্দুকের কথা মনে হল তাঁর, কে জানে। বন্দুক আনা হয়নি। অবশ্য বন্দুকের চিন্তা বাতিল করে দিলেন। চারটে বিশ্বস্ত লোক থাকে, ভয়ের কি আছে।

রাতে গরম হবে খুব মনে হয়। এক ফোটা হাওয়া নেই। ঘষা শ্লেট-রঙা আকাশের চামড়ার নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুন লেগেছে যেন। মহাদেব বাবু দাঁড়িয়ে দেখলেন একটু, তারপর বাংলোয় উঠলেন।

এদিক ওদিক চেয়ে হতভম্ব তিনি। সত্যিই সব ঘরদোর খোলা। অথচ চাকর বা মালী কারো দেখা নেই। রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মুখ চোখ অন্যরকম হয়ে গেল তাঁর। সব কটাকে এক সঙ্গে বরদাস্ত করবেন বোধ হয়। এইভাবে তারা বাড়ি রক্ষা করে তিনি ভাবতেও পারেন না।

কিন্তু অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। কিরকম যেন ঝিমুনি আসছে। নিজে যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে ঢুকলেন। শুয়ে পড়বেন।

ঢুকেই হতভম্ব। নিজের দুটো চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রসাধন শেষ করে তাঁর দিকে হাসি মুখে ফিরে দাঁড়াল প্রতিভা। বলল, এসো, মালী আর চাকরের ওপর রেগে আগুন হয়েছ তো ? ওদের আমি আজকের রাতের মত ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

মুখে তবু কথা সরে না মহাদেব বাবুর। এই জন্যেই কি হঠাৎ এখানে আসার এমন আকর্ষণ অনুভব করছিলেন তিনি ! প্রতিভা এখানে এসেছে বলে ! মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে নির্গত হল—তুমি !

প্রতিভা হাসছে। ঘরের জোবালো আলোর দরুন কিনা বলা যায় না, হাসিটা উজ্জ্বল মনে হচ্ছে মহাদেব বাবুর। বলল, এত অবাক হচ্ছ কেন, এখনো তো কোর্টে কেস পর্যন্ত উঠে নি, স্ত্রী যে সেটা এখনো অস্বীকার করতে পারো না।

মহাদেব বাবু শয্যায় বসলেন। খাটের উপর বিছানাটাকে বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে পাতা। বসার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব বাবুর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। গরম লাগছিল, জামাটা খুলে ফেললেন। গম্ভীর মুখে বললেন, অস্বীকার তুমি করতে চেয়েছ। এখানে একা এসে গেলে, চাকর-বাকরগুলোকে পর্যন্ত ছুটি দিলে—আমার তো আসার কিছুই ঠিক ছিল না, হঠাৎ এরকম একলা থাকার দুঃসাহস হল কেন ?

মুখটিপে হাসছে প্রতিভা। আর মহাদেব বাবু অস্বস্তি বোধ করছেন, কারণ হাসিটা সুন্দর লাগছে তাঁর। শুধু সুন্দর নয়, ধারালোও। বলল, একা কোথায়, তুমি তো এলে।

বললাম, তো আমি আসব সেটা আমি নিজেই জানতাম না।

প্রতিভা তেমনি লঘু জবাব দিল, মনের কথা কে জানে বলো, কে যে কখন আসে।

মহাদেব বাবুর মনে হল, প্রতিভার এরকম হালকা মেজাজ অনেক দিন দেখেন নি। অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ হয়ও না তেমন। হঠাৎ তাঁকে দেখে প্রতিভার একটা আপস করার ইচ্ছে কিনা বুঝলেন না।

কিন্তু মহাদেব বাবু আর তা চান না, ব্যাপার এখন অনেক দূর গড়িয়েছে।

তবু ভিতরে ভিতরে মন একটু নির্ভরশীল হয়ে উঠতে চাইছে যেন! শরীরটা খারাপ বলেই বোধ হয়। বলেও ফেললেন সে কথা।—শরীরটা ভাল লাগছেনা, একটু ঘুমোতে পারলে হত।

আগে তার শরীর খারাপ শুনলেই প্রতিভা সচকিত হত। এখন শুধু চেয়ে আছে তার দিকে। এই চাউনিটাও কেমন ধারালো মনে হচ্ছে তাঁর। প্রতিভা আট দশ হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তেমনি।

একটু চুপ করে থেকে মহাদেব বাবু আবার বললেন, রাতটা থেকে কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব ভাবছি, তুমি কি সত্যিই এখানে একা থাকবে নাকি।

জবাব দেবার আগে প্রতিভা তেমনি চেয়ে রইল খানিক। তার এই নির্নিমেষ চাউনিকেই কেমন যেন সহ্য করে উঠতে পারছেন না মহাদেব বাবু। তারপর বলল, না একা থাকব না, তুমিও থাকবে। আর একা থাকার ইচ্ছে আমার নেই।

মহাদেব বাবু সচকিত। ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল।—তার মানে?

প্রতিভা হেসে উঠল খিলখিল করে। সেই হাসি একটা অস্বস্তি হয়ে তাঁর বুকের ভিতরে ছড়াচ্ছে। তেতাল্লিশ বছরের প্রতিভা এখনো এমন ছেলেমানুষের মত হাসতে পারে তা যেন ভুলেই গেছলেন।

—এই সহজ কথাটার মানে বুঝতেও এত কষ্ট হচ্ছে তোমার?

একটু হচ্ছে। মহাদেব বাবু জবাব দিলেন, আমার সঙ্গে থাকার পাট তো তুমি চুকিয়ে ফেলেছ।

এখনো ফেলিনি। তুমি কোন্ আশায় আছ পাট চুকলেই পাকা-পাকি ভাবে তোমার মণিমালার শরণাপন্ন হবে? আমি অনেক ভেবে দেখলাম—

মহাদেব বাবু মুখ গোঁজ করে বললেন, কিন্তু একটু আগে ভাবলে ভাল হত না কি?

তরল কণ্ঠে প্রতিভা জবাব দিল, এমন আর কি দেরি হয়েছে, তোমার ভুল শোধরানো আমার কর্ত্তব্য।

ভুল তোমার হয়নি ?

তোমার জন্যেই হয়েছে। তুমি যত বড়লোক হয়েছ তত বাঁকা রাস্তায় চলেছ।

মহাদেব বাবু তখনি জবাব দিলেন, বাঁকা রাস্তায় তুমি চলোনি? দশ জনকে পিছনে নিয়ে ঘোরো নি? আমি তোমার স্বাধীনতায় হাত দিতে গেছি ?

আবার সেই হাসি, যে হাসি দেখে বার বার বিচলিত হয়ে পড়েছেন মহাদেব বাবু। হাসি থামিয়ে প্রতিভা বলল, আমি বাঁকা রাস্তায় চলেছি তোমার জন্যে, ঈর্ষা জাগিয়েও তোমার চোখ দুটো যদি আমার দিকে ফেরাতে পারি সেই আশায়। কি ছেলে মানুষি না করেছি। তোমার টাকা রোজগারের নেশাটা যে এমন এক পাহাড়ের মত অনড় ব্যাপার—সেটা চোখে দেখেও একমাত্র সত্যি বলে বিশ্বাস করতে মন চায় নি।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে প্রতিভার হাসি মিলিয়ে গেল দু'চোখ করকরে হয়ে উঠতে চাইল।

মহাদেব বাবুর বসে থাকতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। বালিশ উঁচু করে ঠেস দিলেন। বললেন, শরীরটা আমার কি রকম লাগছে সেই ট্রেন থেকে, নিজের দোষ-গুণের হিসেব নিয়ে বসতে এখন ভাল লাগছে না—তুমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো।

প্রতিভা বসল না। এবারে চোখ দুটো হাসল যেন। বলল, বসে কি করব, সেবা করব ? আমি কাছে বসলে কি তোমার আর ভাল লাগবে ?

চোখ টান করে প্রতিভাকে দেখলেন মহাদেব বাবু। বলতে পারলে বলতেন, হ্যাঁ ভাল লাগবে। বলতেন মাথায় আগের মত একটু হাত বুলিয়ে দিলে আরো ভাল লাগবে। প্রতিভাকে কতদিন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন নি তিনি। তার বয়স দিন দিন কমছে না ঠাওর করা শক্ত। নীলাম্বরী শাড়ী পড়েছে, গায়ে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, তাতে নীল স্ট্রাইপ।

সচকিত হলেন মহাদেব বাবু, প্রতিভার এই বেশই তিনি একদিন পছন্দ করতেন বটে। হয় লালশাড়ী আর সাদা সিল্কের ওপর লাল স্ট্রাইপ, নয়ত নীল শাড়ী আর নীল স্ট্রাইপ। এই বয়েস বলেই প্রতিভা লাল আর পরে নি হয়ত, নীল পড়েছে।

প্রতিভার সবই সুন্দর লাগছে আজ। মহাদেব বাবুর চোখে, মনের তলায় কি এক অজ্ঞাত অনুশোচনাও যেন উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে! শুধু মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করছেন এই সুন্দর মুখের ধারালো ভাবটা দেখে—তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে একবার ভিতর দেখে নিচ্ছে সে।

বললেন, না সেবার আশা আর রাখিনে, যাক, দেখা যখন এখানে এইভাবে হয়েই গেল, তিক্ততার দিকটা তুজনেরই বাদ দিয়ে চলতে চেষ্টা করা ভাল নয় কি! তা ছাড়া, একটু আগেও সব কথাই তো, কি বলছিলে—সত্যিই এখন কি চাও তুমি?

প্রতিভা সাগ্রহে এগিয়ে এলো তু'পা। তার এবারের কণ্ঠস্বরে চাপা উদ্দীপনা।—আমি যা চাই তা শুনবে? আমি যা করতে বলি তা করবে? পাপ স্বীকার করবে?

আগ্রহ উদ্দীপনায় ওই জ্বলজ্বলে চোখে চোখ রাখতে পারছেন না মহাদেব বাবু। ভিতরে ভিতরে কেমন শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন তিনি। প্রতিভার গলার স্বরটা বুঝি একটা মাদকতা জড়ানো নেশার বস্তুর মত কানের ভিতর দিয়ে নিভৃতের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না, অথচ বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে আনতে ইচ্ছে করছে, আর তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

অস্ফুট স্বরে বললো, কি পাপ……

কি পাপ জানো না? প্রতিভার মুখ চাপা ক্ষোভে জ্বলে উঠল আবার। তোমার লক্ষ লক্ষ টাকার গায়ে রক্তের দাগ দেখতে পাও না? আজ তুমি আমাকে ছাড়তে চাও ভয়ে, আমি বরাবর সেই দাগ দেখে আসছি বলে—মণিমালাকে তুমি একটুও ভালবাস না, তুমি তাকে চাও শুধু তার কাছে নিজেকে নিরাপদ ভাবো বলে। কোথা থেকে তোমার এত টাকা, সে হিসেব সে কোনদিন নিতে চাইবে

না বলে। কিন্তু আজ এখানে কেউ নেই, আজ এখানে শুধু তুমি আর আমি। তোমার পাপ স্বীকার করতে বাধা কি? যে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছে, সে সব কত মায়ের কত শিশুর কত স্বামীর কত স্ত্রীর রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে আছে সেটা একবার চোখ চেয়ে দেখতে বাধা কি? দেখেও দেখো না, চোখ বুজে দেখে দেখবে?

শরীরটা অদ্ভুত অবশ লাগছে মহাদেববাবুর। চোখেও যেন ঠিক দেখতে পারেন না। প্রতিভার নানা উত্তেজনা ভরা কণ্ঠস্বর যেন দেহের বাঁধনগুলো কেমন ঢিলে ঢিলে করে দিয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই হাত বাড়ালেন তিনি, বললেন, প্রতিভা তুমি কাছে এসো।

আসব, খুব আসব। কিন্তু আজ আমাদের সব ভোলা দরকার, যত কালো যত কুৎসিত সব এই এক রাতের জন্য ঝেঁটিয়ে দূর করা দরকার। বলেই দ্রুত ওধারে গিয়ে কি যেন নিয়ে এলো সে। চোখ টান করে মহাদেববাবু দেখলেন, কাগজ আর কলম। বলল, এই নাও লেখো, ভয় কি. আমি তোমার খুব কাছে আসব যত কাছে চাও। কিন্তু তার আগে লেখো, কত টাকা তোমার লেখো, একটা করে অঙ্ক লেখো আর দেখো ঠিক ততগুলি করে জীবন হাহাকার করছে, লেখো আর দেখো, লেখো!

কলম তুলে নিলেন মহাদেববাবু, না দিয়ে যেন উপায় নেই প্রতিভা কি করে যেন তার সমস্ত শক্তি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। তাকে কাছে আনা দরকার, তাকে কাছে পাওয়া দরকার, তাকে বুকে টেনে নিতে না পারলে তিনি যেন আর দম পাচ্ছেন না! যত তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন তত যেন মঙ্গল, তত তাড়াতাড়ী বুঝি আশ্রয় মিলবে তার।

কাগজের ওপর কলম থমকে গেল তবু। চোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করলেন প্রতিভাকে। বারবার চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। আগ্রহ উত্তেজনা উদ্দীপনায় প্রতিভার সমস্ত চোখে, আরো চাপা গলায় হিস হিস করে বলছে সে। লেখো লেখো টাকার অঙ্ক বসাও আর জীবনের হাহাকার শোনো, দেখছ না, আজ আমরা দুজনে কিছু

একটা করব বলে ঘরের বাতাস স্তব্ধ থেমে আছে, আলোগুলো চেয়ে আছে। এই তো আমি কাছে এসেছি, ভয় কি, লেখো লেখো—

আচ্ছন্নের ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধের মত টাকার অঙ্ক বসাতে লাগলেন মহাদেববাবু।

দশ হাজার ····· বিশ হাজার · পঞ্চাশ হাজার ······এক লক্ষ ····· এক লক্ষ বিশ ······ দেড় লক্ষ ··· দু'লক্ষ·····

কানের কাছে হিস হিস করছে প্রতিভার কণ্ঠস্বর। লেখো থেমো না, লেখো আর মৃত্যু দেখো—কত মৃত্যু টাকার তলায় চাপা পড়ে আছে, দেখো!

আড়াই লক্ষ · তিন লক্ষ পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ···লেখো! লেখো! আমি আরো কাছে এসেছি, আরো অনেক কাছে আসব লেখো!

বার লক্ষ চোদ্দ লক্ষ···সতের লক্ষ বিশ লক্ষ····পঁচিশ লক্ষ····

লক্ষ লক্ষ লোকের আর্ত চিৎকারে কানে তালা লাগছে মহাদেব বাবুর, হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে চাইছে। ব্যাকুল নেত্রে প্রায় পার্শলগ্ন নির্মম রমণীর দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন তিনি।

লেখো লেখো লেখো!

···তিরিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ · পঞ্চাশ লক্ষ···

আর পারছেন না মহাদেব বাবু, আর পারছেন না এই আকাশ কাঁপানো লক্ষ লক্ষ লোকের আর্ত হাহাকার সহ্য করতে। ওই আর্ত রোলে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে নাকি।

লেখো লেখো! লেখো আর শোনো। এই দেখো আমি কত কাছে এসেছি, কত—কত কাছে এসেছি দেখো! লেখো! লেখো লেখো লেখো!

ষাট লক্ষ ·· সত্তর লক্ষ আশী লক্ষ

আর পারলেন না মহাদেব বাবু, বিভ্রান্ত'ই চোখ মেলে তাকালেন শুধু একবার।—হ্যাঁ প্রতিভা তাঁর কাছে—খুব কাছেই বটে। তার হাতের স্পর্শ পাচ্ছেন, ওই দুটো এবার আশ্রয় দেবে তাঁকে।

কলম পড়ে গেল। মাথাটা বিছানায় ঢলে পড়ল।

পরদিন দুটো মৃত্যুর খবর বেরুলো কাগজে "দক্ষিণ কলকাতার জনপ্রিয় সুপরিচিত ব্যবসায়ী মহাদেব সান্যালের শিক্ষিতা এবং সুন্দরী স্ত্রী প্রতিভা সান্যাল গতকাল বিকেল, আনুমানিক সাড়ে চারটেয়, তাঁদের কলকাতার বাসভবনে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত! আর ওইদিনই সন্ধ্যায় সাঁওতাল পরগণায় নিজ গৃহে শ্রীমহাদেব সান্যালের মৃত্যু অস্বাভাবিক না হলেও যোগাযোগের দিক থেকে বিচিত্র এবং বেদনাদায়ক। সন্ধ্যার পর অনুমান সাতটার সময় পরিচারক বৃন্দ শ্রীসান্যালকে তাঁর শয্যায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অবতরণ করে তাদের অগোচরেই তিনি সেখানে এসেছিলেন। তাঁর শয়ন ঘরের চাবিও তাঁর কাছেই ছিল। মৃত্যুর আগে তিনি সম্ভবত কোনো বৈষয়িক হিসাবে মগ্ন ছিলেন। কারণ, শয্যায় তাঁর লেখা লক্ষ লক্ষ টাকার অঙ্ক বসানো একটি দুর্বোধ্য হিসেবের কাগজ পাওয়া যায়। ডাক্তারের মতে শ্রীসান্যালের মৃত্যু অকস্মাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি জনিত।

॥ **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** ॥ আবাল্য শহর আশ্রিত লেখক জাত শিল্পীর কুশলতায় ও কারুকার্যে গল্প লেখেন। তিনি মূলতঃ জীবন প্রেমিক ও মানব প্রেমিক। তাই আশা নিরাশায় ভরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দলিল দস্তাবেজ তাঁর লেখায় মূর্ত্ত হয়ে উঠলেও বিষাদ চেতনায় মগ্ন মানব মানবীর অন্তিম উত্তরণ তাঁর লেখায় স্পষ্ট। তিনি আশাবাদী ও মানবতাবাদী। আশুতোষ বাবু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে হৃদয়ের অন্তর্লীন সংঘাত ও দ্বন্দ্বের যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও রহস্য উৎঘাটন করেন তা তাঁর ভৌতিক গল্পকেও এক মহৎ শিল্প কর্মে রূপান্তরিত করে। সংকলনে সন্নিবিষ্ট "বিকেল চারটের পটভূমি" তাঁর সার্থক ছোট গল্পের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আশুতোষ বাবু ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।



নন্দী খুড়ো

জরাসন্ধ

চন্দননগরের নন্দী খুড়ো নামজাদা লোক। খুড়োর আসল নামটা ছিল গোবর্ধন। কিন্তু খুড়ি থেকে আরম্ভ করে ও-পাড়ার পটলা পর্যন্ত সবাই ডাকে নন্দী খুড়ো। গ্রামের শেষে একটা পোড়ো ভিটে। চারদিকে কেবল তেঁতুল গাছ আর গাব গাছের জঙ্গল, তারই মধ্যে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—সেটাই ছিল নন্দী খুড়োর বাড়ি। মাথার সব চুল উঠে গেছে। দাড়ি গোঁফ কখনও গজায় নি। হাত পা গুলো কাঠির মতো। একটা লাঠি নিয়ে কেসে কেসে বুড়ো যখন খটাখট্ করে চলত, আমরা ভাবতাম, পিছন থেকে একটা ফু দিলেই খুড়ো একেবারে আকাশে উড়ে যাবে। লোকে বলত, 'তাই তো খুড়ো, এই বুড়ো বয়সে একা একা ঐ জঙ্গলটার মধ্যে পড়ে না থেকে গাঁয়ের ভেতর এসো না কেন?

খুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলত, কোথায় থাকব? বাড়িটা আকাশ থেকে পড়বে, না?'

সকলে বলত, 'বাড়ি না হয় আমরা দশজনে চাঁদা করে তুলে দেব।'

খুড়ো রুখে উঠেই, 'আহা-হা-হা, শখ দেখে আর বাঁচি না! গাঁয়ের মধ্যে বাড়ি করে দাও, তার মার সাত ব্যাটায় মিলে দু'বেলা তামাক টেনে দাও বুড়োটাকে ফতুর করে।' বলেই, সে লাঠি নিয়ে তাড়া করত।

খুড়োর ছেলে মেয়ে ছিল না। অনেক দিন আগে মেয়ে

হয়েছিল। বিয়ে দিতে টাকা লাগবে বলে তাকে খেতে দিত না। মেয়েটা শুকুতে শুকুতে মরে গিয়েছে। খুড়ীও যখন প্রায় মর মর, তখন একদিন বাপের বাড়ী চলে গিয়েছে, আর আসে নি। খুড়ো তো বেজায় খুশি। কেননা এলেই খরচ বাড়ে। খুড়োর খোরাক একবেলা শাক-ভাত একবেলা জল-সাগু। লোকে বলে, তার শোবার ঘরের মেঝেতে, সাতহাত মাটির নিচে সাত ঘড়া টাকা পোঁতা আছে। পাড়ার লোকেরা হাঁড়ি ফাটার ভয়ে খাবার আগে খুড়োর নাম করে না। তোমরা যখন এ গল্প পড়বে, রান্না হয়েছে কিনা জেনে তবে পড়ো। নৈলে বুঝতেই পারছ……

সেবার নন্দী খুড়োর বেজায় অসুখ। খুড়োর আনন্দ আর ধরেনা। ঐ একবেলা ভাতের খরচ তাও লাগবে না। এবার দু'বেলাই জলসাগু। কিন্তু তিন চার দিনেই অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। গাঁয়ের দু'একজন ভদ্রলোক গিয়ে বললেন, 'একজন ডাক্তার ডেকে আনি, কি বল ?

খুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরোও সব, বেরোও আমার বাড়ী থেকে। সাত ব্যাটা মিলে যুক্তি করে আমাকে ফতুর করতে এসেছে, না ?' বলেই খক্ খক্ করে কাশি। 'আমার সঙ্গে চালাকি ?' আবার খক্ খক্ খক্।

তারপর বুড়ো যখন প্রায় মর মর, তখন বুড়ীকে খবর দেওয়া হল। খুড়ী এসে দেখল, কাশির চোটে বুড়োর দম আটকায় আর কি। বলল, 'তুমি এখনও খক্ খক্ করছো, পোড়া যম কি তোমায় চোখে দেখে না ?'

খুড়ীর দিকে একবার চেয়ে' খুড়ো কাশির বেগে গজ্ গজ্ করে বলল, হ্যাঁ, আমি মরি, আর তোমরা সাত ব্যাটায় মিলে আমায় ফতুর করে দাও।'

খুড়ী তো অবাক। বলল, 'পোড়া কপাল! মরেই যদি গেলে, তারপরেও ফতুর হবার ভাবনা ?'

খুড়ো হাঁপাচ্ছিল, একটু দম নিয়ে বলল, 'থাম্, থাম্।'

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় নন্দী খুড়োর মৃত্যু হল। খুড়ী যাই

বলুক, তবু স্বামী তো? 'ওগো, আমার কি হবে গো!' বলে, একদিন একরাত কাঁদল।

পাড়ার লোকজন এসে বলল, 'আর কেঁদে কি হবে খুড়ী, খুড়ো যা কিছু রেখে গেছে, তার থেকে ওকে একটু জল দাও! বেচারী সারা জীবন না খেয়ে মরেছে, এবার একটু খেয়ে বাচুক।'

তারপর আমাদের সে কি স্ফূর্তি। লাঠি সোঁটা, কোদাল কুড়ুল যা যেখানে ছিল, সব জড় হল। গাঁয়ের সব ছেলে-বুড়োয় মিলে নন্দী খুড়োর পোড়ো বাড়ী খুঁড়তে শুরু করে দিলাম। প্রথমেই ঘরের মেঝে। কিন্তু একি হল! সাত হাত কেন, দশহাত গর্ত করে ঘড়া দূরের কথা, একটি ঘটিও মিলল না। সমস্ত লোক রুখে গেল। বাড়ীঘর কোদাল চলল। সারাদিন গেল, রাত হল। তারপর রাত যখন প্রায় দুপুর, বাড়ির এককোণে একটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় দমাদম কোদাল পড়ছে, হঠাৎ মাটির নিচ থেকে একটা ভীষণ গলায় গোঁ গোঁ শব্দ। সকলেই থমকে দাঁড়াল। এবার আবার সেই খক্ খক্ খক্ কাশির শব্দ। তারপর শোনা গেল, কে যেন নাকি-সুরে ঘড় ঘড় করে বলছে, 'আঁরে বাঁবা, মঁনে কঁরেছ, খুঁড়ো মঁরেছে, এঁবার সাঁত ব্যাঁটায় মিঁলে তাঁকে ফতুর কঁরবে? সেঁটি হঁচ্ছে নাঁ। রীতি মতো লাঁঠি নিয়ে এঁখনও দাঁত জাঁগাছি। আঁর এঁক কোঁপ দিঁয়েছ কিঁ মাঁথা কাঁটবে!' খক্ খক্ খক্।

তারপর এক মহামারী কাণ্ড! কোথায় গেল কোদাল কুড়ুল, আর কোথায় গেল লাঠি। বাবাগো! মাগো! বলে যে যেদিকে পারল উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল এবং ঘরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ খিল দিল।

সেইদিন থেকে গ্রামের কেউ আর সে-মুখোও হয় না। নন্দী খুড়ো তেঁতুল তলায় নির্বিবাদে পাহারা দেয়। এমনি করে বছর খানেক গেল। একদিন এক কাবুলিওয়ালা এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল, 'নন্দী খুড়ো কোথায় গিছে?'

ছেলেরা বলল, 'কেন?'

'বুড্ডা হামারা কাছে কাপ্‌ড়া লিছে। হামি দো-টাকা দো আনা পাবে।' সকলে হেসে উঠল, 'আর পেয়েছ তোমার দু টাকা দু আনা। সে বুড়ো মরে ভূত হয়ে তার টাকা আগলাচ্ছে। দেখে এসো না তেঁতুলতলায়।'

কাব্‌লি চটে উঠল, 'কেয়া, ভূত হুয়া? হামিও ভূত আছে হামি দেখে লিবে সে কেমন ভূত আছে!' বলে. লাঠি দেখালে।

সেই তেঁতুল গাছের গোড়ায় গিয়ে কাব্‌লি হাঁকল, 'হো নন্দী খুড়ো······নন্দী খুড়ো হো!'

কোনো সাড়া নেই। কাব্‌লি গলা চড়িয়ে লাঠি ঠুকে ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তেঁতুল গাছটা থর থর করে কেঁপে উঠল। তারপরেই বার কয়েক খক্ খক্ সঙ্গে সঙ্গে মাটির নিচ থেকে একটা মাথা উঠল, যেন প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ি। বড় বড় দুটি চোখ, আর কুলোর মতো দুটো কান তার নিচে সরু সরু দুখানা পা, আর কিছু নেই।

কাব্‌লি হেসে উঠল, 'তোমার হাত কোথা গিছে, খুড়োবাবু?

'দরকার নেই খা-সাহেব। এখন আর খেতে হয় না। মস খরচ বেঁচেছে। পা-ও যাচ্ছে। থাকবে কেবল চোখ আর কান পাহারা দিতে হলে ঐ দুটোই চাই। নৈলে সাত ব্যাটায় মিলে দেবে আমায় ফতুর করে।'

কাব্‌লি বলল, 'বেশ! বেশ! হামারা দো-টাকা দো-আনা আউর উস্‌কো সুদ···'

খুড়ো তাড়াতাড়ি বলল, 'সে সব তো ও জন্মের কথা। আমি তো আর বেঁচে নেই।'

এক কথায়, দু' কথায় লেগে গেল বিষম তর্ক। কাব্‌লি রেগে গিয়ে লাঠি নিয়ে নন্দী খুড়োর মাথার উপর মারল। কিন্তু কোথা খুড়ো? কোথাও কিছু নেই। খালি তেঁতুল গাছের উপর ভীষণ জোরে পড়ে গেল. আর মাটির নিচ থেকে ভাঙ্গা গলার হাসি গুম গুম করে মাটি কাঁপিয়ে তুলল :

কাব্‌লিও রাগে ফুলতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় এক মতল

ল। এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, 'ওঃ, তুমি ভূত আছে, হামিও ভূত হোবে!' বলে তার সেই প্রকাণ্ড পাগড়িটা খুলে গাছের ডালে টাঙিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ল। আমরা চিৎকার করে উঠলাম।

কাবলি গলায় দড়ি দিয়ে মরল। মড়াটাকে কোথায় নেওয়া যায় এ সব ভাবছি, হঠাৎ মাটির নিচে তুরুম তুরুম শব্দ!

একটা ভাঙা মোটা গলায় ক্রমাগত গর্জন করছে, 'রুপেয়া দেও—দো টাকা দো-আনা, আর সুদ।'

আর একটা সরু গলা ঘড় ঘড় করে বলছে, 'আহা রোসো না, একটু তামাক খাও!'

আবার সেই গর্জন, 'নেহি, আভি রূপেয়া দেও।'

হায়রে নন্দী খুড়ো! মরেও কাবলিওয়ালার দেনা এড়াবার উপায় নেই। শেষটা কি হল জানতে পারিনি। আমাদের দলের দু'জন যণ্ডা—ভুলো আর মোস্তা, হঠাৎ কি মনে করে দে ছুট্। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে কোনো রকম জান্ নিয়ে পালিয়ে বাঁচি।

॥ **জরাসন্ধ** ॥ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী) বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অভিনব এক কারা সাহিত্যের প্রবর্তনা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। ম্যাট্রিক হতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও সরকারী কাজে নিযুক্তি তাঁকে নিয়মিত সাহিত্যানুশীলনে পরাঙ্মুখ করেছিল। তবে কলেজ-জীবনেই বিচিত্রায় একাধিক গল্প লিখেছেন ও বিচিত্রা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথেপ্রবাসের সমকালে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেছেন। যৌবনে রামধনু, শিশুসাথী প্রভৃতি শিশু মাসিকেও নানা স্বাদের গল্প নিয়মিত লেখে গেছেন। চারুবাবুর "লৌহকপাট" অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কারা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে এক সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি কারাবাসীদের দেখেছেন। তাই কারা জীবনের সার্থক রূপকার হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই স্বনামধন্য লেখক ১৯৮১ সালে পরলোক গমন করেন।



সায়া আর ব্লাউজ

কুমারেশ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না। প্রথমত, কোথাও বেরুতে হলে, তখন কার কোষ্ঠ পরিস্কার হয়নি বলে তখনও পেট চাপড়াচ্ছে, কারোর বা দাড়ি কামানো হয় নি, কিংবা কারোর টেড়ি বাগাতেই সময় গেলো আধ ঘণ্টা। আর ততক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

তাছাড়া বেরিয়ে কোথাও কোন একটা জায়গা দেখে ভাল লাগলো সেখানে যে খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখবো তারও উপায় নেই, তখনই বন্ধু কনুইয়ের গোত্তা মারতে থাকবে, এখানে কী দেখবার আছে, চল্ চল্!

তাই সেবার কাউকে কিছু না বলে মানে বন্ধুদের না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লাম নিজের সাইকেলখানা নিয়ে। ইচ্ছে গ্রাম দেখবার। সবাই হিললি দিললি যায়, আমি চললাম আমাদের গ্রাম দেখতে গ্রাম চিনতে।

কিন্তু এখন বুঝচি, বন্ধুদের নিয়ে যাওয়ার উপকারিতাও কম নয়। সেই কথাই বলি—

এগ্রাম থেকে যে গ্রামে যাচ্চি, গ্রামের লোকদের সঙ্গে পরিচয় হচ্চে, গ্রামের দুরবস্থা দেখচি গ্রামের হাটে কোন দোকানে কিছু খেয়ে নিচ্চি সেই দোকানে বা কারোর বাড়ির বাইরের ঘরে বা বারান্দায় রাতটা কাটিয়ে দিচ্চি এভাবে বেশ দুটো দিন কেটে গেলো।

তৃতীয় দিনে দুপুরে এক দোকানে খেয়ে নিয়ে এক বটগাছ তলায় সাইকেলটা রেখে একঘুম ঘুমিয়ে নিলাম, পরে রওনা হলাম সামনের গ্রামে যাবার জন্য। শুনলাম গ্রামটির নাম হরিশচন্দ্রপুর। এককালে খুব বর্দ্ধিষ্ণুগ্রাম ছিল। গ্রামটায় যেতে একটা বিরাট মাঠ পার হতে হয়। তবে কাঁচা আকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে কোন রকমে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া গেল। খানিক দূর যাবার পরই দেখি আকাশের কোনে মেঘ জমা হয়েচে আর সেই মেঘ অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশ ছেয়ে ফেললো। সূর্য ডোবার আগেই মেঘে আড়াল পড়ে গেল ঘোর অন্ধকার হয়ে এলো চারিদিকটায় আর শুরু হলো মুষল ধারায় বৃষ্টি। হাত ঘড়িটা দেখলাম সন্ধ্যা হতে তখন দেরি। ঘড়িটা রুমাল দিয়ে ঢেকে বেঁধে নিলাম সাইকেল থেকে নেমে। নিজে ভিজি ক্ষতি নেই. দামী ঘড়িটি তো বাঁচুক। সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগলো, আর বুঝলাম ভেজা ছাড়া কোন উপায় নেই। কাছাকাছি একটি গাছও চোখে পড়লো না অন্ধকারে। কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকতে লাগলো। আর হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কোন রকম পথটি দেখতে পেলাম।

কিন্তু মুস্কিল হলো সাইকেলে উঠতে গিয়ে দেখি সাইকেল চলে না। চাকায় কাদা জমে গিয়ে মাডগার্ডে লাগচে। চাকাই ঘুরতে চায় না। কাঁচা পথ কাদা মাখামাখি। অগত্যা সাইকেল-টাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললাম। জলের ছাঁট লাগচে তীরের মত। কাজেই মাথা হেঁট করে এগুতে লাগলাম।

কতক্ষণ এভাবে চলেছিলাম মনে নেই। তবে খুব জোরেই চলছিলাম। হঠাৎ একখানা বিজলী আলোতে মুখ তুলে চাইতেই মনে হলো একটু দূরেই যেন একটা বাড়ি। ভাঙ্গা বাড়ি। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেলটাকে টানতে টানতে সেই দিকই এগোতে লাগলাম।

হ্যাঁ, একটি বাড়িই বটে। জঙ্গলে ভর্তি। আর এক বিজলীর আলোতে দেখলাম তার দরজা জানলার কাঠের ফ্রেম একটাও

নেই আর সামনে একটা বারান্দা। সাইকেল নিয়ে উঠে পড়লাম বারান্দায়।

বাড়িতে কেউ আছে নাকি? কে জানে? হাঁক দিলাম কেউ আছেন? উত্তর পেলাম না। হয়তো সাপ টাপ থাকতে পারে। তারা তো আর উত্তর দেবেনা। সুবিধে পেলে যমের দক্ষিণ দরজায় পাঠিয়ে দেবে।

পকেট থেকে টর্চটা বার করলাম। বারান্দায় লাগোয়া ঘরটার মধ্যে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিলাম চার দিকটা। খালি ঘর। এক কোনে মেঝেতে একটি ভাঙ্গা টিনের বাক্স, একটি মাটির হাঁড়ি আর খানিকটা নারকেলের দড়ি, গায়ের প্যান্ট স্যার্ট জলে ভিজে সপ্ সপ করছিলো। ঘরে ঢুকে টর্চটা নিভিয়ে গায়ের ভিজে সার্ট প্যান্ট খুলে ফেললাম। গেঞ্জিটাও। পরনে রইলো শুধু আণ্ডারওয়্যার। ওটা খুললেও অসুবিধে ছিলো না। পায়ের জুতোও কাদায় ভারি হয়ে গেছে। জুতোর তলাকার কাদা চেঁচে ফেলা দরকার, নইলে চলা দায়। জলে ভিজে গিয়ে শীতে গা হাত পা কাঁপছিলো। আহা যদি একটু আগুন পাওয়া যেতো! পকেটে দেয়াশলাই তো আছে।

কিন্তু শুকনো কোন কিছু তো নেই যে ধরাবো। আগুন করবো। হঠাৎ মনে হলো পকেটে সিগ্রেট তো আছে। ধরাই একটু গরম হওয়া যাবে। হায় ভগবান সিগ্রেট বার করে দেখি। সব ভিজে গেচে। তাই চেষ্টা করলাম ধরাতে, ধরলো না। যাকগে'

প্যাণ্ট সার্ট নিংড়ে ভাঙ্গা বাক্সটির উপর রাখলাম। হাতে বাঁধা রুমালটা খুলে তাই দিয়ে মাথা গা মুছে টর্চটা জ্বালিয়ে হাত ঘড়িটা দেখলাম সন্ধ্যা সাড়েছটা। অথচ মনে হচ্চে কত না রাত। চারিদিক অন্ধকার বাইরে সেই ঝমঝম বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। ঘরের মধ্যেও জলের ছাঁট আসছে মাঝে মাঝে।

বৃষ্টিটা একটু থামলেই হয়। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এখানে এভাবে থাকা ঠিক নয়। পুরোণ বাড়ি। ছাদ

ভেঙে মাথায় পড়তে পারে বা সাপের কামড়ে অক্কা পাওয়াও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ একটা শব্দ এলো কানে। মনে হল দরজা খোলার শব্দ। দরজার পাল্লার কবজায় তেল না থাকলে যেমন, ক্যাঁ-য়া-চ শব্দ হয় তেমনি। শব্দটি এলো এই ঘরেরই বাড়ির ভেতর দিকটা থেকে। অথচ তাতে কোন ফ্রেম বা পাল্লাই নেই। তবে কী ভুল শুনলাম। না বাইরের ঘরের শব্দ হাতের টর্চটা উচিয়ে ধরলাম ভেতর বাড়ির দরজার দিকে দিকে না, তেমনি ফাঁকা।

এমন সময় মনে হলো, ঐ দরজার ওপাশ থেকে একটা যেন ছায়া সরে গেলো। তাড়াতাড়ি টর্চটা আবার উঁচিয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু হাতটা হঠাৎ যেন আটকা হয়ে গেলো। টর্চটা পড়ে গেল হাত থেকে। নিভে গেলো সেটা। মনে ভয় হলো। গা ছমছম করতে লাগলো। ঘর থেকে বাইরের বারান্দার বেরোবার জন্য পা বাড়াতেই দেখি হাঁটু দুটোও কাঁপচে। পায়ে এগোতে পারচিনা। আর মনে হচ্চে কে যেন আমাকে টেনে ধরে রেখেচে। আমি চেঁচাতে গেলাম কিন্তু কই আমার গলা দিয়ে তো তেমন আওয়াজ বেরুচ্চে না। কি হলো? কেবল বোবা শব্দ কানে এল।

হঠাৎ ঐ অন্ধকারেই দেখতে পেলাম ঘরের কড়ি কাঠ হতে ঝুলতে ঝুলতে ঐ ভেতর বাড়ির ঘরের দরজা দিয়ে একটা সাদা ব্লাউজ আর একটা সাদা সায়া ঢুকলো আমার ঘরের মধ্যে। যেন কেউ পরে আছে। অথচ তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না স্পষ্ট করে। কিন্তু আমার দিকেই যেন এগিয়ে আসছে ঐ সায়া আর ব্লাউজ। সায়ার দড়িটা একটু ঢিলে, ব্লাউজের বোতামগুলো প্রায় খোলা আমি ভয়ে পেছিয়ে যেতে গেলাম, পারলাম না বসে পড়লাম।

একি! সায়া আর ব্লাউজটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো গুটিয়ে গেলো সবকিছু! আমার কানের কাছে কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস! মেয়েলী দীর্ঘশ্বাস! সায়া ব্লাউজে মেয়েলী গন্ধ।

আমার তখন প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা!

এমন সময় কে যেন আমাকে এক ধাক্কা মারলো।

আমি হুড়মুড় করে একটু হামাগুড়ি দিয়েই উঠে সদর দরজা বেরিয়েই দৌড়তে লাগলাম…

তারপর আর জানিনে, অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

জ্ঞান হলো যখন, তখন কোন এক গ্রামের হাটে এক দোকানের চৌকিতে শুয়ে। ঘরে একটি হ্যারিকেনের আলো। আমার চার পাশে চার পাঁচজন লোক। আমার পরনে সেই আণ্ডার ওয়্যারটা শুধু।

আমি চোখ মিলতেই তারা বলে উঠলো জ্ঞান হয়েছে জ্ঞান হয়েচে। যাক বাঁচা গেল।

তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন আপনি ওখানে গেছিলেন কেন? ওটা ভূতের বাড়ি, বিশ্বাস বাড়ি। ওখানে অবিশ্বাস্য কিছু দেখেচেন নিশ্চয়ই।

আমি সব কথা খুলে বললাম।

তখন একজন হেসে বললেন ঐসব দেখে বুঝলেন কিছু?

—না'

একজন বললেন আচ্ছা, এই গরম দুধটুকু খেয়েনিন। এই ধুতিটা পড়ুন আঁচলটা গায়ে জরিয়ে নিন বলচি আপনাকে। আর কখনো ওপথ দিয়ে হাঁটবেন না।

—আবার!

ভাগ্যিস আমাদের রমেশ আর গৌর আপনাকে দেখতে পেলো মাঠের মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

ধুতি পরে গরম দুধটা খেয়ে নিলাম। বললাম, বলুন তো ব্যাপার কি!

ভদ্রলোক বললেন। ওটা রতি বিশ্বাসের বাড়ি। তার কোন ছেলে পুলে ছিলো না। সে আর তার স্ত্রী। আর তার কাছে থাকতো তার বিধবা যুবতী বোন। রতি বিশ্বাসের স্ত্রী মারা যাবার পর ঐ বোনই রতির দেখা শোনা করতো। কাজের জন্য রতিকে

অনেক সময় বাইরে যেতে হতো, রাত্রেও ফিরতে পারতো না। এক দিন রাত্রে ঐ সময় তার ঐ বোন ঐ বাইরের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে কড়ি কাঠে ঝুলে আত্মহত্যা করে। কোন এক মামাত ভগ্নীপতির সাথে তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা নিয়ে গ্রামে রটনা রটে। একে গ্রাম দেশ। তার উপর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মনের বিধবা মেয়ে। সহ্য করতে পারলো না। তারপর তারপর থেকেই ঐ বাড়ীতে ঐ কাণ্ড চলেছে। অতৃপ্ত আকাঙ্কা নিয়ে সে ফিরে ফিরে আসে···

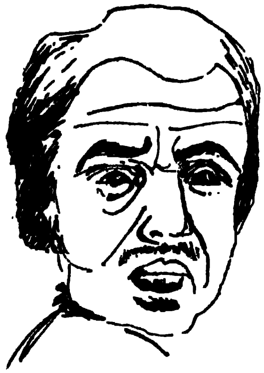
জিগ্যেস করলাম আর তার সেই মামাত ভগ্নপতি ?

—সে পালিয়ে বেঁচেছিলো।

বললাম, ওঃ আমিও খুব বেঁচে গেচি।

সত্যিই বেঁচে পালিয়ে এলাম কোন রকমে। আমার যে সাইকেল সার্ট প্যাণ্ট টর্চ সেখানে আজও হয়তো পড়ে আছে কিনা জানিনে। যদি কারোর সাহস আর ইচ্ছা থাকে তবে সেখানে গিয়ে সেসব নিয়ে নিতে পারেন। তার সাহসের পুরস্কার বলেই মনে করবো। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে কল্যানপুর ষ্টেশনে নেমে মাইল পাঁচেক উত্তরে গিয়ে গ্রামটির নাম করলেই বিশ্বাস বাড়ি খুঁজে পাবেন।

॥ **কুমারেশ ঘোষ** ॥ বর্তমানে লেখক পূর্ব কলিকাতাবাসী একজন সফল ব্যবসায়ী ও সার্থক সাহিত্য কর্মী। তবে লেখক বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবন যাত্রার আর্তনাদের মধ্যেও হাস্য পরিহাসের লঘু চপল বাক্যের বিদ্যুৎচ্ছটায় আমাদের আলোকিত করেছেন। যে কয়জন সাহিত্য সেবী জীবনভোর হাসির কারবারী কুমারেশ বাবু তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "যষ্ঠিমধু" সাময়িকী সমসাময়িক কালের একমাত্র হাস্যমধুর রসাপ্লুত পত্রিকা। গ্রন্থে উল্লিখিত গল্পটি লেখকের একটি অন্য স্বাদের গল্পের উদাহরণ। অলৌকিক ভৌতিক গল্পের রহস্য ঘন পরিবেশ সৃষ্টিতেও তিনি সমানভাবে পারদর্শী। লেখক ১৯১৬ সালে অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় জন্ম গ্রহন করেন।



দূরের জানলা

আশা দেবী

রাতটা যেন কেমন নিশুতি। বোধহয় শীতের রাত তাই রাস্তা ঘাট এত তাড়াতাড়ি নিরালা হয়ে গেছে! শুভঙ্কর একবার দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকালো। ওঃ, আজ ঘড়িটায় চাবি পড়েনি, তাই বন্ধ হয়ে গেছে। আর পুরোনোও হয়েছে ঘড়িটা এবার ওকে পেনসন দিতে হবে। শুভঙ্কর মনে মনে ভাবলো।

ও একা থাকে। হাওয়া বদলাতে এসেছে এখানে সে আজ চারদিন হলো। হাওয়া বদল? নিজের মনকে সে বার বার বোঝাতে লাগলো জানলার কাছে বসে।—হ্যাঁ, তাই বইকী নইলে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে এভাবে এখানে এলে বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়-স্বজন—দাদা—?—বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে নিজের মনে মনেই বললে হ্যাঁ দাদা কী ভাবতেন কে জানে।

দাদা দীপঙ্কর রাশ ভারি লোক। মা বাবা মরা ছোট ভাইটিকে অত্যন্ত যত্নেই তিনি মানুষ করেছিলেন। কিন্তু সব যেন কী হয়ে গেল।

জানলার কাছে বসে শুভঙ্কর আকাশ দেখতে লাগলো। রাত বোধহয় বেশ গভীর হয়েছে। অসংখ্য হীরের কুচিতে ভরা আকাশের বুকে কালপুরুষের উজ্জ্বল মূর্তিতে আকাশ ভরে রয়েছে। দূরে দূরে গাছের শ্রেণী কালো আকাশের ওপর ক্রেয়নে আঁকা ছবি।

বাড়ীগুলো কাছে দূরে।—এরই মধ্যে সামনে একটা বিরাট ন'তলা বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘুমন্ত বাসিন্দার নীরবতা যেন বাতাসকে ভারি করে তুলেছে।

ডিসেম্বরের রাত আরো গভীর হচ্ছে। গাছের ডালে ডালে রাতের অতিথি পাখীরা পাখা ঝাড়ছে। সুখের নীড়ে কেউ কেউ বা প্রিয় দয়িত নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখছে।

একটা পেঁচার বাচ্চা কেঁদে উঠলো। একটা বাদুর পাখা ঝাপটে উড়ে গেল। কারা যেন সাপের মত হিস্ হিস্ করছে।

আর তখনি দূরের আকাশের গায়ের ছোট্ট জানলাটা খুলে গেল। কে যেন আলো জ্বাললো। তার হাতের শাঁখা আর নতুন চুড়ির ঝিলিক বিজলীর আলোয় জ্বলে উঠলো। শুভঙ্কর খাটের বাজু ধরে পাথরের মত বসে রইলো। কে যেন সেই আলোর পথ বেয়ে সোজা তার গরাদহীন জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো। শুভ—সে ফিস ফিস করে ডাকলো।

খাটের বাজুর ওপর রাখা মাথাটা তুললো না শুভঙ্কর। শুধু অন্ধকারে উপলব্ধি করতে লাগলো কেউ এসে তার গরাদহীন জানলার পাশে দাঁড়িয়েছে। তার চুলের সৌরভ, নতুন শাড়ীর গন্ধ, চুড়ি আর শাঁখার আওয়াজ তাকে দ্বিতীয় একটি সত্তার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিলো।

ঃ শুভ আমি রীতা। আজ আর তোমার বৌদি নই। তোমার ক্লাস মেট।

ঃ তুমি যাও—যাও রীতা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমাকে কী বাঁচতে দিতে চাও না।

কেন চাইব না। আমি তোমাকে ভালবাসি। দোষ তোমার দাদার। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসে নিজে বিয়ে করে বসলেন। ছিঃ, রীতা সুন্দর ভুরু দুটো বোধ করি কুচকে বিরক্তি প্রকাশ করলো। অন্ধকারে দেখা গেল না। কিন্তু শুভঙ্করের সামনে ছবিটা ভেসে উঠলো রীতার।

কলেজের সামনে টানা পথটা ধরে চলেছে ওরা। কখনও আগে

পরে কখনও পাশাপাশি : রীতা এবারই আমাদের কলেজ জীবনের সমাপ্তি। তারপর ?

রীতা সুন্দর ভুরু দুটো একসঙ্গে করলো। এটা যেন ওর একটা মুদ্রাদোষ : কেন ? বিয়ে করবো তোমাকে। —হ্যাঁ, এর মধ্যে আর কিন্তুর কি আছে। আমার বাবা মা নেই। মামার বাড়িতে আশ্রিত। তোমারও তাই—

: 'প্রায় তাই' শুভঙ্কর চটে উঠলো। দাদার কাছে থাকা আর মামার আশ্রয়ে থাকা এক হলো।—

আবার সেই যুগল ভ্রূভঙ্গি করে রীতা বললে : আচ্ছা মশায় আচ্ছা। তুমি তোমার দাদার কাছে খুব খোসমেজাজে আছ। কিন্তু আর যদি বিয়েতে দেরী কর তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে। —চমকে উঠলো শুভঙ্কর।

এই শুভ! ভাবছো কি—? কথার উত্তর দাও। কেন তুমি আমার ওপর সব দাবী ছেড়ে দিলে। যদি ছেড়েই দিলে তবে বৌদি বলে কেন মেনে নিতে পারলে না। আর—?

রীতা একটু থামলো। —তুমি তুমি—শুভঙ্কর উঠে বসলো জ্যা মুক্ত তীরের মত লক্ষ্য স্থির করে বললো : আর কী!—

: আমাকে খুন করলে কেন ?

বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন স্থির আকাশটা অস্থির হয়ে উঠল। রাতের তারারা কানাকানি শুরু করলো আর কালপুরুষের অসি ঝলকে উঠলো কালো আকাশের গায়ে।

প্যাঁচার বাচ্ছাটার কান্নাটা থেমে গেল। পাখির নীড়ে ভয়ের ছায়া নামলো। ঘরের লণ্ঠনটা দপ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে নিভে গেল। আর যে এসেছিল সে ছুটে পালালো দূরে বহুদূরে সেই আলোর পথ বেয়ে দূরের জানালার পথে। চমকে জেগে উঠলো শুভঙ্কর। ঘামে ওর সারা শরীর ভিজে গেছে। —সকালের আলোয় সারা ঘর ভরে গেছে। সামনের ন'তালা বাড়িটার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কর্মচঞ্চলা। ছাদের চিলে কোঠর জানলাটা ঠিক যেমন বন্ধ ছিল তেমনিই আছে।—তবে এমন স্বপ্ন সে দেখল

কেন? শুভঙ্কর বার বার নিজের মনকে বোঝাতে লাগলো। এ কিছু নয় স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন—ছায়ার খেলা মাত্র। বোধহয় সারা রাত ওই ন'তলা বাড়ির চিলে কোঠায় কে যেন একশো পাওয়া-রের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। সামনের খোলা জানালা দিয়ে ঘুমের ঘোরে যে স্বপ্ন তার চোখে ঘনিয়ে এসেছিল তার উৎসব ওই দূরের জানলার আলোটা।

হয়তো বা!—

শুভঙ্কর ভাবতে চেষ্টা করলো: এমন স্বপ্ন সে কেন দেখে? বাইরের বারান্দার ডেক চেয়ারটার ওপর বসে বসে সে ভাবতে লাগলো।

: কাল রাতে এত চেঁচাচ্ছিলেন কেন?

পাশের ঘরের প্রতিবেশী ডাঃ বোস জিজ্ঞেস করলেন।

: চেঁচাচ্ছিলাম? কই না তো! উঠনের ওপরে ঘুরে ঘুরে কাকেরা কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুভঙ্কর বললো। না—চেঁচাব কেন?

ডাঃ বোস বললেন: ঘুমের মধ্যে চেঁচায়, কথা বলে এমন লোক অনেক আছে। কিন্তু—

তার গলার আওয়াজে এমন কিছু ছিল যা শোনা মাত্রই শুভঙ্কর চমকে উঠলো।—'কিন্তু' বললেন কেন?

ডাঃ বোস হাসলেন: বললাম এমনি। আপনি অসুস্থ। অকারণে এমন উত্তেজিত হবেন না। ওতে ক্ষতি করবে।

: না—না। উত্তেজিত হবো কেন?—রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মাথাটা ভারি ঝিম ঝিম করছে। ক্লান্তি আর অবসাদ আমার শরীর থেকে কাটতে চাইছে না।

: তা হয় বটে। রাতে না ঘুমুলে শরীরের গ্লানি আর অবসাদ সারাদিনেও কাটতে চায় না। ঠিক এমনি একটি আত্মীয় রুগী আমি পেয়েছিলাম গত বছর মার্চ মাসের শেষ দিকে। আমি ব্যাচেলার মানুষ। তাতে ডাক্তার। উনি আমার বাড়ির পাশের

ঘরখানাই আমার কাছ থেকে ভাড়া নিলেন। তার কথাই বলছি।—

: একটু চা খাবেন? শুভঙ্কর বললে। : না থাক! এবার ডাঃ বোস উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কথা বলতে লাগলেন তিনি। আমার এক দূর সম্পর্কীয় বোনের একটা রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন আমি তাদের মফঃস্বলের বাড়িতে তখন সব শেষ হয়ে গেছে। আমার বোনের যে বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল তারা দুই ভাই, তাদের মা বাবা ছিলেন না। বড় ভাই, অপত্যস্নেহে ছোট ভাইকে মানুষ করেছিলো। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড ভুল তিনি করে বসলেন। প্রথমে নিজে বিয়ে করবেন না বলেই স্থির ছিল কিন্তু কি যে হলো তাঁর ছোট ভাই-এর বিয়ে ঠিক করতে গিয়ে নিজেই সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে বসলেন।

: তাই নাকি! শুভঙ্কর যেন কেমন ব্যতিব্যস্তভাবে বললো। খানিকক্ষণ ডাঃ বোস শুভঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন কী দেখতে লাগলো। তারপর বললো: বিয়ের সময় ছোট ভাই কিছুই বলেননি।—

: কেন? —শুভঙ্কর তীব্র স্বরে জানতে চাইলো:

: মানুষ যাকে একান্তভাবে ভালবাসে তার ওপর অভিমানও নিদারুণ। তাই হয়তো অভিমানে কিছু বলেনি।

: মেয়েটি তা প্রতিবাদ করতে পারতো বিকৃতগলায় শুভঙ্কর বললো।

: মামার বাড়ি অনাদরে পালিতা কন্যাটির বলার সুযোগই বা কোথায় ছিল? আর কে-ই বা তার কথা শুনতো। তাই প্রায় জোর করে একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটি যে রাতে খুন হলো তারপরই তার দেওর পলাতক। শুভঙ্কর উঠে দাঁড়ালো; তার হাত পা যেন কেমন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে সে এখুনি পড়ে যাবে। ডাঃ বোস তাকে ধরে ফেললেন। হেসে বললেন: আরে এ এক রুগীর গল্প—এমন কত রুগী তো আমাদের চোখে পড়ে।—কিন্তু আপনি এমন করছেন

ন? আপনি অসুস্থ শুয়ে পড়ুন। বিশ্রাম করুন আমি যাই। একটু ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাঃ বোস বললেন।

: আপনি যান আমি একটু ঘুমাবো। শুভঙ্কর ক্লান্ত গলায় লো।—আমার আর এ সব গল্প শুনতে ভাল লাগে না। যান—যান।

—যখন শুভঙ্করের ঘুম ভাঙলো তখন গভীর রাত। একবার বিছানায় শুয়েই খোলা দরজার দিকে তাকালো। ক্লান্তি আর সাদে উঠে আর দরজাটা তার বন্ধ করতে ইচ্ছাকরলো না। নিকটা বিছানায় পড়ে থেকে সে খোলা জানলা দিয়ে দূরের চিলে ঠার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলো তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে।

দূরের সেই ন'তলা বাড়ির জানালাটা খুলে গেল। ঘরের লোটা প্রেতের চোখের মত দপ দপ করে জ্বলে উঠলো। মাইলের মাইল ব্যাপী একটা দামাল হাওয়া জানালা দিয়ে সে আলোর াকে ঘরে নিয়ে এল। আশেপাশের শর-বিল্লার বনে মর্মর নি উঠলো। চারিদিকের ঘনীভূত প্রশান্তি ছিঁড়ে যেন খান খান র দিয়ে একটা পাখি চিৎকার করে উঠলো। শুভঙ্কর শুনতে ল শাড়ির খস্ খস্ শব্দ, সোনার চুড়ির টিন্ টিন্ আওয়াজ আর র সঙ্গে রীতার গায়ের পরিচিত গন্ধ।

: শুভ?—তুমি আমায় হত্যা করে নিজের কাছে ফেঁসে গেছ। খিল করে হেসে উঠলো রীতা। আমাকে একা পেয়ে চার-ার ছাদ থেকে ধাক্কে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছ এখানে। াই জানে তুমি হাওয়া বদলাতে এসেছ। কিন্তু আমি জানি মিথ্যে—।—সব বাজে কথা।

: রীতা? —শুভঙ্কর চিৎকার করে উঠলো। আমি অসুস্থ। মি তোমায় মারিনি, তুমি আমাকে তোমার হাত থেকে মুক্তি ও।—আমায় দয়া কর।

: না, তা হয় না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। মার দাদা তোমাকে ক্ষমা করলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। —এস—এস আমার সঙ্গে। রীতা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে

চললো আগে আগে। বাড়িটার পিছনে পচা মজা একটা ডোবা। তার দু'পাশে ফণিমনসার বন। তিন চারটে আমড়া গাছে ছায়ায় জায়গাটার অন্ধকার আরো গাঢ়। দূরে একটা পোড়ো ভিটে। তাতে পোড়ো ইঁট কাঠ আর সাপের আস্তানা। সেই শ্যাওলা পড়ে পড়ে সবুজ বর্ণ বিন্যাস ঘন জঙ্গলের পথে ডোবায় গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেইখানে এসেই শুভঙ্করের একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল উঃ কিসে কামড়ালো। জ্বলে গেল।

ভাঙ্গা খাটালের ফাটলে সেখানে প্রচুর ঘাস আর কন্টিকারীর বেগুনী ফুল ফুটেছে অসংখ্য। সকালের রোদে প্রাতঃভ্রমনে এসে ডাঃ বোস দেখলেন শুভঙ্কর সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ক্ষতটা সাপের কামড়ের। মানসিক রোগগ্রস্ত রুগীর এটা স্বাভাবিক পরিণাম না বিবেকের দংশনের রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির এটা শেষ অধ্যায় ভাবতে চেষ্টা করলেন ডাঃ বোস।

।। আশা দেবী ।। বর্তমানে লেখিকা দক্ষিণ কলিকাতার গোলপার্কে পঞ্চানন তলা লেনের বাসিন্দা। প্রখ্যাত কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহচর্য ও দাম্পত্য স্নেহছায়ায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত লেখিকার সাহিত্য ও সারস্বত সাধনায় সাফল্য আনন্দের। বাংলা ছোট গল্পের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ প্রভৃতি সাময়িকীর পাতায় মাঝে মাঝেই যাঁর লেখা আমাদের চমকিত করে, চমৎকৃত করে তিনি হচ্ছেন আশা দেবী। কামিনী রায়, অনুরূপা দেবী, মান কুমারী বসু থেকে যে ধারার প্রবর্তনা পরবর্তী কালে আশা পূর্ণা দেবী, বাণী রায়, মহাশ্বেতা ও আশা দেবীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তার অগ্রগমন নিঃসন্দেহে আনন্দের।



মানুষমারির টঁ্যাক

শক্তিপদ রাজগুরু

শিরবাওয়ালি ইরফান খাঁ চমকে ওঠে গলুইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ওদিকে ঝপ্ ঝপ্ করে চারটে দাঁড় ফেলছিল মাঝিদের দল, তারাও সামনের দিগন্তপ্রসারী গাংয়ের বিকট রূপ দেখে শিউরে উঠেছে।

ইরফান খাঁ বলে—এ কোথায় এলিরে? সামনে ওই মাতাল বিস্তার গাং পাড়ি দেবার যো নাই, শেষকালে এই মানুষমারির টঁ্যাকে এনে ফেললি ভর সাঁঝের বেলায়? পাঁচপীরের নাম নিই ছিট নোঙর ফেল বদরু। মহাজনেরে ডাক ছইয়ের মধ্যি থেকে।

ডাকতে হয় না, গদাধর সাঁতরা সুন্দরবনের বহুকালের কাঠ মহাজন। বহু দিনরাত কেটেছে এই গহন গাং আর গহিন বনের গভীরে। এখানের গাংয়ের মর্জি-মেজাজ চেনে; বনের হাল-চাল দেখে বলতে পারে বড়শিয়ালের খবর। ডাকাতদলের আনাগোনার হিসেব তার নখদর্পণে। আকাশের কোলে এক-

চিলতে কালো মেঘ কখন সারা আকাশ ছেয়ে ঝড়ের দাপট হানবে তাও জানে সে। তাই ছুইয়ের মধ্যে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। ক'দিন ধকল গেছে জঙ্গলে। কয়েকটা হাজারী দুহাজারী নৌকায় গেঁও গরাণ পশুর কাঠ বোঝাই করিয়ে তাদের শহরের গদির দিকে রওনা করিয়ে একটু নিশ্চিন্ত মনে ফিরছিল গঞ্জের দিকে দু গোনের পথ তবু সোজা গাংয়ে পাড়ি দেবার জন্যই এই বড় নদী ধরেছিল। তখন ভাবেনি যে সমুদ্রের মোহনার মুখে এমনি মারমুখী হয়ে উঠবে গাং। ওদিকে সমুদ্রের বালুচর, বিস্তীর্ণ রূপালী বালির বিস্তার, বেশ খানিকটা ফাঁকা, তারপরই শুরু হয়েছে গভীর বন। এখানের বনের কুখ্যাতি আছে। ওদিকেই চামটা পাশে মায়াদ্বীপ, হরিণও অনেক, বাঘও তাই ঘোরাফের করে এখানে।

বড় খালটা থেকে বড় নদীর দিকে চলেছে গদাধর সাঁতরার চারমাল্লাই বেতনাই নৌকাখানা। হঠাৎ নৌকার বেপট দুলুনি দেখে সাঁতরামশাই বের হয়ে সামনে ওই মারমুখো গাং দেখে চমকে ওঠে।

—এ কি চেহারা রে ?

নীল জলের মাথায় ঠেলে উঠছে বড় বড় ঢেউয়ের পাহাড় ঢেউগুলো ফুঁসছে। ওদের বুক থেকে সগর্জনে যেন ফণা তুলেছে হাজার নাগিনীর দল। ঢেউ ফাটছে, সাদা ফেনার লহর নিয়ে ছিটকে পড়া জলরাশি তীরভূমিকে হাজারো ফণার ছোবল মারে। বাতাসে ওঠে মত্ত গর্জন। দূরে ওই ঢেউ-ভাঙা জলের উপর ওপারের তীরভূমির ক্ষীণতম সবুজ আভাস আবছা দেখা যায়। ও যেন তাদের নাগালের বাইরে, ওখানে পৌঁছবার সাধ্য নেই। এদিকে সমুদ্রের অসীম শূন্যতা। এই বিশাল দিগন্তের উন্মত্তরূপের অতলে ওরা যেন যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। নৌকাখানা টলছে মাতালের মত। ভাঁটার টানে ওই ভেসে গিয়ে এখুনি ওই মত্ত ঢেউয়ের মাঝে পড়ে প্রচণ্ড আঘাতে খান্ খান্ হয়ে যাবে।

ইরফান আলির সারা দেহের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

বড় হালের শিরানি ধরে বলিষ্ঠ হাতে মোচড় দিয়ে নৌকাটাকে মোড় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে গর্জে ওঠে—দাঁড় ফেল, ঝিঁকেয় মার শালোরা, মজা দেখছিস নাকি? ওই তুফানে পড়লি কোন বাপ ঠেকাইবো।

রুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে সাঁতরা মশাই, মনে হয় ওই হালের কসিগুলোর প্রতিটি ইঞ্চি যেন সজাগ হয়ে উঠেছে, থর-থরিয়ে কাঁপছে নৌকাখানা। একদিকে ওই নির্মম নদীর লোলুপ আক্রমণ, অন্যদিকে ক'টি মানুষের এই সংগ্রাম চলছে। মৃত্যু! অতল জলের বুকে বার কয়েক মোচার খোলার মত কাঁপবে নৌকাখানা, বেবশ নৌকার উপর আছড়ে পড়বে একটা ঢেউ নীল জলের পাহাড় নিয়ে, তলিয়ে যাবে তারা। গদাধর সাঁতরা ওর চোখের সামনে সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখেছে।

—সাঁতরামশাই গ। অ মহাজন। ডাকছে ইরফান খাঁ। সারা গা ওর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। মাঝিগুলোর দাঁড় ফেলার শব্দ ওঠে না। সাঁতরামশাই চাইল ওর ডাকে। ইরফান বলে—বড় নদীর মুখ থেকে সরে এসে সমুদ্রের দিকেই ছিট নোঙর করেছি মালিক। এখানে তুফান কম। খালের দিকে এলাম।

গদাধর সাঁতরা ক্রমশঃ অনুভব করে যে সে মরে নি। নৌকাখানাও ডোবেনি। কোনমতে ওই দুর্বার গাংয়ের বুক থেকে বেঁচে এসে এই খালের ধারে আশ্রয় নিয়েছে। ওদিকে সমুদ্রের বালিয়াড়ি—এখানে তবু কিছুটা শান্ত। ইরফান খাঁ যেন সান্ত্বনা দেয় তাকে—কাল বিহানে তুফান থাকবে না, সকালের জোয়ারে পাউড়ি দোব।

…এক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে এসেছে তারা যেখানে, সেখানের রূপটা দেখে সাঁতরামশাই চমকে উঠেছে। একটু দূরেই ঘন বন। গভীর গহন বনরাজ্য। লম্বা সুন্দরীগাছের কালো পাতায় রাতের আঁধার জমছে, হিঁতাল বনের হলুদ বনের বৈচিত্র্য আজ মনে আনে বাঘের অস্তিত্বের কথা। সমুদ্রে যেতে পারে

না, কোনমতে খালে এসে ঢুকেছে, আর ভাঁটার টানে খালের জল নেমে গেলে ওরা পড়ে থাকবে জমাট বালি-কাদার মাঝে একটু জলে বন্দী অবস্থায়। তখন বাঘ এসে নৌকাতেও উঠতে পারে আর এমন ঘটনা সুন্দরবনে প্রায়ই ঘটে থাকে।

বদরু ছেরালো জোয়ান। ঘরে তার নতুন বিবি। বদরু স্বপ্ন দেখছিল। ঠিকমত পাড়ি দিতে পারলে ওরা শেষরাতের মধ্যেই ঝড়খালির বনবাংলোর ওখানে যেতে পারত, এক ভাঁটি জিরিয়ে ভাতজল খেয়ে পরের গোনে গিয়ে পেঁছিত তাদের গঞ্জে। মরিয়মকে কাছে পেতো, সারা মনের সেই আনন্দস্বপ্ন কোথায় হারিয়ে গেছে ওরা পড়ে আছে অকুল সমুদ্রের ধারের দুর্গম বনে।

আর বনের চেহারা, আকাশের মেজাজ দেখে ওরা ঘাবড়ে গেছে। কালো জমাট মেঘের দল দিকহীন সমুদ্রের বুক থেকে দল বেঁধে এসে হানা দিয়েছে বনরাজ্যে। থেকে থেকে ঝড়ের সাপটে কাঁপছে গাছগুলো। বনভূমির বুকে ঝড়ের গর্জন ওঠে, তারই রেশ এসে মেশে মত্তনদীর বুকের ঢেউ ফাটার শব্দে। উথল-পাথল গাংয়ে নিতাই বুনো ওই ঝড়ের মাতাল ওঠা নদীর বুকে কিসের সন্ধান করছে। ও বলে—অন্য সময় জেলেনৌকাও থাকত এখান ওখানে। তাদেরও পাত্তা নাই। ডুবলো নাকি গ শালোরা ?

ইরফান বিরক্ত হয়ে বলে—নিজেদের ভাবনা ভাব। সকাল সকাল রসুই পাকিয়ে খানার প্যাট চুকিয়ে ছইয়ে ঢোক। এ বন ভালো না, হাওয়া ছম ছম করে।

ইরফান খাঁ বাদাবনের পুরনো বাওয়ালি, মন্ত্রতন্ত্র তুক-তাকও জানে। সাইয়ের বংশের ছেলে। ওরা বাতাসে জিনপরীর খবর পায়, সুন্দরবনের আকাশ বাতাসে কত অতৃপ্ত আত্মার আনাগোনা। এখানের গাং সমুদ্রে কত নৌকা ডুবেছে তার লেখাজোখা নেই, কত বাওয়ালী মধু কাটতে এসে জান দিয়েছে বাঘের খপ্পরে, তাদের অতৃপ্ত আত্মা রাতের জমাট ঘন অন্ধকারে মানুষের খোঁজ করে ফেরে লুব্ধ মন আর বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়ে। এখানে মানুষের

াহার্য কিছুই মেলেনা, চারিদিকে জল আর জল। সেই জলে ষ্ণা মেটে না। বিস্বাদ লবণাক্ত বারিধি। এখানে আছে শুধু ত্যুর পরোয়ানা, বাঁচার আশ্বাস কোথাও নেই। বুকফাটা তৃষ্ণা নিয়ে অশরীরীর দল ফেরে। ইরফান রাতের জমাট অন্ধকারে যেন টর পায় তাদের ফিসফিসানি। বদ্ধ বন্দী মানুষ ক'টাকে পেয়ে রা গাছগাছালির আড়াল থেকে চোখ জ্বেলে দেখছে।

ইরফান বলে—দেহবন্ধন করে রাখছি। ওরা মায়াবীর জাত। ত ছলাকলা জানে। ব্যাগতা করি ডাকতি পারে নিশির ডাকে। ঁশিয়ার, সাড়া দিবি না। আল্লার কিরা বাইরি বা ছইয়ের নে। জান খাইয়া ফেলাবে নে।

সাঁতরামশাই প্রথম রাতের আঁধারে রহস্যময়ী বনভূমি আর ই মাতাল গাংয়ের দিকে চেয়ে থাকে। একটা তারার নিশানা নেই সারা আকাশে। শুধু দমকা হাওয়ার সাপট আর বৃষ্টির দ কানে আসে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের বুকে রূপালী ফুলঝুরি টে ওঠে। ঢেউ ভাঙছে—ফসফরাসের ফুলঝুরি নিয়ে জলকণা ছটকে ওঠে—আকাশে। এ কোন ধ্বংসমাতাল রাত্রি। এ াত্রির যেন শেষ নেই। ওই ভয়ব্যাকুল পরিবেশে ইরফানের কথাগুলো কানে আসে—হুঁশিয়ার! কোন রা সাড়া নাই দিবি। ওরা মানুষ না—ওরা—! বিড় বিড় করছে ইরফান। বদরু— নিতাই বুনো গুপী সর্দারের সাহসী বুকগুলো কেঁপে ওঠে। গদাধর াঁতরা স্তব্ধ হয়ে গেছে কি এক জমাট আতঙ্কে।

তবু দুঃসহ ক্লান্তি আর উত্তেজনায় পরিশ্রান্ত দেহ মনে ওদের ম নামে। দাঁড় টেনে টেনে টাটিয়ে গেছে গা-গতর। সাঁতরা- শাইও ঘুমিয়ে পড়েছে।

মরিয়ম হাসছে। ওর নিটোল বাড়ন্ত দেহের সায়রে তুফান ঠে। বদরু ওকে কাছে টেনে নেয়। বাইরের সলজ্জ মেয়েটা াতের আঁধারে অন্য মেয়েতে পরিণত হয়। ওর ছোঁয়া বদরুর দহে-মনে যেন জোয়ার আনে।

—এ্যাই মরদ! মরিয়ম একঝটকায় ওর বাঁধন ছাড়িয়ে

দৌড়াচ্ছে বনহরিণীর মত। বদরুরও নেশা চেপে যায়। সে ওকে ধরার জন্য এগিয়ে যায়। খিল খিল হাসির শব্দ ওঠে। হাল্কা পায়ে দৌড়াচ্ছে মরিয়ম। বদরু ওকে ধরতে পারে না। দৌড়াচ্ছে। অনেক দূর থেকে মরিয়মের সুরেলা ডাক ভেসে আসে—বদরু…বদরু…এ্যাই-ই…।

চমকে উঠেছে বদরু। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। অবা হয়ে বিস্ফারিত চাহনি মেলে চেয়ে দেখছে। সেই আলো-জ গ্রামসীমা ধানের সবুজ ক্ষেত শিরীষগাছের ছায়াঢাকা পথ মরিয়ম কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তবু ডাকটা যেন শুনে সে। কোথায় ডাকছে তাকে।

বদরু বিড় বিড় করে—চাচা, কে যেন ডাকছে। মৈরমের ডা না? ওই—

উৎকর্ণ হয়ে শুনছে বদরু। বাইরে তুফানের শব্দ মিশে নদীর ঢেউয়ের গর্জনে—শোঁ-শোঁ ডাকছে বনভূমি। ওই উথা পাথাল শব্দতরঙ্গের মাঝে একটা ক্ষীণ সুর যেন শোনা যা কে যেন ডাকছে—হ্যাঁ, মানুষেরই ডাক।

বদরু উঠে এগিয়ে আসে ছইয়ের ফালি পোক্ত দরজাট দিকে।

—হেই! হুঁশিয়ার! এগোবি না!

ইরফানের চোখ লেগেছিল। ও জানে এ মায়াবীদের এলাকা তাই জেগে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু কখন ছইয়ের ওমের মধ্যে চোখ বুজে এসেছিল জানে না। বদরুকে উঠে বসতে দেখে সাবধানী মন কি ঠাওর করে জেগে উঠেছে। সারা শরীরে রোম খাড়া হয়ে যায় ইরফান গুণীনের।

বদরুকে হাত ধরে হেঁচকা টানে ধরে ফেলে গর্জাতে থা ইরফান।

মুরবি ওই জিনের কোপে। নিশির ডাকে ডাকিলেই ঘাড়ের রক্ত শুষি কাঠ করি ফেলাইবে ওরে।

বদরু হাঁপাচ্ছে। দুজনে তখনও যেন সব ছাপিয়ে ও

সেই অসহায় ডাকটা। বাতাসের দাপটে ভেসে ভেসে যায়। লালচে টেমির কাঁপে। ঘরের আধো-জাগন্ত মানুষ দুটোর মুখে একটা কাঠিন্য আর ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে।

নিতাই বুনো মধুলায়ে ঘুরেছে কতোদিন। সেই জীবনটাই ছিল আনন্দের। মহাজনের কাছে, হেডমাঝির কাছে, কাঠের হিসাব দিতে হত না। ওরা বনে ঢুকত বসন্তের ফুল ফোটার দিনে। ভুবখালির মদন আর সে দুজনে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। মদন জানত মৌমাছির খবর। আকাশের মাছির পিছনে দৌড়ত তারা। গাংয়ের নীল জল ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে। আকাশে বাতাসে খলসে গেও গরাণ কেওড়া ফুলের বুকভরা সুবাস।

মধুর টাটকা তরতাজা মিষ্টি গন্ধে কলজে তর্ হয়ে ওঠে। ওদের জগৎ ফুলফোটার জগৎ—ওদের নিশ্বাসে ভেসে উঠত সেই অমৃতসৌরভ। ওরা মৌমাছির পথ ধরে ছুটত ঘন বনের বুক চিরে। হাতে মৌচাক কাটার দা, অন্য হাতে গোলপাতার মশাল, মদনা আর সে কত দিন কত মধুর বছর কাটিয়েছে। হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে যায় চিলমারির জঙ্গলে। কেওড়া ফুলের বনে বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। সামনে তাদের বিরাট চাক, মদনা এগিয়ে যাবে হঠাৎ স্তব্ধ সুন্দরবন এক ভয়ঙ্কর গর্জনে ভরে ওঠে। মদনা! চীৎকার করে ওঠে নিতাই। একটা আহত চীৎকারকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছে বাঘটা। বিদ্যুৎশিখার মত এসে থাবার এক ঘায়ে ওকে ছিটকে ফেলে মুখে করে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

—নিতে—নি—উ উ...

সেই ডাকটা যেন আজ হঠাৎ শুনেছে নিতাই। মদন ডাকছে তাকে সাহায্যের জন্য। অন্ধকারে সেই ডাকটা তীক্ষ্ণতর হয়ে ভেসে আসে। ধড়মড়িয়ে উঠেছে নিতাই। আবছা আলো-আঁধারিতে ইরফানের দিকে চেয়ে ভীত চকিত স্বরে বলে নিতাই—শুনছ শুনীন—মদনা। ভুবখালির মদনা ডাক দেয় গ। মদনা—

—চোপ বে! মদনা আর নয়—মদনার পেরেত এই আঁধারে ডাক পাড়ি তরে লই যাবে মরদ। তারপর—

কি একটা বীভৎসতার কল্পনায় নিতাই বুনো অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে জড়িয়ে ধরে—বাঁচাও। আমারে বাঁচাও গুনিন। ওই শালায় আমারে ডাক দেয়। কেনে—কেনে? উর কি ক্ষেতি করেছি? কাঁপছে ঝড়ে-কাঁপা পাতার মত ওই মানুষটা। তখন বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে একটা গোঙানির শব্দ শোনা যায়।

বিড় বিড় করে দোয়া পড়ছে ইরফান গুনীন। শোঁ শোঁ বাতাসে চাপা গোঙানির মত শব্দটা ভেসে আসে। জলে কাদায় শব্দ ওঠে—ওই অশরীরীর দল পা ফেলে ফেলে চলেছে। কাদের যেন খুঁজছে এই রাতের অন্ধকারে অতৃপ্ত আত্মার দল।

গদাধর সাঁতরার চোখের সামনের বার বার ছবিটা ভেসে ওঠে। আজ সে গঞ্জে বড় আড়ৎ করেছে। করাতকল বসিয়ে বড় কাঠ-ব্যবসায়ী হয়েছে। নিজের বিশ-পঁচিশখানা বড় বড় চৌধুরী নৌকায় মালপত্র যাতায়াত করে। কিন্তু গদাধরের মনে পড়ে এমনি অবস্থায় আসার আগেকার কথা। গোবিন্দ মল্লিক আর সে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিল বাদাবনে। গোবিন্দ মল্লিকেরই টাকা—ধনী লোক সে। আর গদাধরের কিছুই ছিল না। কাজকর্ম করবার জন্ত মাইনে পেত, আর গোবিন্দ মল্লিকই দয়া করে তাকে কারবারের এক আনির শরিকান করেছিল। গোবিন্দ মল্লিকের বরাত ভালোই। ধুলোমুঠো করত আর তা কঠিমুঠো হয়ে দাঁড়াত। এমনি করেই গোবিন্দ মল্লিক গঞ্জে আড়ত করাতকল বসিয়েছিল। গদাধর সাঁতরা তখন থেকেই মনে মনে ফন্দীটা এঁটেছিল।

এমনি ঝড়-জলের রাত। ওদের নৌকাটা চলছে বাদাবনের দিকে। সঙ্গে রয়েছে সরকারী রেভিনিউ জমা দেবার জন্ত হাজার দশেক টাকা, তাছাড়া ছ'মাসের বাওয়ালিদের মজুরির টাকা। তারও পরিমাণ জানে গদাধর। নৌকাটা নোঙর করেছে কোন এক বসতির নীচে। রায়মঙ্গল নদীতে তখন তুফান চলেছে। গদাধরের চোখে ঘুম নেই—ও দেখছে গোবিন্দ মল্লিককে, এই সুযোগে পথ পরিষ্কার করতে পারলে সবকিছু আসবে গদাধরের হাতে। লোভী মানুষটার ছ' চোখ জ্বলছে। ঘুমন্ত মানুষটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

সে। শক্ত দুহাত দিয়ে টুঁটিটা টিপে ধরে। গোবিন্দ মল্লিকের ঘুম ভেঙে গেছে, অব্যক্ত দমফাটা যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছে সে। সামনে ওই গদাধরের হিংস্র চোখের চাহনি। গোবিন্দ মল্লিক কল্পনা করেনি গদাধর তাকেই খুন করবে একদিন। বলে ওঠে সে বিকৃত-স্বরে—মারিস না গদাই, সবকিছু নে—শুধু আমাকে বাঁচতে দে। আমি চলে যাব—গদাধর জানে ওকে বাঁচতে দিলে তার বিপদই বাড়বে। তাই মরীয়া হয়ে আজ গদাধর ওকে শেষ করতে চায়। গোবিন্দ মল্লিকের দুচোখ নির্মম যন্ত্রণায় ঠেলে আনছে—জিবটা বের হয়ে পড়েছে। গদাধরের হাত দুটো তিলে তিলে ওকে পিষে চলেছে, হাতে ভিজে ভিজে উষ্ণ রক্তের ধারা। বারকতক প্রচণ্ড আক্ষেপে ওই দেহটা নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল।

গোবিন্দ মল্লিকের প্রাণহীন দেহটা রায়মঙ্গলের তুফানে ফেলে দিয়ে গদাধর রটিয়ে দেয় নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে গোবিন্দ মল্লিক।

আজও সেই দুই বিস্ফারিত চোখ তার দিকে চেয়ে আছে—ফিসফিসিয়ে ওঠে গোবিন্দ মল্লিকের কণ্ঠস্বর—আমাকে মারিস না গদাই, মারিস না। একটু জল—জল।

ভয়ঙ্কর আতঙ্কে জেগে ওঠে গদাধর সাঁতরা। সারা দেহ ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

বাইরে ঝড়ো হাওয়ায় সেই বিকৃত গোঙানির মত স্বরটা ভেসে আসে।

—একটু জল—জল—দে!

সাঁতরামশাই। ইরফান গুনান দেখছে মহাজনকে। গদাধরের চোখে-মুখে জমাট ভয়ের কাঠিন্য। গদাধর ফিসফিসিয়ে ওঠে—কে? ডাকছে না? ওই তো।

—না। গর্জে ওঠে ইরফান গুনীন—ওরা কেউ লয়, মানুষ লয়, বাদাবনের রাতের বদ্‌হাওয়া। ওদের ডাকে কান দিও না মহাজন, ওরা জ্যান্ত মানুষেরে খুঁজতিছে কি জ্বালায়।

রাতের অন্ধকারে গোঙানির মত বিকৃত সেই কণ্ঠস্বর আশপাশে

যেন ডাক দিয়ে ফেরে। মানুষের স্বরই, কেমন বিকৃত গোঙানির মত উঠছে শব্দটা। ব্যাকুল আর্তি নিয়ে রাতের আঁধারে কে যেন সাহায্য চাইছে। কিন্তু কে আসবে এই মৃত্যুপুরীতে রাতের অন্ধকারে! মানুষ এখানে আসে না! এ মৃত্যুর জগৎ। তবু বদরু যেন ঐ ডাকটাকে চেনে। ও ব্যাকুল স্বরে জানায়—মৈর মলয় তো গ চাচা?

নিতাই বুনো ওপাশে গুম হয়ে বসেছিল, সে বলে ওঠে—মদনা। তুষখালির মদনা বাঘ পড়ার সময় এমনি চিল্লিয়ে উঠেছিল গুনীন। একবারের মত ডেকেছিল. তারপর—। এই মদনাই বোধহয় গো এখানে এসে ঠেকেছে। হয়তো চেল্লাচ্ছে, ডাকছে আমাকে—

চোপ! ইরফান ধমকে ওঠে। ওর হাতের মন্ত্রপড়া জল ছিটুচ্ছে ছইয়ের মধ্যে। দুচোখ জ্বলে ওঠে গদাধরের। ওর সেই চরম অপকীর্তির সাক্ষী গোবিন্দ মল্লিক হয়তো ভাঁটির গাংয়ে ভেসে ভেসে এখানে এসে ঠেকেছে, আজও অমনি বুকভরা জ্বালা নিয়ে সে খুঁজে ফিরছে গদাধরকে। গদাধর বিড় বিড় করে—না! গবা মল্লিক মরে গেছে। সে ব্যাটা কেন আসবে! সে নেই। তবু একবার দেখতে হবে ইরফান—

—খপরদার। বেইরো না মহাজন। জিনপরীর মুলুক। রাতের কু বাতাসে ভর করে ওরা আসে। সব পাপের শোধ লয়। হুঁশিয়ার! সাইবাবার মুখ বন্ধন, দেহবন্ধন। কার দোওয়া? মা বনবিবির দোওয়া!

বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে ইরফান, ওর কটাশে চোখদুটো জ্বলছে কি ক্যাঠিন্তে। বাদাবনের গুনীন আজ রাতের আঁধারে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি জগতের সীমানায়।

সেই গোঙানির শব্দটা তখন বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে সমুদ্রের কলরোল ছাপিয়ে কানে আসে। কটি বিনিদ্র প্রাণী ছইয়ের মধ্যে কুপির লোলাভ ধোঁয়াটে পরিবেশে যেন নিশ্চিন্ত কোন সর্বনাশের

প্রতীক্ষা করছে। ঐ অশরীরির দল তাদের খুঁজে পাবেই—তারপর—!

হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কারের শব্দ ওঠে। বাদাবনের মৃত্যুদূত এবার তাদের সন্ধান পেয়েছে। বাঘ!

—ইরফান! গদাধরের চোখের সামনে গবা মল্লিকের শেষ মিনতিভরা মুখখানা ভেসে ওঠে। সে-ও বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু গদাধরই তাকে অধিকারটুকু দেয় নি। আজ নিজেই মৃত্যুর কালো ছবিটা দেখেছে, তাই আর্তনাদ করে ওঠে।

হঠাৎ মনে হয় নৌকটা দুলছে! চমকে ওঠে তারা! বাঘটা বোধহয় নৌকায় লাফ দিয়ে উঠেছে। ইরফান কান খাড়া করে কি শুনে বলে—না গ, জোয়ার আসিতিছে! নৌকা কাইল দিচ্ছে। সমুদ্রের শব্দ বদলে যায়। কলকল্লোলে সমুদ্রের জোয়ার ঢুকছে মোহনার গাংয়ে। ইরফান বলে—বাছাধন আসতি পারবে না বাবু।

হঠাৎ এক পরম্ প্রশান্তি নামে। বাঘটা বার কয়েক নিস্ফল আক্রোশে ডেকে ডেকে ফিরে গেছে। আর সেই গোঙানির চাপা আর্তনাদ, সেই অশরীরীর দলের পায়ের শব্দ, সেই কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। বাতাস বয়—সমুদ্রের কল্লোল ওঠে। কটা বন্দী মানুষের মুখের কাঠিন্য ক্রমশঃ মিলিয়ে আসে। কারা যেন সরে গেছে। হয়তো দয়া করে এ যাত্রা তাদের মুক্তি দিয়ে গেছে।

ইরফান কান পেতে হাওয়ায় কি শুনে বলে—তুফান থামিছে মনে লয়। জয় বাবা দখিনরায়, জয় মা বনবিবি!

ভীত ত্রস্ত মানুষগুলোর দেহমনের উপর দিয়ে বড় ভারি একটা সর্বনাশা ঝড় বয়ে গেছে। শেষরাতের দিকে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেবশ দেহগুলো ঘুমের গভীরে হারিয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে এক সময় তখন দিনের আলো ফুটে উঠে। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় শান্ত সমুদ্রের বুকে প্রথম সূর্যের আলোর ঝলক। নিতাই বুনোর ঘুম ভাঙে।

—চাচা। এ্যাই বদরু—গুপী।

ওরা সকলেই ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। কালকের কালো মেঘগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। ঝড়ের সংহার-মূর্তিও আর নেই। সকালের মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের প্রথম আলো লাল বেগুনী জাফরানী রংয়ের বাহার এনেছে। গাংচিলের দল ঢেউয়ের মাথায় ছোঁ দিয়ে ফেরে, ওদের তীক্ষ্ণ চীৎকারে শান্ত বেলাভূমি মুখর হয়ে ওঠে। বালিয়াড়িতে নেমেছে বাটাস মানিকজোড় আর বালিহাসের দল। দু'একটা হরিণের দল বেলাভূমির সবুজ ঘাসঢাকা মাটিতে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

শান্ত সুন্দর পরিবেশ ঝলমলে রোদভরা সকাল।

ইরফান বিড় বিড় করে—মা বনবিবির দোওয়া।

কালকের রাতের অশরীরির দল কোথায় হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ বদরু চীৎকার করে ওঠে—ভাঙা মেছো না খান তো দেখিনি কাল চাচা! —তাই তো! ওরা চমকে ওঠে। বোধহয় কালকের ঝড়-তুফানে কোন জেলে-নৌকা ডুবে গেছে, কাৎ হয়ে সমুদ্রের চরে পড়ে আছে হাল-ভাঙা ছই-ওড়া নৌকাটা। ওরা কি কৌতূহল নিয়ে ওদিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, নৌকাটার জলের জালাটা শূন্যি, খাবারও একদানা নেই। জাল দড়িগুলো স্তূপ করা। নীরব মৃত্যুর সাথী হয়ে নৌকাটা গোঁত্তা খেয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে।

হঠাৎ দেখা যায় বালিয়াড়িতে একটা মানুষ পড়ে আছে। শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে ওর দেহটা, মুখ-চোখ কোটরে ঢোকা, চোখ দুটোর মণি ঠিকরে বের হয়ে রয়েছে তখনও। কি দুঃসহ তৃষ্ণায় ওর শীর্ণ বিকৃত দেহটা ছিটকে পড়েছে, বালুচরে মুখ ঘষে ঘষে সে বোধহয় জীবনের শেষ মুহূর্তেও একবিন্দু তৃষ্ণার জল খুঁজেছিল। মেলেনি।

বুক-ভরা তৃষ্ণা নিয়ে এই মানব-পরিত্যক্ত বনভূমির সীমান্তে সে শেষ হয়ে গেছে। হয়তো অন্ধকারে তাদের ছইয়ের ক্ষীণতম আলো

দেখে বার বার অস্ফুট বিকৃত স্বরে কি বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কথা ভীত ত্রস্ত মানুষগুলোর কানে পৌঁছয় নি।

—ইয়া আল্লা! ইরফান বিড় বিড় করে—এ বন মায়া আনে মহাজন। অনেক মানুষের কান্না এখানের বাতাসে মিশে আছে।

ওই সুন্দর সকালে স্তব্ধ বনভূমি আর সফেন উর্মিমুখর নীল সমুদ্রের বেলাভূমিতে কটি অসহায় মানুষ কঠিন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে কি এক আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মানুষমারির ট্যাঁক থেকে ওরা প্রাণ নিয়ে ফিরছে গঞ্জের দিকে। সেই রাত আর বিকৃত মানুষটার আর্তনাদ এখনও তাদের স্মরণে আসে।

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ আবাল্য রাঢ়বঙ্গের রুক্ষ মাটির দেশ কান্দিতে লালিত ও পালিত। তবে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত শ্যামল সবুজ দোয়াব অঞ্চলের সাথে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কার্যব্যাপদেশে সুদীর্ঘকাল কলকাতাবাসী। ডাক ও তার বিভাগের দায়িত্বেরত থেকে লেখক জনসংযোগ ও গণয়োগাযোগের মাধ্যম হিসাবে যা সবথেকে বেশী আকর্ষণীয় মনে করেছেন তা চলচ্চিত্রের চিত্রপট। লেখকের বহু গল্প উপন্যাস ও নাটক বাঙ্গলা চলচিত্রের আঞ্চলিক পরিধি অতিক্রম করে সর্বভারতীয় অঙ্গনেও সমাদৃত। হিন্দী চিত্রজগতের সফল কাহিনীকার হিসাবে লেখকের খ্যাতি সুবিদিত।

সংকলনঅন্তর্ভুক্ত "**মানুষ মারির ট্যাঁক**" গল্পটিতে লেখকের অতিলৌকিক রহস্য রচনায় স্বাভাবিক কুশলতা আমাদের চমৎকৃত করে।

এখানে সুন্দরবন অঞ্চলের অজানা অচেনা রহস্যাবৃত নিঃসীম জলরাশির কালো জলের ঢেউয়ের বুকে কত না হারিয়ে যাওয়া মানুষের আর্তহাহাকার কোন রহস্যময় জগতের প্রেতাত্মার অনিকেত ঘোষনা করে জানি না।

মাউণ্ট আবুর পথ প্রদর্শক

অবনী সাহা

রাজপুতনার মরুভূমি জুড়ে রাজস্থান। রাজপুত রাজাদের দেশ। সেই মরুভূমিতে মাউণ্ট আবু বা আবু পাহাড়কে বলা যেতে পারে ওয়েশিস্।

ওয়েশিস্ই বটে। আবু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'গুরুশিখর' পর্যন্ত উচ্চতা পাঁচ হাজার ছশ তিপ্পান্ন ফুট।

ছোট্ট পাহাড়টিতে কত না বৈচিত্র্য। কত না দ্রষ্টব্য। রাজস্থানের এমন রাজা নেই যার শৈলাবাস নেই মাউণ্ট আবুতে। আমি অবশ্য প্রধান প্রধান রাজাদের কথাই বলছি।

সেবার দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আজমীর, পুষ্কর, চিতোর, উদয়পুর হয়ে আবুতে পৌঁছেছি আমরা। সঙ্গে ছিলেন আমার সহকর্মী কানাইবাবু, প্রাক্তন ছাত্র বিনয় পাল ও তার দুজন সহকর্মী অসিত বাবু ও পীযূষ বাবু। উঠেছি শহরের গণপতি লজে।

দর্শনীয় বস্তু দেখে বেড়াচ্ছি। চার হাজার ফুট উঁচুতে ভারত বিখ্যাত নক্কি (নেখী) লেক দেখেছি। পাশে গান্ধী পার্কে হাওয়া খেয়েছি। নক্কি লেকে বোটে করে বেড়িয়েছি। সান সেট পয়েন্টে যেয়ে রমনীয় সূর্যাস্ত দেখেছি। রাজভবন, গভর্নমেণ্ট মার্কেট, সার্কিট হাউস, পোলো গ্রাউণ্ড, রঘুনাথজীর মন্দির, টোড রক দেখা হয়েছে। ফাউ হিসেবে পোলো গ্রাউণ্ডের প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব দেখার সুযোগ পেয়েছি।

কিন্তু আরো অনেক কিছুই দেখা হয় নি। দেখা হয় নি বিশ্ববিখ্যাত দেলওয়ারা জৈন মন্দির, অর্বুদা দেবীর মন্দির, অচলেশ্বর মহাদেব।

পরদিন রওনা হওয়া গেল। কানাইবাবু, অসিতবাবু ও পীযূষ কান্তি বাবু একটা জরুরী দরকারে আবু রোডে গিয়েছিলেন। ফলে আমি আর বিনয় বেলা দেড়টা পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়লাম।

পোলো গ্রাউণ্ডের কাছ থেকে বাস ছাড়ে। অচলগড় পর্যন্ত যায়। দেলওয়ারা মন্দিরের কাছে নামলাম আমরা। পথে অর্বুদা দেবীর মন্দির একটি পাহাড়ের মাথায়। এই অর্বুদা বা অম্বা দেবীর নাম থেকেই আবু নাম। চারশ' সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। দূর থেকেই অর্বুদা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। ইচ্ছে রইলো আজ না হোক আর একদিন নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরে যাবো। দূর থেকে দু'চারজন দর্শনার্থীকেও যেতে দেখলাম। সরু পথ ধরে আম ও চম্পা গাছের মাঝখান দিয়ে।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেলওয়ারা মন্দিরে পৌঁছুলাম।

বাইরে থেকে দেলওয়ারা মন্দির অতি সাধারণ মনে হল। বাস রাস্তা থেকে পশ্চিম দিকে পাহাড়ের কোলে এই মন্দির। মন্দির অবশ্য একটা নয়, চারটে। বাইরের কারুকার্য অতি সাধারণ। অনেকটা, পুরানো প্লাষ্টার করা স্যাতলা ধরা বহিরঙ্গ। কিন্তু ভিতরে ঢুকে চক্ষু স্থির। বিশ্বের বিস্ময় লুকিয়ে আছে সেখানে!

প্রধান মন্দির 'বিমলা বিশি'। আগাগোড়া শ্বেত পাথরের। অঙ্গন থেকে আরম্ভ করে সিলিং পর্যন্ত। প্রতি ইঞ্চিতে কারুকার্য। প্রতিটি মূর্ত্তি নিটোল, নিখুঁত। হাজার বছর আগেকার এই জৈন মন্দিরটি দেখলে মনে হয়, এইমাত্র কারিগরেরা কাজ শেষকরে হাত পা ধুতে গেছেন।

মন্দিরের সৃষ্টিকাল এক হাজার বত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ। তৈরী করান প্রথম ভীমদেবের মন্ত্রী বিমল শাহ। খরচ পড়েছিল আঠারো কোটী

টাকা। বিখ্যাত স্থপতি কীর্তিধরের অধীনে দেড়হাজার রাজমিস্ত্রী, বারোশ' যোগাড়ে চৌদ্দবছর ধরে কাজ করেছিল।

গোটা অঙ্গন জুড়ে মণ্ডপ। আটচল্লিশটি সুদৃশ্য অপরূপ কারুকার্য খচিত স্তম্ভের উপর। মাঝখানের আটটি সুদৃশ্য স্তম্ভের উপর গম্বুজ। গম্বুজের সিলিং-এর কারুকার্য, মূর্তিগুলো দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। মানুষের কাজ বলে বিশ্বাস হয় না। মাঝখানের প্ল্যাটফর্মের উপর শ্বেতপাথরের উঁচু বেদীতে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। টড সাহেব, যিনি রাজস্থান কাহিনী লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, বলেছেন, ভারতের সবচেয়ে সুন্দর এই মন্দির। তাজ ছাড়া আর কোনটি এর'ধারে ঘেষতে পারে না।

স্যার এডুইন আরনল্ডের মতে, আলাদীনের প্রদীপ ছাড়া এমন মন্দির গড়া সম্ভব নয়।

বিমলা বিশি মন্দিরের কাছে 'লুনা বিশি' মন্দির, বারশ একত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে বার কোটী টাকায় তৈরী করান বাস্তু পাল ও তেজপাল নামে দুই ভাই। জৈন তীর্থঙ্কর নেমীনাথের সুন্দর মূর্ত্তি রয়েছে এ মন্দিরে। এ ছাড়া আরও দুটো জৈন মন্দির রয়েছে। তুলনামূলক ভাবে কম উল্লেখযোগ্য। দেলওয়ারা মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা যখন বাস রাস্তায় এলাম, তখন সন্ধ্যে হতে বেশী দেরী নেই। কিন্তু কোথায় বাস! বিনয় প্রস্তাব করলো, এক কাজ করলে হয় স্যার। বাস নিশ্চয়ই অচলগড়েই আছে এখনও। আমরা হাঁটা পথে অচলগড়ে যাই। অচলগড়ও দেখা হবে, সেখান থেকেবাস বা ট্যাক্সি করে ফেরা যাবে। একটু ইতস্তত: করে রাজী হলাম। আজ ভাবি কেন যে অমন দুর্মতি হলো, কেন বেলায় বেলায় দেলওয়ারা মন্দির থেকেই হোটেলে ফিরলাম না।

যাই হোক, দুজনেই অচলগড়ের দিকে হাঁটতে থাকলাম। পাহাড়ের উপরকার সূর্যের শেষ আলোকরশ্মিটি অল্পক্ষণেই অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো। সামনে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আনুমানিক অর্ধেক [illegible] যেতেই আঁধার নেমে এলো! বললাম, বিনয়, বোধ হয় আমরা [illegible]শী ঝুঁকি নিচ্ছি। লক্ষ্য করেছ একটা বাস বা ট্যাক্সির দেখা

[...]ই। অচলগড়েও যে বাস ট্যাক্সি পাবো তার নিশ্চয়তা কি?

তাহলে এখন কি করবো স্যার?

ছ্যাখো, অচলগড়ের অচলেশ্বর মহাদেব মাথায় থাকুন! চল ফিরি।

সে তো স্যার আমরা এখানেও অপেক্ষা করতে পারি, ফিরতি [বা]স থামিয়ে—।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কিন্তু ঐ যে আগেই বললাম, [অ]চলগড়ে এখনও বাস আছে এটার নিশ্চয়তা কি? তার চেয়ে [আ]মরা আবুর দিকে এগুতে থাকি, পথে বাস পেলে, তা থামিয়ে [উ]ঠবো আমরা।

আবার ফেরা। সাড়ে আটটা নাগাদ (ওখানে সন্ধ্যে হয় পৌনে [আ]টটায়) আবার দেলওয়ারা মন্দির সোজাসুজি এসে পৌছুলাম। কিন্তু দেলওয়ারা থেকে আবু, সেও তো মাইল পাঁচেকের মত রাস্তা। সঙ্গে টর্চ নেই। আত্মরক্ষা করার মতো একগাছা ছড়ি পর্যন্ত নেই, অথচ অন্ধকার রাত।

রাস্তা অবশ্য ভালো। বাঁধানো পথ। তবে অনেক জায়গায়ই রাস্তার পাশেই খাদ, কোনটা অতলস্পর্শী, কোনটা দুশ' পাঁচশ' ফুট গভীর। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ, রাত্রে ভালুক বেরোয়। আর একথাটি আমাদের এতক্ষণ মনেই পড়ে নি।

সিংহ অবশ্য একসময় ছিলো। আঠারোশ' বাহাত্তর সালে শেষ সিংহটিকে কে যেন শিকার করে ছিলেন, তারপর আর সিংহ দেখা যায় না। বাঘও কালেভদ্রে দেখা যায়। প্যানথারেরও দেখা মেলে। কিন্তু শূয়োর আর ভালুক যথেষ্ট। সুতরাং!

সুতরাং, প্রাণটি হাতে নিয়ে অন্ধকারে দক্ষিণদিকে চলছি। পথে জনমানব নেই। মনে তখনও আশা, কোন না কোন গাড়ী নিশ্চয়ই এপথে যাবে, আর যেভাবেই হোক, তা থামাবো।

অর্বুদা দেবীর মন্দিরের কাছে আসতে আসতে সোনায় সোহাগা। অস্পষ্ট কুয়াশায় আশপাশ ঢেকে গেল।

একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। কিন্তু এরপর যা ঘটলো, তা আরও বিচিত্র। দিক বিভ্রম, পথ বিভ্রম।

অর্বুদা দেবীর মন্দির বরাবর খানিকটা এগিয়ে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। আসার পথে লক্ষ্যই করিনি। এখন কোন পথে যাই কোন পথে গেলে গণপতি হোটেল পাই?

বিনয় বলল, স্যার, 'কীপ টু দ্য লেফট' কথাটা আছে না, তাই করি।

বললাম, কর। অতএব, বাঁ দিকের পথ ধরলাম। পথ ভালোই —পাকা।

ঘণ্টা খানেক বেশ নিশ্চিন্তে চলেছি। আঁধার চোখে অনেকটা সয়ে গেছে, মাঝে মাঝে দূরে পাহাড়ী টিলার উপরকার দু'একটা বাড়ী থেকে আলো এসে আবছা ভাবে রাস্তায় পড়েছে।

আমরা, এটা অমুক বাড়ি, ওটা অমুক ক্লাব, এইসব মনে মনে ভেবে উৎফুল্ল হচ্ছি। যাক্, তাহলে ভালুক শূয়োর বাঁচিয়ে প্রাণটাকে নিয়ে মনুষ্য জগতে পেঁছুতে পারবো। পারবো কি, পারলাম।

এমন সময় বিনয় বললে, স্যার, আমরা বোধহয় অন্ধকারে পথ ভুল করেছি।

কী যা তা বলছো? মুখে বললাম বটে, কিন্তু পা থেকে মাথা অব্দি কেমন একটা গরম স্রোত বয়ে গেল। নভেম্বরের এমন শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগলো জামার নীচে।

ঐ দেখুন, অর্বুদা দেবীর মন্দির যা আমরা ঘণ্টা দেড়েক আগে ফেলে এসেছি।

কিন্তু ওটা যে অর্বুদা দেবীর মন্দির তা বুঝলে কি করে? অর্বুদা দেবীর মন্দির তো আমাদের ডানদিকে ছিলো। এতো দেখছি বাঁদিকে।

স্যার, তার মানে আমরা আবার দেলওয়ারা মন্দিরের দিকে চলেছি

বল কি, আবার দেলওয়ারা মন্দিরের দিকে! সর্বনাশ!

সর্বনাশের তখনও বোধহয় কিছু বাকী ছিলো। ডান দিক থেকে দুটো কালো মতো দ্রব্য (ভালুক, না ভালুক না বোধ হয়। ভালুক অত জোরে ছোটে না) তীর বেগে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে খাদের দিকে নেমে গেলো।

ভাগ্যিস নেমে গেলো। না নামলে কীভাবে তাদের আপ্যায়ন করতাম তা ভাবতেও বার বার শিউরে উঠলাম।

হঠাৎ কানে এলো একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ আগে থেকেই অস্পষ্টভাবে কানে আসছিলো। আমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে গুরুত্ব দেই নি এতক্ষণ।

কর্ম সেরেচে। এ শব্দ আবার কিসের!

শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে এলো। পরম বিস্ময়ে এবং আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, একটি লোক, ফুট ছয়েক লম্বা, দেহাতি চেহারার, এগিয়ে আসচে। মাথায় পাগড়ি, গায়ে চাদর। মুখ দেখা যায় না। তবে চলন দেখে মনে হোল, লোকটা বৃদ্ধ, শীর্ণকায়। আর যে শব্দটা হচ্ছিলো, তা তার হাতের লাঠির শব্দ।

লোকটি কি ভেবে ক্ষণিকের জন্য থামলো, তারপর হিন্দীতে বললো, কাঁহা যায়গা বেটা?

আবু যায়েগা।

আও বেটা হামারা সাথ। বৃদ্ধ লাঠি ঠুক ঠুক করে আবুর দিকেই চললো। আঃ, কে বলে ভগবান নেই। না থাকলে এই রাত দশটায় শীতে জর্জরিত অবস্থায় বাঘ, ভালুকের হাতে প্রাণটি না খইয়ে এমন একজন পথ প্রদর্শক পেলাম কি করে!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বৃদ্ধের পেছন পেছন চলতে থাকলাম। একে ক্লান্ত, তারপর নানা চিন্তায় মনটাও বিক্ষিপ্ত। কিছুতেই বৃদ্ধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারছিলাম না।

তা না পারি, বৃদ্ধের লাঠির ঠক্ ঠকই আমাদের পথ প্রদর্শক।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর বিনয় ফিস্ ফিস্ করে বললে, স্যার, আমরা ঠিক লোকের পেছনে যাচ্ছি তো?

তার মানে? মানে, ইতস্ততঃ করে বিনয় বললো, লোকটা চোর-ডাকাত বা ঠগী-টগী নয় তো?

তুমি ওসব উদ্ভট চিন্তা ছাড়ো তো! লোকটা যাই হোক, মানুষ তো বটে! মানুষের সান্নিধ্য যে এত মধুর, তা তুমি কোলকাতায় থেকে এর আগে বুঝেছো?

অস্পষ্ট কুয়াশায় সামান্য আগে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে। একটু ঝুঁকে লম্বা লম্বা পা ফেলে লোকটা এগুচ্ছে। অবশ্য

লোকটা পথে আর কোন কথা বলে নি। একবারও ফিরে তাকায়নি আমাদের দিকে।

তা না তাকাক। বন্ধুরা এতক্ষণে থানায় খবর দিয়েছে কিনা কে জানে। যেমন করেই হোক হোটেলে পৌঁছতেই হবে আজ। লোকটা যে ডাকাত দলের, তেমন কোন লক্ষণও প্রকাশ করে নি। আর হাঁটছেও পাকা রাস্তা ধরেই।

আরও বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর আই. পি.এস. ট্রেনীদের হোস্টেল দেখা গেলো। দূর থেকেই হোস্টেলের লোকজনের কথাবার্তা অস্পষ্ট ভাবে কানে এলো। আঃ, এতক্ষণে প্রাণ নিয়ে ফিরলাম তাহলে!

এক পলকের জন্য হোস্টেলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পর ক্ষণেই কী আশ্চর্য, সে বৃদ্ধ গেলো কোথায়? এইমাত্র না তা লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনেছি। রাস্তার পাশ দিয়ে কোন ছো রাস্তায় ঢুকে পড়লো নাকি?

বিনয় বললো, স্যার একটা কথা বলবো?

কী?

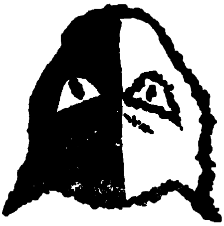
পুলিশ হোস্টেলের গেটের ইলেকট্রিক লাইট সামনে দেখ কতখানি চওড়া হয়ে রাস্তায় পড়েছে। আমি কিন্তু লোকটাকে আলো পেরিয়ে যেতে দেখি নি। তবে?

সে তবের আজও মীমাংসা করতে পারি নি। আজও মাউ আবুর কথা মনে পড়লে সেই অজ্ঞাত পথপ্রদর্শকের কথা মনে পড়ে

কে সে! সত্যই কি সে মানুষ, না কি অম্বাজীর কোন অনুচর সুদূর বাংলাদেশের দুই দিকভ্রান্ত পথিককে মঙ্গলমত তাদের ডের পৌঁছে দিতে এসেছিলেন!

॥ **অবনী সাহা** ॥ (সাহাজী)-র জন্ম ১৯২৭ সালে। পিতৃনিবাস ঢাকা জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) অন্তর্গত নান্নার গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিষয়ে এম. এ। ছোটোবেলা থেকেই সাহিত্য-চর্চা করে আসছেন। রস সাহিত্যিক হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও বহু উপন্যাস নাটক, ভ্রমণকাহিনী ও কাব্যগ্রন্থের লেখক। আকাশবাণীর গীতিকার। 'যুগান্তর' প্রমুখ বহুবিধ পত্র পত্রিকায় স্বনামে ও 'সাহাজী' ছদ্মনামে লিখে থাকেন। লিখছেন যুগান্তরে কোমল ক্যাকটাস কলমেও।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী অন্য বিবর (উপন্যাস), অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ (রঙ্গ নাটক), টালা থেকে তামিলনাড়ু (দক্ষিণভারত ভ্রমণ), ঝিনুক মন (কাব্যগ্রন্থ) প্রভৃতি।



ট্রেন লাইনের ওপর

সুকুমার সিংহরায়

চিঠিটা সকালের ডাকে এসেছে। সেই থেকে আমার টেবিলে। চিঠিটার মুখ ছিঁড়ে কয়েকবার পড়েছি। চিঠিটা লিখেছে আমারই এক বন্ধু। দূর মফস্বল থেকে। চিঠিটা পড়ার পর থেকে আমার মনে শুধু প্রশ্ন জেগেছে। বারবার। এও কী সম্ভব? কেমন করে সম্ভব? বিজয় লিখেছে, গত শনিবার রাতে শশধর চক্রবর্তী মারা গেছেন—।

শশধর চক্রবর্তীর মৃত্যু সংবাদ আমার মাথার মধ্যে ঝড় হয়ে বইছে। মনের মধ্যে প্রমাণের প্রশ্ন ওঠানামা করছে। কী, কেমন করে? কেমন করে? আমি মেনে নেবো শশধর চক্রবর্তীর মৃত্যুর জন্যে তাঁর নৈরাশ্য দায়ী?

গত মাসে গিয়েছিলাম কলকাতার এক ঘেঁয়েমি কাটাতে দূরের এক গ্রামে। গ্রামের নাম রঘুনাথ বাড়ি। ওখানে বিজয়ের কর্মস্থল। সেটেলমেণ্ট অফিসে চাকরি করে ও। সময় সুযোগে ওর কাছে কয়েকবার ছুটে গেছি। সেবার গিয়ে সংবাদটা প্রথম শুনেছিলাম। বিজয় সন্ত্রাসের মুখ করে জানিয়েছিল, ট্রেন লাইনে গলা দিয়ে রূপাই আত্মহত্যা করেছে। সেই থেকে ও ভূত হয়ে লাইন ধারে ঘুরে বেড়ায়। ভয়ে কেউ সন্ধ্যের পর আর ওপাশে যায় না।

রূপাই-এর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে মনে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। দুঃখও পেয়েছিলাম। যতবার বিজয়ের কাছে গিয়েছিলাম, ততোবার দেখা হয়েছিল রূপাই-এর সঙ্গে। দেখা হতে রূপাই বলেছে, দাদাবাবু, তুমি তো কলকাতার লোক। আমাকে কলকাতা দেখাবে? আমি কোনদিন কলকাতা দেখি নাই। আমি বলেছি, কেন দেখাবো না, আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে তুমি?

উচ্ছাসে ঘাড় নেড়ে রূপাই বলেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাবো—

ফেরার সময় রূপাইকে যখন কলকাতায় আনতে চাইতাম, রূপাই তখন হাত জোড় করে বলে উঠতো, দাদাবাবু, এবার মত থাক্। হাতে অনেক কাজ আছে। পরেরবার ঠিক যাব। কথা দিয়ে রাখছি।

মনে মনে ঠিক করে গিয়েছিলাম, রূপাইকে যে করে হোক্ কলকাতায় ধরে নিয়ে এসে ওর কলকাতা দেখার সাধ মেটাবো। কিন্তু তার আগেই রূপাই-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে ওর জন্যে দুঃখ, কষ্ট অনুভব করেছিলাম। বিজয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রূপাই হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেল কেন?

ওর বউটাকে তো জানতিস্, কী ভয়ঙ্কর মুখরা? দিন রাত কারণে, অকারণে রূপাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করতো। রূপাই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ও এসব সহ্য করতে পারতো না। শেষে মনের ঘেন্নায় এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল। বলেছিল বিজয়।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হাজির হয়েছিলাম লাইনের ওপরে। সিঙ্গেল লাইন। পা ছড়িয়ে ছুটে গেছে,—পাঁশকুড়া থেকে হলদিয়া পর্যন্ত। সামনে নতুন গড়ে ওঠা ষ্টেশন—রঘুনাথ বাড়ি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল তখনও শুরু হয় নি। মাঝে মধ্যে মাল গাড়িগুলো লাইনে তোল ফেলতে ফেলতে ছুটে যায়। দু'দিকে ধু ধু মাঠ। দূরে কোথাও তাল, নারকেল, খেজুরের উঁচু উঁচু গাছগুলো মাথা তুলে উঁকি মারছে। বিকেলের মরা রোদকে ক্রমশঃ কে যেন মাটি থেকে তুলে নিচ্ছে। মাথার ওপর রূপোলী আকাশটা ছাতার মত ছড়ানো। নীচে পাখি উড়ছে। কাগজের কুচি কুচি মত। ঝির ঝিরে হাওয়া লেগে দু'জনের মনকে সজীব করে রেখেছিল। দু'জনেই হেঁটেছিলাম, ষ্টেশনের দিকে। হয়তো হঠাৎ বিজয়ের মনে পড়েছিল, রূপাই-এর কথা। ও বলে উঠেছিল, সন্ধে হয়ে আসছে। লাইনের ওপর আর থাকা ঠিক নয়। রূপাই-এর অশরীরী এসে ভয় দেখাতে পারে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুমান করেছিলাম। সন্ধ্যে হতে তখন দেরি ছিল। বলেছিলাম, আর একটু হাঁটা যেতে পারে—

বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়েছিল বিজয়। হেঁটে এক সময় ষ্টেশনের প্লাটফর্মের ওপর উঠে পড়েছিলাম। ষ্টেশন চত্বর খাঁ খাঁ করছিল। যেন নিশুতি রাতের মত ঝিমোচ্ছে। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের কাছে দেখা হয়ে গিয়েছিল শশধরবাবুর সঙ্গে। কলকাতায় আমার সঙ্গে এক সভায় পরিচয় হয়েছিল। তিনি যে ষ্টেশন-মাষ্টার ঐ ষ্টেশনের, সেদিন প্রথম জেনেছিলাম।

নির্জনে আমাদের দেখে উৎফুল্লে নেচে উঠেছিলেন। দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন ওঁর অফিস ঘরে। কাছাকাছি থাকায় বিজয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আগেই। জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, কেমন লাগছে আপনার, এই ফাঁকা ষ্টেশনে কাজ করতে?

শশধরবাবু বলেছিলেন, কী আর বলব? বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' পড়া আছে? শংকর নামে সেই ছেলেটি, যে নতুন ষ্টেশন-মাষ্টারের কাজ পেয়ে, যেমন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল, আমার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম। তবে এখানে বিশেষ বিশেষ জন্তু-জানোয়ারের ভয়-টয় গুলো নেই। আর একটা দিক জানলেও জানতে পারো, আমি যেমন কোনোদিন ভূত দেখিনি, তেমন কোন ভূতের অস্তিত্বকেও স্বীকার করিনা। এদিকটা তাই অন্যান্য মানুষ ভয় করলেও আমি কিন্তু একেবারে ভয় করিনা।

ভূতের প্রসঙ্গ উঠতেই রূপাই-এর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। বিজয়েরও বোধহয় মনে হয়েছিল। ও বলেছিল, আর বসে কাজ নেই। এবার বাড়ি ফেরা যাক্।

শশধরবাবু আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, সে কী, এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়বে? একটু বসো, গল্প করি।

শশধরবাবুর কথা রাখতে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ। গল্প করে-ছিলাম নানা দিক নিয়ে। এক সময় জানলার বাইরে চোখ

যেতে দেখেছিলাম, অন্ধকার। সন্ধ্যে শেষ হয়ে গেছে। বেশ কিছু তারা চুমকির মত ফুটে আছে আকাশের গায়ে। দূরে কোনও শাঁখ বাজছে। দেরিতে সন্ধ্যে দিতে ব্যস্ত মানুষ। আমি বলেছিলাম, শশধরবাবু, আমরা বাড়ি যাই। বেশী রাত হলে বাড়ি যেতে আবার মুশকিল বোধ করবো।

আর আপত্তি করেননি শশধরবাবু। ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লাইনের ওপর নেমে পড়েছিলাম। বিজয়তো ভয়ে রীতিমত জড়োসড়ো। আমি কোনোদিন ভূত দেখিনি। তবু লোকের মুখে ভূতের ক্রিয়া কলাপের কথা শুনে শুনে আমার মনের মধ্যে ভূত সম্বন্ধে একটা ভয় জড়ো হয়ে আছে। কী করব, বিজয়ের বাড়ি যখন ফিরতেই হবে তখন লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। একবার ভেবেছিলাম, শশধর-বাবুকে বলব, বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে যাবার কথা। কিন্তু শশধর-বাবুর কথাবার্তা শুনে আর ইচ্ছে করেনি। বললেই হয়তো সেদিন তিনি বলতেন, ধ্যাৎ! কলকাতার ছেলে তুমি, তোমার আবার ভূতের ভয়? ভূত-টুত কিস্সু না।

বিজয় ঘন ঘন বলে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি পা চালা। অখিল, তাড়াতাড়ি পা চালা। বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি এখন। বিজয় মনে মনে রাম নাম জপ করে চলেছিল।

হাঁটার গতি বাড়াতে চেয়েছিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠিকমত পারিনি। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হয়েছিল, যে রূপাই বেঁচে থাকতে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছিল, ও মরে যেতে কেন আমরা ভয় করছি? যদি মৃত মানুষ শত্রুই হবে তাহলে, কেন আমরা মৃত্যুর পর আত্মাকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা করি?

হঠাৎ একটা বিকট আ, আ, শব্দ বিজয়ের গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল। মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্তে, ওকে যেন কেউ জড়িয়ে ধরেছে, নিজেকে ছাড়াবার জন্যেই ওর এত শব্দ, চিৎকার।

ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম আমি। বিজয় অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে, ওকে কেউ জড়িয়ে ধরেনি, অথচ ও ভয়ের শব্দ মুখ থেকে

বের করে চলেছিল, অনবরত। দ্রুত জিজ্ঞেস করে উঠেছিলাম, কী হল' কী হল তোর ?

বিজয় নির্বাক মুখ নিয়ে দূরে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়েছিল, একটা টিম টিমে আলোকে। আলোটা ক্রমশঃ নিভতে, জ্বলতে ধেয়ে আসছিল, আমাদের দিকে। আশ্চর্য সে দৃশ্য !

বিজয় কাঁপছিল থরথর করে। আমারও অবস্থা তখন সেই রকম। মনে ভয়, বাঁচার জন্যে আপ্রাণ কিছু ভাবার কথা ভাবছিল সারা মন। বিজয়ের নির্বাক মুখ কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠেছিল, দৌড়ো, ষ্টেশনে আবার পালিয়ে যাবো।

পেছনে ফিরে দৌড়াতে শুরু করেছিলাম। বিজয় আমার অপেক্ষায় না থেকে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ওকে খুঁজে পাইনি। বিপদ হয়েছিল আমার। আমি কলকাতার ছেলে ট্রেন লাইনের ধারে হাঁটা অভ্যেস নেই। তায় আবার ঘন অন্ধকার, চারিদিকে থিক্‌থিক্ করছে। যতবার দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম ততোবার লাইনের এবড়ো খেবড়ো পাথর ও শ্লিপার কাঠে লেগে হোঁচট খেয়েছিলাম। বারবার। হোঁচট খেয়েও প্রাণের দায়ে দৌড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।

মুখ ফেরাতে দেখেছিলাম, দেখেছিলাম, আলোটা প্রায় আমারই কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। কাউকে চিৎকার করে ডাকবো কিনা ভাবছিলাম। ডাকলে কে আসবে সেই অন্ধকারে ? সেই ভেবে আর ডাকিনি। পালাতে চেষ্টা করেছিলাম। তার আগে রূপাই-এর অবিকল গলা আমার কানে ভেসে এসেছিল, দাদাবাবু, একটু দাড়াও, আমি কলকাতা যাবো।

অন্ধকারের মধ্যে রূপাই-এর শরীরটা জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। আলোটাও নিভে গিয়েছিল কখন। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, নিজের চোখকেও মেনে নিতে পারছিলাম না, এ রূপাই কোথা থেকে কী ভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ? এক সময় রূপাই আমার হাত ধরতে যেতে ভয়ে পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ট্রেন লাইনে হোঁচট

খেয়ে সেই যে পড়েছিলাম, আর কোনো খেয়াল ছিল না আমার। তারপর কী হয়েছিল আমি জানি না।

ঠিক ঘুম ভাঙার মত এক সময় আবার আমি জেগে উঠেছিলাম। সমস্ত শরীর জুড়ে ক্লান্তি। হাত, পা টান টান, অবশ। চোখে মুখে জলের ছেটা। মুখের সামনে টর্চ জ্বেলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শশধরবাবু। এক পাশে বিজয়। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল আতঙ্কিত এক ভয়ে। মুখে কোনো কথা নেই। শশধরবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখন কেমন লাগছে?

আমার কী হয়েছিল? সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি তোমায়?

আমার সব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আস্তে আস্তে। বলেছিলাম, রূপাই আমার কাছে এসেছিল ও আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে চায়। কথা শুনে শশধরবাবু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেছিলেন, হাসি থামিয়ে বলেছিলেন, রূপাই? ঐ খণ্ডখোলার রূপাই জানা? ওতো অনেকদিন আগে মারা গেছে। ও কী করে তোমার কাছে আসবে? ওসব কাউকেই দেখনি তুমি, তোমার স্রেফ চোখের ভুল।

শশধরবাবুকে সেদিন আমি শত চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি। রূপাই সত্যি সত্যি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে ও বলেছিল, দাদাবাবু, একটু দাঁড়াও, আমি কলকাতা যাবো।

শশধরবাবুর কাছে এই পরিস্থিতি বোঝানোর আর কী উপায় ছিল জানা ছিল না। নিজেকে একরকম লজ্জিত ভেবে, পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছিলাম। ফিরে সব কথাই ভুলে ছিলাম।

আবার মনে পড়ে গেল, সব কথা, বিজয়ের চিঠি পেয়ে। বিজয় লিখেছে, কিছুদিন আগে লাইনে সিগন্যাল গণ্ডগোল হলে, শশধরবাবু ফ্লাগ আর আলো হাতে নিয়ে গাড়ি পাশ করাতে অন্ধকার লাইনের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি সেই অন্ধকারে, সেইখানেই মরে পড়েছিলেন। কী করে মারা গেছেন সে খবর কারো সঠিক জানা নেই। তবে সকলের ধারণা, রূপাই জানার অশরীরী শশধরবাবুকে মেরে ফেলেছেন?

সত্যি কী তাই? চিঠিটা পাবার পর বারবার আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, কেমন করে সম্ভব, শশধরবাবুর মৃত্যুর জন্যে রূপাই-এর অশরীরী দায়ী? চিঠিটা কয়েকবার পড়ার পর আমার মনে হল, এ প্রশ্নের উত্তর আমার মন জানেনা। কে জানে, তাও আমার জানা নেই।

॥ **সুকুমার সিংহরায়** ॥ জন্ম: ১৯৫৯ সালে ১৪ই জানুয়ারী কলকাতায়। প্রথম গল্প 'মায়াবিনী কল্পনা' ১৯৭৭ সালে একটি ক্ষুদ্র লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। নিজের নামে পূর্বেই বিখ্যাত লেখকের আবির্ভাব হওয়ার জন্যে 'শ্রীনাড়ু' ছদ্মনামে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কিছুটা সময় পেরিয়ে এসে লেখার জগতে 'সুকুমার সিংহরায়' নাম গ্রহণ করেন। এই নামে প্রথম লেখা বেরোয় 'শুকতারা', আয়োজিত 'বিনয় কৃষ্ণ সিংহ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতায়' প্রথম পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি কাগজে তিনি লিখেছেন। প্রথম উপন্যাস 'আদালতের পদাবলী' নবকল্লোলে প্রকাশিত হয়।

একদিন



কিন্নর রায়

তিনি খুব গম্ভীরমুখে বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন।

এখন শেষ বিকেল। দিন-শেষ বিকেল। দিন শেষের সূর্য ছুটি নিতে চাইছে। চারপাশে মাঝ ফাল্গুনের ঝিমধরা রোদ।

উঠোনের মাঝখানে ছ'মানুষ সমান শ্বেতপাথরের পরীর ডান হাত ভেঙে গেছে, ভেঙেছে বাঁ দিকের ডানাও। অত সুন্দর টিকলো খাড়া নাকের ডগাও ভাঙা। তিনি হাত দিয়ে পরীর পা ছুঁলেন। পায়ের ওপর পুরু ধুলো। একটা মাকড়সা দিব্যি হেঁটে গেল তাঁর আঙুলের পাশ দিয়ে।

বেদীর ওপর পরী। পায়ের কাছে চ্যাটালো শ্বেতপাথরের ফোয়ারা। জল নেই। শুকনো পাতা, জঞ্জাল, ধুলো। ফোয়ারায় কত না বাহার ছিলো।

সামনের বাগানে ফুল গাছ একটাও নেই। কি সব গোলাপের ঝাড় ছিলো। আর ছিলো বকুল, স্বর্ণচাঁপা, মুচকুন্দ, গন্ধরাজ। ফুলের গন্ধে ম-ম করত চারপাশ। কয়েকটা আমগাছ এখনও মাথা উঁচু করে আছে। বোল এসেছে গাছে। আম বোলের গন্ধ বেশ। সেই রাণীপসন্দ আর ল্যাংড়া আমের গাছ দুটো দেখা যাচ্ছে না। গত বছরেও ছিলো। কে জানে কেটেকুটে বিক্রী করে দিয়েছে কে।

তাঁর বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তিনি ওপরে উঠলেন। সিঁড়িতে জমাট ধুলো, ইঁদুরের কিচ কিচ, দৌড়োদৌড়ি। দোতলার দু একটা জানলা এখনও আছে। ভেঙে ঝুলে পড়েছে তাঁর শোবার ঘরের দরজার পাল্লা। হা-হা করে বাতাস খেলে যায় ঘরের ভেতর দিয়ে।

কি ভেবে তিনি আবার নিচে এলেন। একতলায় ভৃত্যমহল। চাকর-দাসী, বামুন-ঠাকুরদের থাকার জায়গা। বাঁ দিকে স্বর্ণচাঁপা গাছের তলায় রান্নাশাল। তারও ওপাশে আস্তাবল।

ডান দিকে টানা বড় হলে নাচঘর। তিনি নাচঘরে এলেন। গালচে পাতা নেই! একটা আয়নারও দেখা পাওয়া গেলো না। ঝাড়বাতি, দেয়ালগিরি কিস্যু নেই।

তিনি ভাঙাচোরা ক্লান্ত মানুষের মতো নাচঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সূর্য এখন সাধু সন্ন্যাসীর চোখের মতো। শান্ত স্নিগ্ধ। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকা যায়। কেমন ভেতর অব্দি ধুইয়ে দেয়া গেরুয়া আলো। গাছ থেকে পাতা ঝরছে। শব্দ হচ্ছে সরর্‌সর-সর্‌। তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

মনে পড়লো এমনই এক বসন্তবেলায় অনেক অনেকদিন আগে নাচঘরে বসেছিল গানের আসর। ঠুংরি টপ্পার মহেফিল। নিধু-বাবুর টপ্পা শুনতে শুনতে মাত হয়ে গেছলেন তিনি আর তাঁর দোস্ত-ইয়াররা। কি সব গানের লাইন, ভালোবেসে ভালো

কাঁদালে/ভালোবাসা জানালে। কত না বাজি পুড়েছিল সে রাতে। রং পালটে গেছল রাতের।

এখন জোরে বাতাস দিলে ধুলো ওড়ে। কি যে ঘ্রাণ ধুলোয়। এ সুঘ্রাণ বুক ভরিয়ে দেয়।

তিনি আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। এসে থমকালেন শোয়ার ঘরের সামনে। ভাঙা পাল্লা একদিকে ঝুলে আছে। চারপাশ থেকে আসছে হাহাকার করা বাতাস। তিনটে চামচিকে তাঁর ঘর থেকে ডানা ঝাপটে বেরিয়ে এলো। তিনি মাথা নিচু করলেন।

আস্তে আস্তে পা রাখলেন ঘরে: মেহগেনি কাঠের জোড়া পালঙ্কের একটাও নেই। নেই অনেক কিছুই। কেবল বাঁ দেয়ালে সেই দাগটা এখনও মিলিয়ে যায়নি। গোল দাগটার দিকে তাকিয়ে তিনি বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

চারপাশে বেশ অন্ধকার। এখানে দাঁড়িয়ে দূরে দূরে জ্বলে থাকা আলো নজরে পড়ে। বাগানে জোনাকিদের খেলা। আস্তে আস্তে চাঁদ উঠে এলো।

তিনি পায়ে পায়ে ছাদে উঠে এলেন। ছাদের একপাশে মস্ত ফাটল। বোঝা যায় ক'দিনের মধ্যেই ওটা ধ্বসে যাবে। এখানে সেখানে ইটের ফাঁকে গজিয়েছে বট অশ্বথের চারা। আগাছার ঝোপ। তিনি একটা টানা নিশ্বাস ফেললেন।

আকাশে ভরা চাঁদ। সময়টা শুক্ল পক্ষ। প্রতি বছরের এমন দিনে কি এক টানে তিনি এখানে চলে আসেন। পুরনো কথা ভাবেন, ভাবতে ভালো লাগে।

ছাদে বসে এই জ্যোৎস্না তলার মৃদু ফাল্গুনী বাতাস গায়ে মেখে তাঁর ইচ্ছে হল ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে মকরমুখো রূপোর নলে অম্বুরি তামাক খেতে। সঙ্গে কেওড়া দেয়া সরবত।

চাঁদের দিকে তিনি আবার চাইলেন। চেয়েই থাকলেন।

হঠাৎ একজন এসে দাঁড়াল। তিনি তাঁর জমিদারী গলায় বললেন, কে হে?

সে লোকটা তাঁকে কোনরকম সহবৎ না করে বলল, তুমি কে ?

তাঁর খুব রাগ হল। মনে হল এখুনি লোকটার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এত বড় স্পর্ধা, মুখে মুখে কথা বলে !

নিজেকে খুব সামলে নিয়ে তিনি বললেন, আমি এবাড়ির মালিক।

তাঁর কথায় সেই কালোমতো-নতুন-আসা সে খুব হাসলো। বলল, গুল মারার জায়গা পাওনি। রেললাইনে কাটা পড়ার পর থেকে এখানেই আছি। তা প্রায় মাস আষ্টেক হয়ে গেল, কই তোমাকে তো একদিনও দেখিনি বাবা। এখন বলছ মালিক।

এবার তিনি হাসলেন। এক মহামহিম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হাসি তাঁর সরু গোঁফের ফাঁক থেকে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে গেল। মনে মনে ভাবলেন নেহাতই অর্বাচিন ভূত। সমাজের কলঙ্ক। সবে আট মাস।

তিনি আচমকা কালোমতো তার হাত ধরে টানলেন। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন নিজের শোয়ার ঘরে। বললেন, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, বুঝলে, এই ঘরে এমন দিনে নিজেকে নিজে গুলি করেছিলুম। বাঁ দিকের দেয়ালে এখনও সেই গুলির দাগ আছে। তাকালেই দেখতে পাবে।

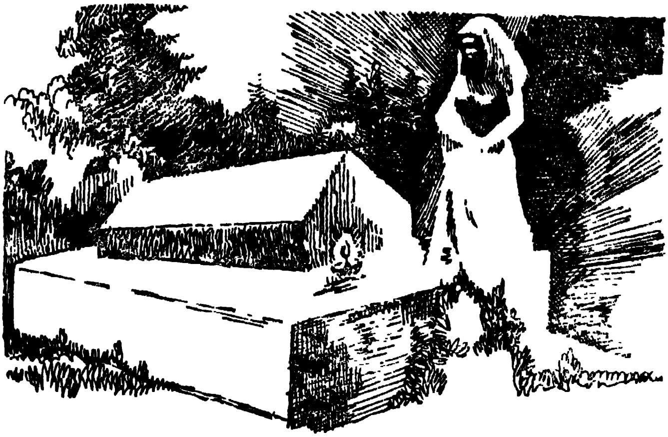
অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পেলো না।

ফিস ফিস করে বলল, গুল মারছে রে—।

এবার তিনি ফেটে পড়লেন। তাঁর পুরনো জমিদারি মেজাজ উসকে উঠলো এ কথা শুনে। সপাটে তার গালে একড়া চড় মেরে তিনি বললেন, এখানকার মানুষেরা তো ভূত বিশ্বাস করেই না। তাই বলে ভূতও ভূতকে বিশ্বাস করবে না !

॥ **কিন্নর রায়** ॥ জন্ম : ১৯৫৩ সালের ৬ নভেম্বর। কলকাতা। চেতলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় ও বাবা-মার দেয়া নাম দীপঙ্কর রায়। সাংবাদিকতা করেন ওই নামে। বর্তমানে দৈনিক বসুমতীর দক্ষিণ শহরতলার সংবাদদাতা। গল্প কবিতা উপন্যাস লেখেন। প্রকাশিত উপন্যাস 'কাছেই নরক'।

লেখকের লেখার প্রথম ও শেষ কথা মানুষ। যে মানুষ চিরকালেই বিদ্রোহী। লেখক ভূতে বিশ্বাস না করলেও তাঁর এই গল্পে ভৌতিক গল্পের এক ভিন্নতর স্বাদ আছে।



মোতিবিবির দরগা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কী এক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যেন দরজা খোলার শব্দ। চোখ খুলে দেখি, ঘর অন্ধকার। একটু অবাক লাগল। আমার অভ্যাস জানলা খুলে রাখা। কেন জানলা বন্ধ করে শুয়েছি কয়েকমুহূর্ত ভেবেই পেলাম না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা। অমনি ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। শরীরে এতটুকু জোর নেই। মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে। তেষ্টাও পেয়েছে। তাই ওঠা দরকার। মনে পড়ছে, কোনার দিকে কুজোয় জল রেখে গেছে দরবেশ সায়েব। বলে গেছে, অসুবিধে হলে ডাকবেন। পাশের ঘরেই আছি। কিন্তু ডাকতে গিয়ে টের পেলাম, গলায় আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

কেন যে সেই অলুক্ষণে বাসটায় চেপেছিলাম! অত ভিড়ের বাসে চাপার অভ্যাস নেই। পারি না। ইচ্ছে করলে বন্ধুর বাড়িতে রাতটা আরামে কাটিয়ে আসতে পারতাম। ভোরের বাসটা নাকি খালিই যায়। অথচ কী এক ভূতুড়ে জেদ আমাকে পেয়ে বসেছিল।

সন্ধ্যার দিকে আগাপাছতলা লোকে ঠাসা বাসটা এসে দাঁড়াতেই নির্বোধের মতো গুঁতো মেরে ঢুকে গেলাম। পাদানিতে অনেকগুলো পায়ের ওপর পা রেখেছিলাম। ওরা আপত্তি করছিল। বাসটা স্টার্ট দিয়ে খুব জোরে চলতে শুরু করল। প্রায় মাইলটাক ঝগড়া-ঝাঁটি চলতে থাকল গেঁয়ো লোকগুলোর সঙ্গে। তারপর কে যেন আমাকে হ্যাঁচকা টানে চলন্ত বাস থেকে টেনে নামাল। অর্থাৎ আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস পীচের ওপর পড়ি নি। রাস্তার ধারে পুরু ঘাসের ওপর পড়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, টের পেয়েছিলাম সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে অদ্ভুত একচোখো একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনটার আলোর রং নীল। এমন নীল কাচেঢাকা বাতি নিয়ে মানুষ ঘোরাঘুরি করে কস্মিনকালে দেখি নি। আলোর পেছনে আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম লোকটাকে। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড। সে আলোটা আমার পাশে রেখে গম্ভীর গলায় বলেছিল—কে আপনি? এভাবে রাস্তার ধারে শুয়ে আছেন কেন? নেশা করেছিলেন বুঝি?

অত কষ্টের মধ্যে হাসি পেয়েছিল।—মাতাল নই। বাস থেকে পড়ে গেছি। তারপর কী হয়েছে, জানি না।

—সে কী! বলে লোকটা আমার পাশে ঝুঁকে এসেছিল তারপর লণ্ঠনটা তুলে পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিয়ে বলেছিল—জখম হন নি তো?

—বুঝতে পারছি না। রক্তটক্ত দেখতে পেলেন কি?

—না। তবে হাড়ে আঘাত লাগতেও পারে। টের পাচ্ছেন না কিছু?

—কে জানে!

—ওঠার চেষ্টা করুন তাহলে। কাছেই আমার ডেরা।

এখন যেমন শরীরের অবস্থা, তখনও ঠিক এমনি ছিল। লোকটা শেষে আমাকে দুহাতে শূন্যে উঠিয়েছিল। তারপর ফের জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফিরে দেখেছিলাম, এই ঘরে শুয়ে আছি

খাটিয়ায় বিছানার ওপর। সেই নীল আলোর লণ্ঠনটা নেই। ঘরের মেঝেয় একটা হেরিকেন রয়েছে। আর আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলখেল্লাধারী নীল লম্বাচওড়া এক দরবেশ। কালো আলখেল্লা। গলায় লাল-নীল পাথরের মালা। কাঁচাপাকা চুল ও দাড়ি। খাড়া নাক। লালচে টানাটানা চোখ। তার হাতে একটা গেলাস। আমাকে চোখ খুলতে দেখে বলেছিল—সরবতটা খেয়ে নিন। কই, হাঁ করুন। খাইয়ে দিচ্ছি।

একটু ঝাঁঝালো সুগন্ধ সেই সরবত কয়েক ঢোক গেলামাত্র আমার শরীরে যেন বিদ্যুতের খেলা শুরু হয়েছিল। ভয় পাওয়া গলায় বলেছিলাম—এ কিসের সরবত ?

দরবেশ হেসেছিল।—ভয় পাবেন না। বিষ নয়। খুব উপকারী দাওয়াই আছে ওতে। এক্ষুণি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

একেবারে সুস্থ হতে না পারলেও উঠে বসার শক্তি ফিরে পেয়েছিলাম। তারপর ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম, বিশাল মাঠের মধ্যে এক দীঘির ধারে নির্জন দরগায় আমি আশ্রয় পেয়েছি। এর নাম মোতিবিবির দরগা। এক তপস্বিনীর কবর আছে এখানে। তার ওপর একটা পাথরের ঘর আছে। সেই ঘরে দরবেশ থাকে। পিদীম জ্বালে। আগরবাতি পোড়ায়। সাধনা-টাধনা কী সব করে। এই ঘরটা পরে ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। ভক্ত বা দৈবাৎ বিপদে পড়ে কেউ এলে তাকে এ ঘরে থাকতে দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে দরবেশ আমাকে খান দুই মোটা রুটি আর খানিকটা গুড় দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—মেহেরবানী করে এই দিয়েই খিদে মিটিয়ে নিন। আমি ফকির। বুঝতেই পারছেন অতিথির উপযুক্ত খাতির করার সাধ্যি আমার নেই।

—এই যথেষ্ট। তবে খিদে আমার বিশেষ নেই। আপনি এগুলো ···

দরবেশ আপত্তি করেছিল।—না, না। আপনার কিছু খাওয়া দরকার। খেলেই গায়ে জোর হবে। আল্লার দয়ায় আপনি বেঁচে

গেছেন। ওভাবে চলন্ত বাস থেকে পড়লে মানুষ বাঁচে না। যদি ব বাঁচে, হাড়গোড় আস্ত থাকে না।

আমার হাড়গোড় আস্ত আছে, তা ঠিক। কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। দরবেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতেই রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরেছিলাম।…

ফের সেই শব্দটা হল।

খুব পুরনো জংধরা লোহার কপাট খোলার মতো শব্দ। কিন্তু কিছুটা চাপা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ঘর। অন্ততঃ তেষ্টা মেটানোর জন্যে যথাশক্তি চেষ্টা করলাম উঠে বসতে। তারপর মনে পড়ল, পানজাবির পকেটে দেশলাই আর প্যাকেটটা আছে। সিগারেটও আছে। পানজাবিটা মাথার কাছে রেখেছিলাম। অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে দেশলাই আর প্যাকেটটা বের করলাম। দেশলাই জ্বেলে কুঁজোর কাছে গেলাম। মাথা ঘুরছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আবার জ্ঞান হারাব। কুঁজোর মুখে গেলাস আছে। দেশলাই কাঠিটা নিভে গেল। আন্দাজ করে জল ঢেলে চোঁ চোঁ করে গিলে ফেললাম। তারপর খাটিয়ায় ফিরে এসে সিগারেট ধরালাম।

তৃতীয়বার দরজা খোলার মতো বিশ্রী চাপা শব্দটা শোনা গেল। তারপর মনে হল, বাইরে এইমাত্র যেন ঝড় এসে পড়েছে। শনশন শোঁ শোঁ আওয়াজ বাড়তে থাকল। ছোট্ট দুটো জানলা আছে দুদিকে। একটা জানলা আচমকা খুলে গেল। ঘরে হু হু করে ঢুকে পড়ল ঝড়টা। কষ্ট করে উঠতেই হল। জানলাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াতে পারলাম। কিন্তু জানলাটা কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না। ঘরের ভেতর খড়কুটো ধুলোবালি ঢুকে পড়ছে ঝড়ের সঙ্গে। বাইরের ঘরে ঘন কালো অন্ধকারে কী এক প্রাণী যেন হুলুস্থুল বাধিয়েছে। তারপর বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে থাকল। বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। তখন ভাঙা গলায় ডাকার চেষ্টা করলাম—দরবেশ সায়েব! দরবেশ সায়েব!

কোনও সাড়া এল না। দরজা অনুমান করে পা বাড়ালাম।

দরজাটা খুঁজে পাওয়ার পর যেই ছিটকানি খুলতে গেছি, কানে এল চেরা গলায় সুর ধরে কেউ গান করছে বাইরে।

এই দুর্যোগের রাতে রাতে নির্জন দরগায় দরবেশের হঠাৎ গান করার ইচ্ছে কেন, জানি না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় যেন হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিল। বারান্দায় ছিটকে পড়লাম। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বললাম—আমার জ্ঞান হারালে চলবে না। মাথা ঠিক রাখতেই হবে।

বারান্দার সামনে বিদ্যুতের আলোয় ছোট্ট একটা উঠোন আর ইঁদারা চোখে পড়ছিল। দরবেশের ঘরের দিকে দেওয়াল ধরে এগোতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, বিদ্যুতের আলোয় মুহূর্তের জন্যে একটা সাদা ঝলসানো মূর্তি এবং মূর্তিটি স্ত্রীলোকের তাতে ভুল নেই—ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম—কে? কে ওখানে?

ফের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। ফের দেখতে পেলাম মূর্তিটা। কিন্তু এবার সে ইঁদারার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ভুতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভয়ঙ্কর রাতে নির্জন দরজায় সেই বিশ্বাসের ভিত্তিটা নড়বড়ে হতে বাধ্য। ওদিকে সেই চেরা গলায় গানটা সামনে শোনা যাচ্ছে। আমি মরীয়া হয়ে ফের দরবেশকে ডাকলাম। তারপর দরবেশের ঘরের দরজায় জোরে ধাক্কা দিলাম।

দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে পিদ্দীম জ্বলছে কালো একটা বেদীর শিয়রে। দরবেশ নেই। এ দিকটা ঝড়ের উল্টোদিকে। তাই ঘরে ঝড়টা ঢুকছে না। ইঁদারার ধারে মেয়েটিকে ভূত ধরে নিয়েই আমি আক্রান্ত প্রাণীর মতো ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

হ্যাঁ, বেদীটাই কবর এবং সম্ভবতঃ কষ্টিপাথরে তৈরী। ফার্সিতে কী সব লেখা আছে। কিন্তু পরক্ষণে চমকে উঠলাম। বেদীর ওপাশে তিনটে মড়ার মাথা রয়েছে। আবছা আলোয় মাথাগুলো বিকট দেখাচ্ছে। আরও ভয় পেয়ে পেলাম।

এমন সময় বাইরে সেই গানটা থেমে গেল এবং মনে হল প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

বেদী থেকে একটু তফাতে কম্বলের আসন পাতা ছিল। সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম। তারপর—আশ্চর্য, বন্ধ করে রাখা দরজাটা হঠাৎ মচমচ করে উঠল। তারপর খুলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদীর পিদীমটা নিভে গেল।

দরজার সামনে সেই নীল একচোখো লণ্ঠন হাতে দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে। সে আলোটা ঘরের ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে কিছু দেখে নিল। তারপর বেদীর দিকে ঘুরিয়ে রাখল।

দরবেশ আমাকে লক্ষ্যও করল না। তার সিল্যুট মূর্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দারুণ চমকে উঠলাম। এ কি কোনও জীবিত মানুষের মুখ হতে পারে? দৃষ্টি কেমন অদ্ভুত—নিষ্পলক, শূন্য। হাঁটু ভাঁজ করে পুতুলের মতো বসে পড়ল সে কবরের সামনে। তেমনি মৃতের চোখে তাকিয়ে বসে রইল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। ঝড়ের শব্দ। বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর শেষ মুহূর্তটি আসন্ন। এদিকে বেদীর মতো কবরের ওপর লণ্ঠনটে নীল আলো থেকে ক্রমশঃ ধূপের ধোঁয়ার মতো ধুসর বা নীল কী আবছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। তারপর নাকে তীব্র হয়ে ঝাপটা দিল একটা কড়া সুগন্ধ। সুগন্ধটা অসহ্য লাগছিল। চেতনা অবশ করে দিচ্ছিল।

তারপর আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখলাম, ইঁদারার ধারের সেই মেয়েটি যেন শূন্যে ভেসে এল এবং ধোঁয়ার মতো দরবেশকে ভেদ করে এগিয়ে বেদীর ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

নীলাভ শরীর তার—হয়তো নীল আলোটাই এর কারণ হতে পারে। সে সুন্দর, না কুৎসিত, না সাধারণ—বুঝতে পারছি না। হয়তো সেই বোধও হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সে একেবারে নগ্ন।

আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। দরবেশ ফের চেরা গলায় গান গেয়ে উঠল। কিন্তু এবার সুরটা অনেক মিঠে এবং চাপা। ঘুমঘুম আচ্ছন্নতায় দুর্বোধ্য কী এক গান গাইছে সে। সুরটাও অপরিচিত।

একটু একঘেয়েও। কিছুক্ষণ পরে নগ্ন নারীমূর্তিটি বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাল এবং তার চমক ও টের পেলাম। সে অস্ফুটস্বরে একেবারে মানুষের গলায় আমার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল—ও কে?

সঙ্গে সঙ্গে দরবেশ ঘুরল আমার দিকে। প্রচণ্ড গর্জন করে বলল—বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান বলছি। কেন এ ঘরে ঢুকেছেন আপনি?

নীল আলোটাও নিভে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এখন। বাইরে ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছে। অন্ধকারে একটা হাত এসে আমার কাঁধে খামচে ধরল। তারপর দরবেশ আমাকে টেনে ওঠাল এবং একটা থাপ্পড়ও মারল গালে।

ব্যাপারটা অপমানজনক। কিন্তু বাধা দেবার বা প্রতিবাদের ক্ষমতাও ছিল না এতটুকু। অসহায়ভাবে তার হ্যাঁচকা টানে কতকটা শূন্যে ভেসে চললাম। এই দৈত্যের কাছে আমি নেহাৎ বামন।

ভেবেছিলাম, আমাকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বের করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছু করল না। পাশের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে বলল—খবর্দার, আর বেরুবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনাকে বাঁচাতে পারব না। হুঁশিয়ার!

সে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিল। আমি ভাবতে থাকলাম, ব্যাপারটা কি স্বপ্নে ঘটছে? নাকি সেই উগ্র আরক মেশানো সরবতের নেশায় যত সব উদ্ভট কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি?

কিন্তু না তো! আমি সজ্ঞান পুরোপুরি—যদিও শরীরে প্রচণ্ড দুর্বলতার দরুন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট বিছানায় রেখেছিলাম। খুঁজে নিয়ে প্রথমে লণ্ঠনটা জ্বালালাম। তারপর সেই জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। ঘরের মেঝেয় যথেষ্ট বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়েছে ততক্ষণে। বিছানার একটা পাশ ভিজে গেছে।

সিগারেট টানতে টানতে সেই দৃশ্যটা আগাগোড়া ভাবতে থাকলাম ফের! যা দেখলাম, তা বাস্তব, না অবাস্তব? সত্যি দেখেছি, না স্নায়ুবিকার?

শেষে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে লণ্ঠনটা নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টির জোরালো ভাবটা অনেক কমেছে। শীতবোধ হচ্ছে। পানজাবিটা পরে ধুতির কোঁচাটাও খুলে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ফের কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

এবারকার শব্দটা দরজা খোলার মতো নয়। কেউ কি আর্তনাদ করল কোথাও? ঘুম ভাঙার পর কয়েক সেকেণ্ড তার জের ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস হল, একটা প্রচণ্ড আর্তনাদই শুনেছি।

দরবেশকে ডাকা বৃথা। তাছাড়া লোকটার অমন ভূতুড়ে ব্যাপর-স্যাপার এবং আমার প্রতি অমন আচরণ—মন বিষিয়ে গেল।

কান পেতে থাকলাম। আর কোনও আর্তনাদ নয়। কিন্তু কে যেন চাপা গলায় কাঁদছে বাইরে। বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও বড় গাছ আছে। তার পাতা থেকে জল ঝরছে। ঝড়টা থেমেছে।

বদ্ধ ঘরে দম আটকে আসছিল। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। ঘরে বিষাক্ত গ্যাস জমার ভয়ে। এবার উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ছে। দূর দিগন্তে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু মেঘ ডাকছে না।

লণ্ঠনটা আর জ্বাললাম না। কান্নার শব্দ সমানে শোনা যাচ্ছিল। পা টিপেটিপে এগিয়ে সাবধানে নিঃশব্দে দরজা খুললাম। তারপর বারান্দায় গেলাম। তেমনি অন্ধকার হয়ে আছে বারান্দা। কান্নার শব্দটা কবরের ঘর থেকেই আসছে।

নিঃশব্দে ও ঘরের দরজায় উঁকি দিলাম। সেই নীল আলোটা

তেমনি লম্বাটে হয়ে বেদীর ওপর পড়ে আছে। তারপর যা দেখলাম, আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনও দেখি নি।

বেদীর ওপর মাথা রেখে দরবেশ চিত হয়ে দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। এবং তার গলাটা জবাই করা। চাপ চাপ টাটকা রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ দুটো তেমনি নিষ্পলক।

সেই মেয়েটির সিল্যুট নগ্ন মূর্তি বেদীর পাশে এবং সে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কালো একরাশ চুল সামনের দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। দু হাঁটু ভাঁজ করে একটু ঝুঁকে বসে সে বিলাপ করছে।

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মাথা ঘুরতে থাকল। যা দেখতে পাচ্ছি, তা কি স্বপ্নে, না বাস্তবে? কী করা উচিত ভেবে পেলাম না। আতঙ্কে কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

তারপর কী একটা আমার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

একটা কালো প্রকাণ্ড বেড়াল।

বেড়ালটা নিঃশব্দে এগিয়ে বেদীর ওপর উঠল এবং দরবেশের মুখ চাটল। তারপর সে জিভ বাড়িয়ে দিল। আতঙ্ক বেড়ে গেল, যখন দেখলাম সে দরবেশের গলায় কাটা জায়গাটা থেকে রক্ত চেটে খাচ্ছে।

বেড়ালটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্না থামিয়েছিল। সে মুখ তুলে বেড়ালটাকে দেখতে থাকল। বেড়ালটা রক্ত চাটতে চাটতে ভয়ঙ্কর মুখ তুলে যেন আমাকেই লক্ষ্য করছিল মাঝে মাঝে। এর ফলে স্নায়ুর ওপর বরাবার আঘাত আসছিল। অসহ্য লাগায় একটু সরে গেলাম।

এই সময় ডাইনে ঘুরে আরেক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম।

অন্ধকারে একটু দূরে তিনটে আলো আসছিল। হঠাৎ তিনটে আলো মিলেমিশে একটা হয়ে গেল এবং প্রকাণ্ড আলোটা হলুদ বলের মতো ভাসতে ভাসতে এসে স্থির হল। তারপর আলোটা বুদবুদের মতো অনেকগুলো ভাগ হয়ে গেল।

এদিকেই আসছে দেখে আমি দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম এবং দরজা নিঃশব্দে ভেজিয়ে কপাটের ফাঁকে চোখে রাখলাম।

আলোগুলো বুদবুদের ঝাঁকের মতো এবং এত চঞ্চল যে গোনা যাচ্ছে না। অনুমান করলাম এক ডজনের কম নয়।

আলোগুলোর কিন্তু একটুও ছটা নেই। অর্থাৎ কোন কিছুকে আলোকিত করছে না।

আলোগুলো নাচতে নাচতে এসে বারান্দায় উঠল এবং কবরের ঘরেই ঢুকল, তা ঠিক। তারপর ওঘরে চাপা গলায় কারা কথা বলছে শুনলাম।

কয়েক মিনিট পরে দেখি, মেয়েটি সেই নীল লণ্ঠন নিয়ে বেরুল। আবছা দেখা যাচ্ছিল, তার পরনে এখন শাড়ি রয়েছে। তার পেছন পেছন অনেকগুলো সিল্যুট মূর্তি যেন শূন্যে হেঁটে যাচ্ছে। বেড়ালটাকে দেখতে পেলাম না।

ওরা অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কবরের ঘরের দরজা খোলা। আলো তুলে ধরে দেখি, দরবেশের জবাই করা শরীরটা তেমনি পড়ে আছে এবং গলার ফাঁকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক ফোঁটা রক্ত নেই। বেড়ালটা সব চেটে-পুটে খেয়ে ফেলেছে।

ঘরের ভেতর লণ্ঠনটা ঢোকাতেই কালো বেড়ালটা কোণার দিকে বসে আছে দেখতে পেলাম। সে নীল উজ্জ্বল চোখে তাকাল। মুখে রক্ত লেগে আছে।

তারপর সে দ্রুত আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেদীর কাছে গিয়ে দরবেশের গায়ে হাত রাখলাম। আলখেল্লাটা ভিজে রয়েছে। নাড়িতে স্পন্দন নেই। বরফের মতো হিম শরীর।

হঠাৎ সেই সময় চোখ গেল, সেই তিনটে মড়ার মাথার দিকে।

তিনটে মুণ্ডু নড়তে শুরু করেছে।

নড়তে নড়তে বলের মতো তারা আমার দিকে গড়িয়ে আসতে থাকল। আর সহ্য করতে পারলাম না। লণ্ঠনটা তাদের ওপর ছুড়ে মারলাম। কাচ ভেঙে গেল। তেল ছড়িয়ে আগুন ধরে গেল। তার মধ্যে মুণ্ডু তিনটে নাচতে থাকল।

একলাফে আমি বারান্দায় পৌঁছুলাম। তারপর অন্ধকারে

কীভাবে যে এগোলাম, বলার নয়। আছাড় খেলাম কতবার। কাদায় জলে জামাকাপড় আর শরীর যাচ্ছেতাই মাখামাখি হল। কিছুটা এগিয়ে আবছা ধুসর আলোয় ভরা মাঠে পৌঁছুলাম।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটুকরো ভাঙা চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। সামনে পীচের পথটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দরগার এদিকটা বিশাল পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। কালো হয়ে আছে। বুঝলাম, জায়গাটা ঘন জঙ্গলে ভরা।

রাস্তায় পৌঁছে সাহস বেড়ে গেল। হাঁটতে থাকলাম। শরীরের সেই দুর্বলতাটা আর নেই। দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। মনে পড়ল, ওধারে সেই ছোট্ট চটি। যেখান থেকে বাসে চেপেছিলাম কাল সন্ধ্যায়।

আলোটা লক্ষ্য করে চলতে থাকলাম।

লোহাগড়া ব্লকে নিশীথ—আমার বন্ধু নিশীত রায়চৌধুরী কৃষি অফিসার। ভোরবেলা আমাকে জলকাদামাখা ভূতুড়ে চেহারায় দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল।

সংক্ষেপে তাকে মোটামুটি সবটাই বললাম। সে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল—ঠিক আছে। আগে বাথরুমে ঢোক। আমার বউ বড্ড ঘুমকাতুরে। বেলা করে ওঠে। তোকে এ অবস্থায় দেখলে হুলুস্থুল ঘটাবে।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান করে এবং নিশীথের পাজামা পাঞ্জাবি পরে আরামে বসলাম। ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। নিশীথ চা করে আনল।

চা খেতে-খেতে বললাম—এতক্ষণে কোমরে ব্যথা করছে একটু একটু।

নিশীথ বলল—ফিরে গিয়ে এক্সরে করাস্। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঝড়জলের সময় মোতিবিবির দরগায় নিশ্চয় তুই ভীষণ রকমের দুঃস্বপ্ন দেখেছিস। তাছাড়া এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

—অসম্ভব! দরবেশের ডেডবডিটা নিশ্চয় এখনও আছে। বরং পুলিশে খবর দেওয়া যাক্।

নিশীথ হাসল।—কী বলছিস! ওখানে কেউ থাকে না। সে রকম কোনও ঘর-টরই নেই। তবে একটা কবর আছে বটে এবং সেটা কষ্টিপাথরে তৈরি। তুই বাস থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি—তা ঠিক। জ্ঞান ফেরার পর নিশ্চয় ঝড়ের সময় আশ্রয় নিতে দরগায় ঢুকেছিলি। তারপর আঘাত পাওয়ার রিঅ্যাকশনে জ্বর-টর এসে গিয়েছিল। তারপর লম্বা চওড়া একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

রেগে গিয়ে বললাম—ঘর নেই তো ঝড়বৃষ্টিতে ছিলাম কোথায়?

নিশীথ বলল—নিশ্চয় দরগার বটতলায় গিয়ে ফের অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি।

—অসম্ভব। এক্ষুনি আয় আমার সঙ্গে। স্বপ্ন হতেই পারে না। আমার ব্যাগ-ট্যাগ সব ওখানে আছে।

নিশীথ একটু হেসে বলল—ঠিক আছে। তোর ভুলটা ভাঙানো দরকার। একটু পরে ব্লকের জিপটা নিয়ে বরং বেরুব।

মুর্শিদাবাদ-সাঁওতাল পরগণা সীমান্তের এই দড়গাটার নাম লোহাগড়া—বরমডি রোড। বরমডিতে রেলস্টেশন আছে। সেখান থেকে আমার বাড়ি পৌঁছুনোর অসুবিধে নেই। তাই নিশীথের বউয়ের কাছে দ্বিতীয় দফা বিদায় নিয়ে বেরুলাম। হাসতে হাসতে বলল—আপনি আবার ভূতের পাল্লায় পড়ে ফিরে আসুন! তবে আপনার বন্ধুর সাহসটা বড্ড বেশি। দেখবেন, সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে দরগায় না থেকে যায়। ও ভীষণ ভক্ত ন্যুডের। দেখছেন না, কত ন্যুড আর্ট টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে?

মিনিট পঁচিশ এগিয়ে রাস্তার ধারে জিপ রেখে আমরা দরগার দিকে পা বাড়ালাম।

তারপর থমকে দাঁড়ালাম। নিশীথ বলল—কী হল?

বললাম—দেখ্, দেখ্! সেই কালো বেড়ালটা!

একটা কালো বেড়াল ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড চত্বরে বসে একটা থাবা তুলে গাল চুলকোচ্ছে। চত্বরের মাঝখানে কষ্টিপাথরের কবর। বেড়ালটা থাবা নামিয়ে আমাকে দেখতে থাকল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই কবরটা! ফার্সিতে লেখা ফলকটাও!

কিন্তু এ তো ফাঁকা জায়গায় রয়েছে। ওপাশে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। নিশীথ এগিয়ে গিয়ে জলকাদায় পড়ে থাকা আমার ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে বলল—তোর ব্যাগ নিশ্চয়?

এই সময় ড্রাইভার একটু কেসে বলল—স্যার, শুনেছি এখানে এক ফকির থাকতেন। পরে তাঁকে কারা মার্ডার করেছিল। মেয়েমানুষ নিয়ে গণ্ডগোল।

শুনে আমার মাথা ঘুরতে থাকল। ব্যস্ত হয়ে বললাম—নিশীথ, চলে আয়······

॥ **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ** ॥ জন্ম ১৯৩০ সালে মুর্শিদাবাদের খোসবাসপুর গ্রামে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুস্তাফা সিরাজ একজন স্বতন্ত্র ভঙ্গির লেখক। গ্রাম বাংলার ধূলি মালিন মাঠে, ঘাটে অতিক্রান্ত যৌবন লেখক তাঁর গ্রামীন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল ফলান তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে তাঁর ভাষার প্রাঞ্জল্য ও সরসতা আমাদের চমৎকৃত করে। পরিণত বয়ঃক্রমে কলিকাতাবাসী লেখক নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বহু গল্প, ও উপন্যাস আমাদের উপহার দেন। তাঁর রহস্য গল্পও আমাদের আকৃষ্ট করে। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে মানব মানবীর জীবনের দ্বন্দ্ব, ও অন্তর্লীন সংঘাত এক নূতন শৈল্পিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। তাঁর সাহিত্যের ভাষায় গ্রামজ শব্দের সংযোজন ঘটেছে বারবার। তাই তাঁর অনেক লেখা আমাদের "তারাশঙ্কর" বা টমাস্‌হার্ডির কথা স্মরণ করায়। লেখক ১৯৮০ সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছেন।



"সহযাত্রী"

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশ যাত্রী আমি একা। এ কামরায় যে ক'জন যাত্রী ছিলেন তাঁরা নেমে গেছেন দু'চারটে ষ্টেশন আগেই কেউ দুর্গাপুরে, কেউ বা আসানসোলে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। গাছপালা নদীনালার ওপর কে যেন কালির ছোপ বুলিয়ে দিয়েছে। পৌষের রাত, কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পায়ে খিল ধরে যেন। জানলার কাচটা তুলে দিয়ে, পুরু কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢেকে ষ্টল থেকে সদ্য কেনা একখানা ইংরেজী নভেল পড়ছিলাম নিবিষ্টচিত্তে। হঠাৎ গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়ে এল, গাড়ী এসে থামল একটা ষ্টেশনে। বাইরে থেকে কুলীদের—চীৎকার কানে ভেসে এল—"বরাকর! বরাকর! বইখানা প্রায় শেষ করে এনেছি। ঘুমও নেমে এসেছে চোখে। ভাবলাম, বেঞ্চির ওপর বিছানাটা ছড়িয়ে একটু তন্দ্রাসুখ উপভোগ করি। সরকারী চাকুরী করি, ধানবাদে চলেছি অফিসের

কাজে। আরো ঘণ্টা দুই লাগবে ধানবাদে পৌঁছতে। মিনিট পাঁচেক পরেই গার্ডের হুইসিল শুনতে পেলাম, গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ীটা সবে চলতে সুরু করেছে এমনি সময়ে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার কানে এল আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে কে একজন হঠাৎ ঢুকে পড়ল আমার কামরার ভেতরে। লোকটা বোধ করি তাল সামলাতে পারেনি, হুমরি খেয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছেই। লোকটা আচমকা হুড়মুড় করে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ায় প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তাকালাম ওর দিকে। মেঝের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে লোকটা হাঁপাচ্ছে মুমূর্ষু রোগীর মতো, মাঝে মাঝে শরীরটা কেঁপে উঠছে থরথর করে। মুহূর্তের জন্য ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। লোকটা কোন মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগছে না তো? হয়তো এখনই আমার চোখের সামনে এমন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে যা প্রতিরোধ করার শক্তি আমার নেই। না, ভয়ের কোন কারণ নেই। লোকটা এখন স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে। যন্ত্রণার কোনো লক্ষণ নেই। নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে সহজভাবে। একটু ইতস্তত করে গলাটা একটু চড়িয়ে বললাম "কি হে বাপু, একটু সুস্থ হয়েছ তো? যাও ওধারে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়।"

আশ্চর্য আমার কথা শেষ হতে না হতেই লোকটা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে ওধারের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল। কামরার দরজাটা যে খোলা রয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। মনে মনে বিরক্ত হয়ে আমি উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসে রইলাম চুপ করে। ঘুমোতে ইচ্ছে করল না। আকস্মিক উত্তেজনার দরুণ তন্দ্রার ঘোরটা কেটে গেছে। বেশ কয়েক মিনিট কাটল এইভাবে। আমার অজান্তে আমার চোখ দুটো ওধারের বেঞ্চিতে বসা লোকটার চারপাশে বারবার ঘোরাফেরা করতে থাকে। লোকটাকে কেমন যেন চেনা মনে হয়। গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে ভরা ঐ প্রকাণ্ড মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ চ্যাপ্টা নাক, ডান ভুরুর উপরে একটা কাটা দাগ, গায়ে ঢিলে-হাতা

পাঞ্জাবী···ওকে যে এর আগে কোথাও দেখেছি একথা হলফ করে বলতে পারি আমি। হঠাৎ আতঙ্কে আমার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে এল। এ তো সেই কুখ্যাত ডাকাত মঙ্গল সিং যাকে ধরবার জন্যে পুলিশ চেষ্টা করছে এক বছর ধরে যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে দশ হাজার টাকা! হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে দিন কয়েক আগেই ওর ছবি দেখেছি একখানা খবরের কাগজে। ও নাকি নৃশংস খুনী—টাকার লোভে আজ পর্যন্ত কত লোককে ও খতম করেছে তার হিসেব নেই। হয়ত আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই লোকটা ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল আমার দিকে। জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর পূর্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল আমার মুখের ওপর। আমিও—হ্যাঁ, আমিও তাকালাম ওর মুখের পানে। ওর হিংস্র কুটিল দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হল আমার দৃষ্টি। ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে ওর চোখ দুটো জ্বলছিল রক্ত লোলুপ বন্য পশুর চোখের মতো। অক্টোপাশের মতো ভয় যেন আমায় জড়িয়ে ধরেছে চারপাশ থেকে। কিছুতেই মনে সাহস আনতে পারছিনা। ভাবলাম চেনটা টেনে গাড়ীটা থামিয়ে দেব নাকি। লোকজন এসে পড়লে বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ওচেষ্টা করতে গেলে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে। ট্রেন থামবার আগেই এজগৎ থেকে নির্ঘাৎ বিদায় নিতে হবে আমায়। চুপচাপ বসে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরের স্টেশনে গাড়ী যখন থামবে তখন রেল পুলিশকে খবর দিলেই চলবে। পুলিশ নিশ্চই ওর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। হয়ত ওর পিছু ধাওয়া করে পুলিশ বরাকর স্টেশনে এসেছিল, কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ও সরে পড়েছে। পুলিশের দারোগা হয়তো এতক্ষণে কাছাকাছি সব স্টেশনে খবর পাঠিয়েছে সামনের স্টেশনে গাড়ী ধরলেই পুলিশের লোক তল্লাসি শুরু করবে প্রত্যেকটি কামরায়—হ্যাঁ, হঠাৎ উত্তেজনার বশে কিছু না করাই ভাল। দেখাই যাকনা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।

কিন্তু মনের মধ্যে ভয় আবার উঁকি দিতে থাকে: অপেক্ষা করা ঠিক হবে কি? আমি বসে থাকব চুপচাপ আর ও হয়তো এগিয়ে আসবে একটু একটু করে-তারপর হঠাৎ একসময় অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর—আর আমার টুঁটিটা জোড়ে চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে দেবে। না! অপেক্ষা করার কোন মানেই হয় না। সময় থাকতে চেনটা টেনে দেওয়াই ভাল। ওটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। পরে হয়তো এ সুযোগ পাবো না।

এটা আমার কল্পনা, না সত্যিই ও কিছুটা এগিয়ে এসেছে আমার দিকে? এক শীতল হিমানী প্রবাহ যেন বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে! একটু দুরে সরে গেলাম আমি-বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে থাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওর ঘৃনাভরা হিংস্র দৃষ্টিটা মুহূর্তের জন্যও আমার ওপর থেকে নড়েনি। ঐ দৃষ্টির মাঝে যেন ওর ভয়াবহ অতিতের ইতিহাস লুকানো রয়েছে। ওর সাম্প্রতিক অপরাধের ঘটনাটা উঁকি দেয় মনের মধ্যে। মাস দুই আগেও যে ধনী গৃহস্থ ও তার স্ত্রীকে নির্মম ভাবে হত্যা করে, তাদের করুন অসহায় মুর্তি ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। একটা কুড়ুল দিয়ে ও আক্রমন করেছিল তাদের। খবরের কাগজে খুনের বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছিল। নিহত স্বামী-স্ত্রীর দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। মুখ এমনি বিকৃত যে চেনা যায় না; ঘরের মেঝে আর দেওয়াল রক্তে লাল! অমন ভয়াবহ দৃশ্য নাকি কেউ কল্পনা করতে পারেনা। দুটো খুন করেও ওর রক্তের তৃষ্ণা মেটেনি। গৃহস্থের চার বছরের একটি ছেলে ঘুমোচ্ছিল ওপর তলায়। তাকেও খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে কুড়ুলের ঘায়।

না, এবার আর সন্দেহের কোন কারন নেই। লোকটা সরে এসেছে অনেকটা কাছে। আশ্চর্য্য, লোকটা নড়াচড়া করছে অথচ কোন আওয়াজ পাচ্ছি নাতো। আরো কিছুদূরে পিছিয়ে গেলাম আমি। হে ভগবান, গাড়িটাকে আরো দ্রুত করে চালিয়ে দাও যাতে এখনই পৌঁছে যেতে পারি পরের স্টেশনে, আরো ভাল

হয়, যদি গাড়িটার গতি এখনি মন্থর করে দাও যাতে নির্ভয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারি।

যা অনুমান করেছি ঠিক তাই। এবার লোকটাকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লক্ষ্য করলাম। স্পষ্ট দেখলাম আমার ঠিক পাশের বেঞ্চিটাতে ও সরে এল। ওর চোখদুটো যেন আরো বড়, আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। চুম্বকের মত ওর চোখ যেন টানছে আমায়—আমাকে ধ্বংস করবার জন্য। আত্মরক্ষার জন্য যদি কিছু থাকত আমার কোন অস্ত্র, ছড়ি, যা হোক একটা কিছু গাড়িটাও যদি আরো দ্রুত গতিতে চলত! যদি—

এবার ও এসে পড়েছে আমার ঠিক সামনে মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে। ভয়ে আমার স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ উৎকণ্ঠা অসহ্য। কথা বলার শক্তি নেই। হয়তো আর এক মুহূর্ত পরেই আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মত।

লোকটা এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর রক্তপিপাসু চোখের ক্রুর দৃষ্টি যেন আমার চোখ ভেদ করে মস্তিষ্কে আঘাত হানছে। আমি কিছু ভাবতে পারছিনা। মস্তিষ্ক যেন অচল হয়ে গেছে। না, বাঁচার আর কোন উপায় নেই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর ওই লম্বা লম্বা বীভৎস আঙুলগুলো চেপে ধরবে আমার গলাটা। নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম আমি নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায়।

ওর কদাকার মুখখানা এখন আমার মুখের ঠিক সামনে মাত্র কয়েক ইঞ্চি তফাতে। ওর রক্তহীন লালাসিক্ত ঠোঁট দুটো ওঠা নামা করছে সাপের মত পাক খেয়ে খেয়ে। মুখে কিছু না বললেও ওর চোখ বলে দিচ্ছিল ওর মনের কথা।

ওর পেশী বহুল লম্বা হাত দুটো এগিয়ে আসছে আমার দিকে। এতক্ষন যে চিৎকারটা চেপে রেখেছিলাম সেটা হঠাৎ বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড বেগে। দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে ছুটে গেলাম দরজার দিকে। ওর হাতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরার চাইতে রেলের চাকায় গুঁড়িয়ে যাওয়া ভাল। চট করে দরজাটা খুলে লাফিয়ে পড়লাম বাইরে।

লাফিয়ে পড়ার পর বুঝতে পারলাম, কোথায় যেন হয়নি। গলদ রয়েছে। গাড়ি থেমে গেছে একটু আগে, আমরা অন্ধকারে গেছি পরের স্টেশনে কুমারধুবিতে। বয়কট

প্লাটফর্মের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে ধুতুম ঝেড়ে ছুটলাম স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে।

শুনছেন স্যার, পুলিশে খবর দিন চট করে, হন্তদন্ত হয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "এই ট্রেনে ডাকাত মঙ্গল সিং রয়েছে একই কামরায় ওর সঙ্গে আমি ছিলাম অনেকক্ষণ।

স্টেশন মাস্টার গম্ভীর মুখে আমার আপাদমস্তক, নিরিক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, পুলিশ মঙ্গল সিংকে ধাওয়া করেছিল বরাকরের কাছে, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে গিয়ে ও পড়ে যায় চাকার নীচে। আধ ঘন্টা আগে খবরটা এসেছে ফোনে"।

সুধাংশু কুমার গুপ্ত ॥ কলকাতায় পাঠ্যাবস্থাকালে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। বাংলার অধিকাংশ নামী ও দামী পত্রপত্রিকায় লিখে এসেছেন। রহস্য ও গোয়েন্দা গল্প রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ। অনুবাদেও সুদক্ষ। এঁর লেখা অনুবাদ গ্রন্থ "বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প" সুধী মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। শিশু সাহিত্যেও এঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৭ সালে মৌচাক প্রদত্ত সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার পান। পেশায় শিক্ষাব্রতী। কলকাতায় সিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের সাধনা করেছেন, বর্তমানে অবসর জীবনেও সাহিত্য অনুরাগ অক্ষুন্ন।

হয়, যদি গ
লাফিয়ে পড়
যা অ
দিকে
ঠিক



"দরজার আড়ালে"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি কোনদিন ভূত দেখিনি। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে কখনো একটা ভূতের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলি।

ছেলেবেলা থেকে কত ভূতের গল্প পড়েছি লোকের মুখে গল্পও শুনেছি অনেক রকম। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, এতো লোক ভূত দেখতে পায় অথচ আমার ভাগ্যে আজও একটা ভদ্র মতন ভূত জুটলো না।

শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশী ভূত থাকে। আমি গ্রামে গেছি অনেকবার কাটিয়েছিও বহুদিন, কিন্তু হায়, কোনদিন একটাও ভূত চোখে পড়েনি। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কখনো দুএকবার মনে পড়েছে বটে যে দূরে ঘোমটা মাথায় একটি পেত্নী দাঁড়িয়ে আছে, বুক একটু একটু কেঁপে উঠেছে ভয়ে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেছি, কিছুই না একটা কলাগাছ।

বন্ধুদের সঙ্গে একবার বেহালায় একটা বাগান বাড়ীতেও রাত কাটিয়ে এসেছিলাম। সেই বাগান বাড়ীটার বেশ সুনাম ছিল

ভূতের হিসেবে, অনেকেই দেখেছে, প্রায় কেউ নাকি বিফল হয়নি। কিন্তু আমরা সারারাত জেগে বসে রইলাম তাস খেললাম অন্ধকারে বাগানে ঘুরলাম, কিছুই হলো না। ভূতেরা আমাদের বয়কট করেছিল। একমাত্র সে বাড়ীর ছাদে দেখেছিলাম একটা ভুতুম প্যাঁচা। আমাদের অবস্থা যেন বাঘ শিকার করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বাজার থেকে খরগোশ কিনে ফিরে আসার মতন।

এই রকম অবস্থায় আমার পক্ষে ভূত সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এত চেষ্টা করেও যদি ভূতের দেখা না পাই, তা হলে ভূতদের আমিই বা কেন পাত্তা দিতে যাবো। অর্থাৎ আমি যেমন ভূতে বিশ্বাস করিনা, তেমনি ভূতেরাও আমাকে বিশ্বাস করে না। ভূতরাও আমাকে কখনো দেখেনি, সুতরাং আমাকেই বা তারা বিশ্বাস করবে কি করে।

এ সত্বেও অবশ্য ইংরেজি বাংলা ভূতের গল্প পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে। মাঝরাত্তিরে একা থাকলে কখনো কখনো যে একটু আধটু গা ছমছম করেনা তাওনা। কিন্তু লোকজনের সামনে আমি জোর গলায় ভূতের মুখপাত করি।

গত বছরেই আমি বীরভূমের একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমার বন্ধু তপেন সেখানে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজে চাকরি পেয়েছে। কয়েকদিন খুব খাওয়া দাওয়া আর আড্ডা হলো। তারপর এক সন্ধ্যাবেলা কথায় কথায় ভূতের গল্প শুরু হলো। তপেন বললো, এখানকার শ্মশানে কিন্তু রাত্তির বেলা কেউ যায়না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেন?

কি জানি সবাই ভয় পায়। এখানে রাত্তির বেলা কেউ মারা গেলেও সকালের আগে পোড়াতে নিয়ে যায় না। বহুদিন ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।

আমি তৎক্ষনাৎ লাফিয়ে উঠে বললুম, চল, শ্মশানটা ঘুরে আসা যাক।

তপেন বললে, ধ্যাৎ! এসব পাগলামি করার কোন মানে হয়না।

তপেনকে আমি সাহসী ছেলে বলেই জানতুম গ্রামে এসে ভীতু হয়ে গেছে। কিছুতেই শ্মশানে যেতে চায় না। তখন আমার মধ্যে একটা বাহাদুরি দেখাবার লোভ এসে গেছে। আমি যাবোই বলে গোঁ ধরলাম।

তপেন আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। বারবার বলতে লাগলো, কেন পাগলামি করছিস। তোর একটা কিছু বিপদ হয়ে গেলে তোর স্ত্রীর কাছে আমি কি করে মুখ দেখাবো বলতো ?

আমি বললাম, আমার স্ত্রী তোর মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল এমন তো মনে হয় না।

গ্রামের রাস্তা ধরে তপেন অনেকখানি আমার সঙ্গে এলো। দূরে যখন শ্মশানটা দেখা যাচ্ছে তখনও তপেন একবার হাত ধরে মিনতি করে বললো, সুনীল, প্লীজ যাস্‌নি আমার অনুরোধ রাখ।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক্ আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।

তপেন শেষ পর্যন্ত বললো, চল তাহলে আমিও যাই যা হবে দুজনেরই হবে।

আমি তপেনকে যেতে দিলাম না। একা একা সাহস দেখাবার লোভ ছাড়তে পারছিলাম না।

গ্রামের শ্মশান সাধারণতঃ, নদীর ধারে হয়। বীরভূমের অনেক শ্মশানে তান্ত্রিকরা সাধন করেন শুনেছি। এই শ্মশানটাও নদীর ধারে। তবে খুবই ছোট নদী। এখন শুকনো। একটা বিশাল বটগাছের নিচে ঝুপসি অন্ধকার।

শ্মশানটার একেবারে কাছাকাছি এসে মনে হলো, ইস্ একটা টর্চ আনলে হতো। জায়গাটা বড় বেশী অন্ধকার আর দারুন নির্জন। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু। বহু দূরের একটা কুকুরের অশ্রান্ত চিৎকার।

আমার চলার গতি কমে এলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে

দেখলাম তপেনকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটা ভাঙা কলসীর ওপর পা পড়তেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম।

পরক্ষনেই নিজেকে ধিক্কার দিলাম একি ; আমি ভয় পাচ্ছি কেন? কিসের ভয়? ভয় কাটাবার জন্য খালি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরালাম। তবু মনে জোর এলো না। মনে হতে লাগলো ভূত না থাক সাপ টাপতো থাকতে পারে। টর্চ আনা উচিত ছিল।

সিগারেটের সামান্য আলোয় কিছুই দেখা যায় না। একটা একটা করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে লাগলাম। কিছু পোড়া কাঠ কয়েকটা ভাঙা হাঁড়ি আর একটা মাদুর ছাড়া কিছুই নেই। এখানে লোকে রাত্রে আসতে ভয় পায় কেন? কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

ঠিক এই কথাটা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা খটখট আওয়াজ পেলাম। একটা মাটির হাঁড়ি যেন গড়াচ্ছে। চমকে ডানদিকে তাকাতেই দেখলাম দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর কি বিভৎস প্রাণী এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই। সেই মুহূর্তে আমি অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেলো। পা কাঁপতে লাগলো। না-জীবনে আর কোনদিন আমি হাঁটতে পারবো না, কথাও বলতে পারবো না।

তক্ষুনি দূর থেকে তপেন ডেকে উঠলো স্নীল, স্নীল। সেই ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে আমি দৌড়োলাম। দৌড়োতে গিয়েই এক আছাড়!

সেদিন যদি আমি আছাড় খেয়ে না পড়তাম, তাহলে সারা জীবন আমাকে ভীতুই থাকতে হতো।

আমি আছাড় খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা নেঁড়ি কুত্তা কেঁউ কেঁউ করে ডেকে পালালো। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতন আমার শরীর থেকে ভয় চলে গেল একেবারে। আর কিছুইনা একটা ক্ষুধার্ত কুকুর মাটির হাঁড়ি চাটছিল। বহুদিনের কুসংস্কার

অন্ধকার আর নির্জনতার জন্য সেটাকেই আমার মনে হয়েছিল অদ্ভুত কিছু ! ভালো করে তাকাতে পর্য্যন্ত পারিনি।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বিশেষত তপেনকে শোনাবার জন্যই আমার হাসি ক্রমশ আরো জোড়ালো হয়ে উঠতে লাগলো।

তপেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি, কি হয়েছে? আমি বললাম, কিছু না। এবারও ভূতেরা আমাকে ভয় পেয়েছে।

যাইহোক এইভাবে আমি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যে এই ধারনাটা তৈরি করে দিতে পেরেছিলাম যে আমি ভূত একেবারে বিশ্বাস করিনা। ভূতও আমার ধার ঘেঁসেনা কখনো।

কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই কলকাতা শহরেই আমার জীবনে এমন একটা অভিজ্ঞতা হলো যার ঠিক ব্যাখ্যা আমি আজও জানি না। ভূত আমি আজও দেখিনি। তবে আমার ঘরের দরজার আড়ালে কে এসেছিল কে জানে?

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলতে হয়—

বিয়ে করার পর আমি একটা সার সত্য জানলাম। মেয়েদের খুশী করতে গেলে একটা ভালো বাথরুমওয়ালা বাড়ীতে থাকা দরকার—বিয়ের পর মেয়েদের কাছে স্বামীর যৌবন, কিংবা পৌরুষ কিংবা টাকাপয়সা কিংবা খ্যাতি সবই তুচ্ছ হয়ে যায়, যদি— বাড়ীর বাথরুমটা ভালো না হয়। আমার স্ত্রী শান্তার স্নান করতে সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। স্নানের ঘরটা তার একটা বিলাসিতার জায়গা, সুতরাং আমি যে ফ্ল্যাট ভাড়া করি বাথরুমটা কিছুতেই তার মনের মত হয় না। ফলে আমাদের গৃহশান্তি নষ্ট হবার উপক্রম, এইজন্য আমাকে ঘন ঘন বাড়ী বদলাতে হয়।

কলকাতা শহরে পছন্দ মতন ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তাছাড়া প্রত্যেকবার নতুন ফ্ল্যাট নিতে গেলেই ভাড়া বেড়ে যায় কিন্তু এসব কথা শান্তাকে বোঝানো যাবে না। বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করার বদলে ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়ান অনেক উত্তম কাজ।

তিনচারবার বদলাবার পর দক্ষিণে লেকের ধারে আমরা একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। ছিমছাম, ছোটো খাটো এবং পরিস্কার ঠিক যেন আমাদের জন্যই তৈরী। ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে, দুটি বাথরুম, একটা একটু সাধারণ গোছের হলেও, শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুমটি এক কথায় অনবদ্য, রীতিমত বড় সাদা টালি বসানো, ধপধপে চকচকে। বাথরুমের জানলা দিয়ে দুরের মাঠ ও গাছপালা দেখা যায়।

শাস্তার দারুন পছন্দ হয়ে গেল। পরের বারবারেই আমরা বাড়ী বদল করে ফেললাম।

নতুন বাড়ীতে এসে একদিন আমি আমার বন্ধু-বান্ধবীদের নেমন্তন করলাম। আর একদিকে শান্তা ওর বন্ধুবান্ধবীদের নেমন্তন করলো। রীতিমতন হৈ-চৈ আনন্দে কাটল কয়েকটা দিন। শান্তার সব সময় মন ভালো থাকে। আমি একটু বেশী রাত করে বাড়ী ফিরলেও বকুনি দেয় না। বুঝতে পারি সবই যেন ওই বাথরুমের গুন। শান্তা এখন স্নানের সময়টা বাড়িয়ে একঘণ্টা করেছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ও দু তিনটি রবীন্দ্রসংগীত শেষ করে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটলো দিন আস্টেক বাদে। আমরা ঘুমোই অনেক রাত করে। প্রায় সারা শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে আমার ঘুম ভাঙ্গে না।

আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।

হঠাৎ শান্তা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, এই, শুনছো। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর আমার ঘুম ভাঙলো। ঘুম জড়িত গলায় আমি বললাম, কি ?

—কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ?

—এত রাত্রে আবার কে দরজায় ধাক্কা দেবে ? ওকিছু না, ঘুমোওনি এখনো ?—ঐ তো আওয়াজ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছো না ?

আমি কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বটে, খুব জোরে নয়। কেউ যেন খানিকটা দ্বিধা ও

সঙ্কোচের সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, যাতে প্রতিবেশিদের ঘুম না ভাঙ্গে।

আমি বললাম, হাওয়ায় ধাক্কা লাগছিল বোধ হয়। কিছু না, ঘুমোও।

শান্তা বললো, মোটেই হাওয়ার ধাক্কায় ও রকম শব্দ হয় না।

স্বামী হিসেবে একবার আমার উঠে দেখা উচিত! নইলে শান্তা আমাকে ভীতু ভাববে। কিন্তু শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে কার ইচ্ছে হয়।

তবু উঠতে হলো। আলো জ্বালালাম। দরজা খুলে দেখলাম বাইরে কেউ নেই। বাইরে আলো জ্বেলে সদর দরজাও খুলে দেখলাম, সিঁড়িতে উঁকি দিলাম। কোথাও কেউ নেই।

আমি একটু অসামাজিক ধরনের মানুষ। বহুদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরাঘুরি করি। আমার বন্ধুরাও কখনো কখনো মাঝ রাত্তিরে এসে আমার বাড়ীতে হাজির হয়। সেই রকম কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিলে অবাক হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু কারুকে কোথাও দেখতে না পেয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতেই হলো যে হাওয়ায় ধাক্কা লেগেছে কিংবা ইঁদুর-টিদুর খট্‌খট্ করছিল। ফ্ল্যাটের মধ্যে ইঁদুর থাকা ভালো কথা নয়। শান্তা ইঁদুর দেখলে খাটের ওপরে লাফিয়ে ওঠে। কাল সকালে এর একটা কিছু করতে হবে। আলো-টালো নিভিয়ে আবার ফিরে এলাম। শান্তাকে একটু মৃদু বকুনি দিয়ে বললাম—কোথাও কিছু নেই শুধু শুধু ঘুম থেকে জাগালে আমায়।

শান্তা লজ্জা পেয়ে আমাকে খুশী করার জন্য বলল-সিগারেট খাবে? সিগারেট দেশলাই এনে দেবো?

আমি বললাম না থাক ইচ্ছে করছে না।

আবার শুয়ে পড়লাম সবেমাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে এই সময় আবার দরজায় শব্দ। এবার একটু জোরে।

শান্তা এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল এই এই।

আমি গম্ভীরঃ ভাবে বললাম কাল সকালে ব্যাটাকে ঠাণ্ডা

করবো। শান্তা আরো ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো কে? কাকে। ইঁদুর—ধ্যাৎ ইঁদুর কখনো এত জোরে আওয়াজ করতে পারে!

ইঁদুররা কি যে পারে আর কি যে পারে না তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব। নিশ্চয়ই মস্তবড় ধেড়ে ইঁদুর।

শান্তা বললো শব্দটা বাথরুমের দরজা থেকে আসছে।

এই একটা গুরুতর ব্যাপার। শান্তার প্রিয় বাথরুমে যদি ইঁদুর থাকে তাহলে তো সাংঘাতিক কথা। আবার আমাকে ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে।

সুতরাং উঠতেই হলো। আগের বার আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গিয়েছিল এবার অল্প শব্দ শুনতে পেলাম।

ঢক্—ঢক্—আমি ইঁদুর তাড়াবার ভঙ্গিতে হুশ হুশ করলাম তবু আরেকবাব শব্দটা হলো বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি বন্ধ—আমি দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছি শান্তা আমায় চেপে ধরলো ভেতরে যদি কেউ থাকে!

সুতরাং কণ্ঠস্বর মোটা করে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে? ভেতরে কে?

আর কোনও সাড়া শব্দ নেই।

শান্তা বললো, আমার ভয় করছে। আমার ভীষণ ভয় করছে। ভয় পাওয়া মেয়েদের স্বভাব। অনেক সময় ভয় হলে মেয়েদের মানায়। কিন্তু স্ত্রীর সামনে যে স্বামী সাহস দেখায় না তার জীবন ব্যর্থ।

আমি বীর দর্পে শান্তার হাত ছাড়িয়ে দরজটা খুলে ফেললাম। কেউ ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে ধরলো না। একটু অপেক্ষা করে বাথরুমের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। না কেউ নেই, কোনো ইঁদুরও না।

ভালো করে সব জায়গাটা পরীক্ষা করার পর আমি শান্তাকে ভেতরে ডাকলাম। শান্তাও দেখলো। বাথরুমের কোথাও বড় সড় ইঁদুরের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও নেই।

শান্তা বললো, তা হলে কিসের শব্দ বলো তো?

—হাওয়া ছাড়া আর কে হবে ?

হাওয়ায় কখনো এ রকম শব্দ হয় ?

থাকগে কাল সকালে সেটা-চিন্তা করা যাবে। ভেতরে তো কেউ নেই দেখা গেল, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

আবার সব দরজা-টরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে। বেশ কিছুক্ষণ দুজনে আর কোন কথা না বললেও—দুজনেই আসলে কান খাড়া করেছিলাম আর কোন শব্দ শোনা যায় কিনা।

আর শব্দ হলো না। শান্তা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমিও ঘুমোলাম।

পরদিন সকালে উঠে শান্তা আর আমি দুজনে মিলে আবার বাথরুমটা তন্ন করে খোঁজ করলাম। সেখানে কোনরকম সন্দেহজনক চিহ্ন নেই। দিনের আলোয় অনেক কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। রাত্তির বেলা অনেক ছোটখাটো শব্দও খুব জোরে শোনায়, সুতরাং দরজা ধাক্কানোর ব্যাপারটা সেই রকমই একটা কিছু হবে—এই রকম ভেবেনিতে হলো।

ব্যাপারটা আমি তেমন গুরুত্ব না দিলেও সেদিন আমি বাড়ী ফিরে এলাম সন্ধ্যে হতে না হতেই। শান্তা খুব খুশী হলো। আমরা একসঙ্গে বেড়িয়ে একটা সিনেমা দেখে এলাম রাত্রির শো-তে সারাক্ষণ আমরা গত রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি। শুতে যাবার আগে শান্তা বললো, জানো ঠিকে ঝি বলছিল, এই ফ্ল্যাটটায় খুব ঘন ঘন ভাড়াটে বদলায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন ?

—তা জানিনা। আগের ভাড়াটেরা নাকি মাত্র পনেরো দিন থেকেই চলে গেছে।

—ভাগ্যিস গেছে, নইলে এমন চমৎকার ফ্ল্যাটটা আমরা পেতাম না।—ফ্ল্যাটটা তো ভালোই—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি। আজ যদি আবার শব্দ হয় কালকেই আমি ইঁদুর মারার ওষুধ কিনে আনবো—

শান্তাকে আমি হাসি ঠাট্টায় ভুলিয়ে রাখলাম—তারপর এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। আমি একটা বই খুলে জেগে রইলাম বারবার তাকাচ্ছি দরজার দিকে। যেন আমি কারো প্রতীক্ষা করছি। সে এসে দরজা ধাক্কা দিলেই আমাকে খুলে দিতে হবে।

রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত বই পড়লাম। আজ আর কোন রকম শব্দ নেই। তবু আমার ঘুম আসছে না। রাস্তা দিয়ে মাঝেমাঝে একটা দুটো গাড়ী যাচ্ছে। এ ছাড়া থম থম করছে রাত। বাথরুমের দরজাটার দিকে তাকালেই আমার মনে হচ্ছে ওপাশে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আমি আলো নেভাই নি বলে দরজায় ধাক্কা দিতে পারছে না।

কোন একটা কিছু সম্পর্কে বেশীক্ষণ ভাবলেই এইরকম সবচিন্তা আসে। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ে বাথরুমের দরজাটা খুললাম। ভেতরের আলো জ্বেলে ভালো করে দেখে নিলাম একবার। বাইরের দিকের জানালাটাও বন্ধ করে দিলাম হাওয়া আসবার কোন উপায় নেই। আজ আর কোন শব্দ হবে না।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি এমন সময় শান্তা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো কে? কে?

আমি শান্তা আমি।

তুমি ওখানে কি করছো?

আরে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম।

শান্তা উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিজ্ঞাসা করলো তুমি সত্যি বাথরুমে গিয়েছিলে? সত্যি করে বলতো আজও নিশ্চয় আওয়াজ হয়েছিলো?

না না—কোন আওয়াজ হয় নি।

সত্যি বলছো।

হ্যাঁ,—দেখো আর কোন দিন আওয়াজ হবেনা। কিন্তু আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট বাদেই আওয়াজটা শুরু হলো ঠক্, ঠক্—

শান্তা আমাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে, কাঁপতে কাঁপতে বললো, ওকি হলো তুমি বলো।

আমি বললাম চুপচাপ শুনতে দাও না।

—কি শুনবে ?

—দেখি আর কি হয়।

দরজাটা আর কয়েকবার ঢক্ ঢক্ করলো—কিন্তু আর কিছুই হলো না।

শান্তা চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আমি বললাম, একটা রাত জেগে থেকে দেখা যাক্ না কি হয়। শান্তা বললো, তুমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি ভয়ে মরে যাবো।

—না, ঘুমাবো না। আর একটা কাজ করা যাক্। বাথরুমের দরজাটা খুলে ফাঁক করে রাখা যাক না।

উঠে তাই করলাম। শোবার ঘরের পাশের বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখায় শান্তার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু অতিকষ্টে ওকে রাজি করলাম। আর কোন শব্দ হলো না।

রাতটা কেটে গেল। সকালে উঠে শান্তা বললো, এর একটা ব্যবস্থা না করলে তো চলে না। এই ভাবে কি প্রত্যেকটি রাত না ঘুমিয়ে কাটাবো নাকি ?

যত রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সব কটাই আমি শান্তাকে শোনালাম। যেমন, বাতাসের ধাক্কা-তো হতেই পারে। তাছাড়া হঠাৎ কোন গাড়ির ঝাঁকা নিতে কিংবা এ বাড়ির অন্য কোন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার সময় নিশ্চয়ই এই দরজাটা কেঁপে ওঠে।

শান্তা বিশ্বাস করলো না। দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে বোললো, দেখছো, কি রকম দরজা। এমনিতে কিছুতেই নড়তে পারে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, লক্ষ্য রেখো তো দিনের বেলা কোনো আওয়াজ হয় কি না।

সেদিন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে আমার বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়ির বাইরের জগতটার সঙ্গে একবার জড়িয়ে পড়লে তখন আর বাড়ির কথা মনে থাকে না।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু অবাকই বোধ করলাম। শান্তা অনেকক্ষণ একলা আছে। রাত এগারোটা বেজে গেছে।

দু"তিনবার কলিং বেল টিপলাম, দরজা খোলে না। শান্তা কি ঘুমিয়ে পড়লো?

বেল টিপতে টিপতেই আমি ডাকলাম, শান্তা! শান্তা!

একটু বাদে দরজা খুললো। শান্তার চোখে জল। এটা আমার কাছে একটা নতুন ব্যাপার। দেরি করে বাড়ি ফিরলে শান্তা মাঝে মাঝে বেশ বকাবকি করে। কিন্তু প্রথমেই তো কাঁদে না।

আমি কিছু বলবার আগেই শান্তা বললো, আমি বেঁচে থাকি কিংবা মরে যাই, তোমার তাতে কিছু যায় আসে না, না?

অনুতপ্ত গলায় বললাম, শান্তা, এসব কি বলছো? হঠাৎ দেরী হয়ে গেল, মানে বোম্বে থেকে আমার এক পুরনো বন্ধু এসেছে। অনেক দিন পরে দেখা—

—বাড়ি ফিরে, যদি দেখতে আমি মরে গেছি?

—ছি, এসব কি বলছো? কেন কি হয়েছে? তুমি ভয়টয় পেয়েছিলে নাকি?

—যাকে সারা দিন, সকাল সন্ধ্যা একলা থাকতে হয়, তার কি ভয় পেলে চলে?

— কি হয়েছে বলো না? আবার কি দরজাটা ·

— না কিছু হয় নি।

কাছে গিয়ে শান্তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম, লক্ষ্মীটি রাগ করোনা। আর একদিনও দেরি করবো না।

এরকম কতবার বলেছো? জানো, এই ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল?

—যা।

—আমাকে আজ দু'তিনজন বললো, মেয়েটি আমারই বয়েসি ছিল খুব সুন্দর দেখতে।

—থাক্ গে রাত্তির বেলা আর ঐ সব গল্প বলতে হবেনা।

শোনো আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি, খাবোনা। শুয়ে পড়া যাক আজ রাত্তিরটা ভালো করে ঘুমোতে হবে। শান্তা আর কোন কথা বললনা। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলো। জামাকাপড় বদলে আমি শুয়ে পরার জন্য তৈরী হলাম।

শান্তা বললো, আমি বাথরুমে যাবো। কিন্তু আমার ভয় করছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এর মধ্যেই ভয় পাচ্ছো, আলো জ্বালা রয়েছে। আমি জেগে আছি।

শান্তার গলার আওয়াজটা যেন বদলে গেল। অদ্ভুতভাবে বললো, আমি বাথরুমে গেলে তুমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে না তো।

আমি চমকে গিয়ে বললাম কি বলছো কি? দরজা বন্ধ করে দেব কেন?

সত্যি করে বলো দরজা বন্ধ করে দেবেনা? তুমি সেদিন আমাকে বাথরুমে আটকে রাখবেনা?

বলতে বলতে শান্তা হু হু করে কেঁদে ফেললে, কি রকম যেন পাগলের মতন হয়ে গেছে। আমি ওর দুহাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললাম, শান্তা শান্তা, কি হলো কি এসব? তুমি আমাকে বিশ্বাস করোনা?

শান্তা কোনক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিলে তারপর আস্তে আস্তে বললো সেই মেয়েটির স্বামী রাগ করে একদিন তাকে বাথরুমের মধ্যে আটকে রেখে ছিল। মেয়েটি কত ধাক্কা দিয়েছে, তবু খোলেনি, তখন লজ্জায় অপমানে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, যতসব গাঁজাখুড়ি গল্প। সেই মেয়েটিই বুঝি এসে রোজ ধাক্কা দেয়। তা দেয় তো দিক না, সে তো আমাদের আর কোনো ক্ষতি করেনা।

অনেকক্ষণ ধরে শান্তাকে বোঝালাম। তারপর একসময় ও শুয়ে পড়লো। আমি আলো নিভিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বাথরুমের দরজার পাশে। আলোতে প্রেতাত্মারা থাকে না, শুনেছি।

সেই দুঃখিনী মেয়েটি যদি দরজা ধাক্কাতে আসে আমি অন্ধকারেই দরজা খুলে তাকে দেখবো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিছুই হোল না কোন শব্দ নেই তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শোওয়া মাত্র দরজায় আওয়াজ হলো—ঢক-ঢক-ঢক-ঢক।

শান্তা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো ঐ যে আবার আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে ছুটে এসে দরজা খুললাম, দারুন আশাছিল মেয়েটিকে দেখতে পাবো। কেউ নেই। অন্ধকারেও কারুকে দেখা গেল না। শুধুই অন্ধকার।

না ভূত আমার ভাগ্যে নেই। আমার চোখের সামনে ওরা যেন কিছুতেই আসতে চায় না। তবে, সেই দরজার আড়ালে কি ছিল, কেন বাথরুমের দরজায় কুণ্ঠিত ধাক্কা পড়তো তা আমি কোনোদিন জানতে পারিনি।

আবার ফ্ল্যাট বদল করতে হয়েছে শান্তার জন্যে। এ ফ্ল্যাটের বাথরুম তেমন ভালো না। কিন্তু শান্তা আর কোনো অভিযোগ করে না।

॥ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** ॥ কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবে সুপরিচিত হলেও মূলতঃ শিল্পী। তাই জাত শিল্পীর কুশলতায় সাহিত্যের নানা ধারাকে সঞ্জীবিত করেছেন। সুনীলবাবু তাঁর অন্তরঙ্গ ভাষায় আজকের এই দশকের যুবক যুবতীদের মনের গহনে প্রবেশ করেছেন। একদা কবিতার সঞ্জীবনী, সুধা পান করে সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। তাই তার গল্পের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে, কবিতার অনুসঙ্গ। ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রমণ প্রেমিক। তিনি একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আছেন। একদা নীললোহিত ও সনাতন পাঠক নামের আবরনে বহু গল্প ও উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। দরজার আড়ালে গল্পটি, তাঁর অলৌকিক গল্পের বিশিষ্ট উদাহরণ। তাই এখানে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মশাই তাঁর নিজস্ব সাবলীল ও অন্তরঙ্গ ভাষায় মানব মানবীর মনে রহস্য অনুভূতির রেশমী সুতোয় আলতোভাবে টান দিয়ে যে সুন্দর ও উপভোগ্য শৈল্পিক বিন্যাস সৃষ্টি করেছেন তা অননুকরণীয়। ১৯৩৪ সালে ফরিদপুর জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

অয়স্কান্তের অন্তিম ইতিহাস



অনীশ দেব

[অয়স্কান্ত রুদ্রের কুয়াশাচ্ছন্ন অপমৃত্যুব সম্ভাব্য সমাধান কেউই করতে পারেন নি। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য মৃত্যুকে মস্তিষ্কের সবক্ষণের সঙ্গী করে দিনের পর দিন মানসিক কুরুক্ষেত্রের অংশীদার হয়েছে তার স্ত্রী অরুণা রুদ্র। অবশেষে কতকগুলো সাদা কাগজের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া গেল অয়স্কান্তের জীবনের অন্তিম দিনগুলোর কালো-সাদা সাক্ষ্য। যেমন বিক্ষিপ্তভাবে তার শুরু, তেমনি বিক্ষিপ্তভাবে তার শেষ। তবু কি ফুটে ওঠে না এক অবিশ্বাস্য অশুভ ইঙ্গিত? ঘটনা ও ফলাফলকে আঙ্কিক নিয়মে যোগ করে অরুণাব অন্তত তাই মনে হয়েছে।]

৫ই মে রাত দশটা

ক্লাব থেকে ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে গেল। অরুণা, মনে হয়, বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছে। কারণ সংক্ষিপ্তভাবে বহু প্রচলিত এবং বহু ব্যবহৃত শব্দগুলো (খাবার ঢাকা আছে।) বলে ও শোবার ঘরে চলে গেছে। ভেবেছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পর মানভঞ্জনে

আজকের রাতটা খরচ করব, কিন্তু শ্রীকান্তর কথাগুলো মনে পড়ায় তা আর হয়ে উঠল না। টেবিলে বসে খালি ওর কাছে শোনা কথাগুলো ভেবেছি। জানি, ক্লাবের আর সকলে ওর কথায় তেমন আমল দেয় নি, হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি তা পারছি কই? সত্যিই কি সামান্য এক টুকরো সুতোর মধ্যে অত শক্তি আছে? ঐ একটুকরো সুতোর চাপে কেউ কি কখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়? কে জানে। শ্রীকান্ত বলছিল, স্ত্রী হত্যার অপরাধে সেই ভদ্রলোকের কোন শাস্তি হয় নি। কারণ সামান্য একগাছা সুতো দিয়ে যে কাউকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা যায়, তা আদালত একেবারেই বিশ্বাস করে নি। ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর ভদ্রলোক পাগল হয়ে যান। তিনি তো সত্যিই তার স্ত্রীকে খুন করতে চান নি। নিছক একগাছা সুতো গলায় জড়িয়ে বউকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি থেকে যে কি হয়ে গেল!

না, এই সুতোর ঘটনাটা অরুণাকে বলা ঠিক হবে না। ও হয়তো ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, এই অবাস্তব ব্যাপারটা শুধু আমাকেই কেন এরকম ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে?

৬ই মে রাত দশটা

আজ সকালে অফিসে যাবার সময় একটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ধুতিটা আলমারি থেকে নিয়ে পরতে যাব, দেখি, একগাছা সরু কালো সুতো সাদা ধবধবে ধুতির ওপর এঁকে-বেঁকে পড়ে রয়েছে। জিনিসটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় আপদ দূর হবে। কিন্তু তা হয় নি। কারণ অফিস থেকে ফিরে এসে টেবিলের ওপর আবিষ্কার করলাম, ঐ কালো সুতোটাকে। আমার ফাউণ্টেন পেনটার পাশে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে। জানি না, কেন ওটাকে দেখে মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠেছিলাম। তাহলে কি আমার হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল বিশ বছর আগেকার স্মৃতির কথা? আমার ছোটবেলার কথা? নিশীথের কথা?

৮ই মে রাত বারোটা

বলব না বলব না করেও অরুণাকে আমার অস্বস্তির কথাটা জানিয়ে ফেলেছি। যথারীতি ও ব্যাপারটাকে আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তা তো দেবেই। ও তো আর জানে না বিশ বছর আগেকার ছোট্ট ঘটনাটা! জানে না নিশীথের আকস্মিক অপমৃত্যুর কথা! তাছাড়া শ্রীকান্তর বলা গল্পটাও তো ওকে আর বলি নি।

১০ই মে রাত একটা

রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম আসে নি। কারণ কালো সুতোটা এখনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি। আজ সকালে অফিস যাওয়ার পথে ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে এসে দেখি সেই আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সুতোটা আমার ড্রয়ারের ভেতর নিরীহ ভাবে পড়ে রয়েছে। তাহলে নিশীথ কি এতদিন বাদে তার প্রতি অবিচারের ন্যায় বিচার চাইতে এসেছে? আজও আমি ভুলি নি বিশ বছর আগের সরস্বতী নদীর কথা, তার ওপরের তালগাছের গুঁড়ি কেটে তৈরী সাঁকোটার কথা। আর ভুলি নি এক লাটাই কালো সুতোর কথা। ঐ সামান্য সুতো নিয়েই এক ধূসর সন্ধ্যায় নিশীথের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়, তারপর অনিবার্য-ভাবেই হাতাহাতির সুরু। ঐ ধস্তাধস্তির মধ্যেই নিশীথ কি ভাবে যে জলে পড়ে গেল, আমার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, ডান হাতের শক্ত মুঠোয় লাটাইটা আঁকড়ে ও ছিটকে পড়েছিল সাঁকোর ওপর থেকে। সাঁতার জানত না নিশীথ। তাই অসহায়ভাবেই হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে গেছে ঘোলা জলের নীচে। সন্ধ্যের ঝাপসা অন্ধকারে নিঃসঙ্গ আমি শ্রান্তপায়ে ফিরে এসেছি ঘরে। নিশীথের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ঘটনা একেবারেই চেপে গেছি। কিন্তু দিন তিনেক বাদে মাইল দুয়েক দূরে ভেসে উঠল নিশীথের মৃতদেহ সাত-গাঁয়ের লোক ছুটল ওকে দেখতে, আমিও গেলাম। নিশীথের সারা শরীর গ্যাস বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। চোখের জায়গায় দুটো বীভৎস কোটর। দেহের জায়গায় জায়গায় মাংস খোবলান কিন্তু ওর ডান হাতের শক্ত মুঠোয় লাটাইটা তখনও ধরা ছিল।

নিশীথের মৃতদেহের নৃশংস স্মৃতি আমাকে এক রাতের জন্যও মুক্তি দেয় নি। তখন আমার বয়স ছিল বছর বারো-চোদ্দ। আরও বছর পনেরো পর যখন অরুণাকে বিয়ে করলাম, তখন সে স্মৃতি বেশ ধূসর হয়ে এসেছে। তারপর এই পাঁচ বছরে নিশীথকে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীকান্তর বলা গল্পটা, আর এই সামান্য কালো সুতোটা আমাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে সেই ভুলে যাওয়া বিষণ্ণ ধূসর সন্ধ্যার কথা। নিশীথের লাটাইয়ের কথা।

তাহলে কি এই সুতোই সেই সুতো? যে সুতো আর সরস্বতী নদী সাক্ষী ছিল সেই বিয়োগান্ত নাটকের চরম পরিণতির?

১৩ই মে দুপুর দুটো

আমার টেবিলে একটা ছোট কাঠের মূর্তি আছে। হনিমুনের সময় কাশ্মীর থেকে অরুণাই ওটা পছন্দ করে কিনেছিল। মূর্তিটা জনৈক পুরুষের। কালো মিশমিশে তার সুগঠিত দেহের রং। দুটো হাত জয়ের ভঙ্গীতে মাথার ওপর তোলা।

প্রথমটা আমি ঠিক খেয়াল করি নি। রাত তখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। শনিবার বলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে অরুণাকে নিয়ে একটা বাংলা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সুতোটাকে তখনও ড্রয়ারেই দেখে গেছি। কিন্তু ফিরে এসে খাওয়ার পাট সেরে টেবিলে গিয়ে বসতেই লক্ষ্য করলাম ড্রয়ারটা হাট করে খোলা। অরুণাও সেটা লক্ষ্য করে বলে উঠল চোর-টোর এসেছিল কি না। কিন্তু আমি জানি আসে নি। অরুণাকে শুতে যেতে বলে আমি ড্রয়ারটা পুরোটা খুললাম। ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। সুতোগাছটা ড্রয়ারে আর নেই। ড্রয়ার বন্ধ করে টেবিলের ওপর রাখা কালো মূর্তিটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। টেবিল ল্যাম্পের আলো সরাসরি গিয়ে পড়েছে মূর্তিটার ওপর। তারই আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, মূর্তির যে হাত দুটো জয়ের ভঙ্গীতে ওপরে তোলা ছিল, তাদের ইঙ্গিত যেন পালটে গেছে। হাতের অবস্থানের কোন পরিবর্তন না ঘটলেও এখন মনে হচ্ছে, যেন নিদারুণ আতঙ্কে উর্ধবাহু হয়ে নিঃশব্দ চিৎকারে ঘর ভরিয়ে ফেলেছে। ঠিক তখনই আমার

চোখে পড়ল কালো সুতটা। মূর্তিটার গলায় সাপের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে সেই কালান্তক সুতো।

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে সুতোটা খুলে নিতে চেষ্টা করলাম।

আশ্চর্য, অনায়াসেই ওটা খুলে চলে এল আমার হাতে। আরও আশ্চর্য, একই সঙ্গে যেন ফিরে এল মূর্তিটার আগের জয়োল্লাস। আতঙ্কের জমাট পর্দাটা তার মুখমণ্ডল থেকে একেবারে নিঃশেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভয়ে আমাব সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। এ কিসের ইঙ্গিত? শ্রীকান্তর বলা গল্পটা আরও একবার মনে পড়ল।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঠিক করলাম, অরুণাকে সব জানান দরকার। তাই রাতে শোবাব সময় ওকে বললাম, তোমাব সঙ্গে কথা আছে। কি কথা? ঘুম জড়ানো স্বরে অরুণা জানতে চাইল। আবছা অন্ধকারে শূন্য দৃষ্টি মেলে ওকে শ্রীকান্তর বলা গল্পটা জানালাম। ও প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ল, বলল, সুনু, তুমি ঠাট্টাও করতে পার! নিজেকে কেমন যেন অসহায মনে হতে লাগল। তাহলে এই বিপদেব মুহূর্তে, আতঙ্কের মুহূর্তে আমার পাশে কেউ নেই? অরুণার হাসিব কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিবে শুয়ে পড়লাম। সুতোটাকে কালো মূর্তিটাব গলা থেকে খুলে কোথায় যে রেখেছি, আর মনে করতে পারছি না।

একটা সামান্য সুতো আমার জীবনকে যেন অদৃশ্য ফাঁসে বেঁধে ফেলতে চাইছে।

১৪ই মে সন্ধ্যা সাতটা

ক্লাবে আজ আর যাই নি। একটু আগেই চেহারা খারাপ হযে গেছে বলে ঠিকমত খাওয়া-দাওয়াব জন্য শাসন করছিল অরুণা! তারপর পাশেই যেন কোন প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গেছে সান্ধ্য-পরনিন্দাচক্রে যোগ দিতে। ওকে নিশীথ বা কালো সুতোটা সম্পর্কে আর কোন কথাই বলি নি। এও বলি নি যে, অফিস থেকে ফিরে একটু আগেই আমি কালো সুতোটাকে আবার খুঁজে পেয়েছি। খুঁজে পেয়েছি ভারি অদ্ভুত জায়গায, ভারি অদ্ভুত ভাবে।

অরুণার ড্রেসিং টেবিলে আমাদের বিয়ের (গলায় মালা দেওয়া

অবস্থায়) একটা বড় ফ্রেমে বাঁধান ফটো আছে। অফিস থেকে ফিরে চিরুনী নিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি কালো সুতোটা অরুণা ও আমার ফটোর মাঝখানে পাঁচিল হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অলসভাবে ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে সুতোটাকে খুলে নিতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার কেমন যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এমনকি ফটোতে আমার মুখের হাসি-খুশি ভাবটা পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে অনিশ্চয়তায় ভরা এক হতবুদ্ধি যুবকের আতঙ্কিত মুখ। সুতোটা খুলে নিতেই মুখের খুশি খুশি ভাবটা আবার ফিরে এল। হঠাৎ কি হয়ে গেল, ক্রোধে উন্মাদের মতো সুতোটাকে দুহাতের মুঠোয় ধরে আমি সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলাম। পাঁচ মিনিট পর যখন সম্বিত ফিরে পেলাম, দেখি সুতোটা পাঁচ টুকরো হয়ে আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। মনে হল, সুতোর টুকরোগুলো যেন কেঁচোর মতো ঈষৎ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। হাজারো চিন্তায় আমার যুদ্ধ ক্লান্ত মস্তিষ্ক যেন অবশ হয়ে পড়েছে! বাইরের ঠাণ্ডা হওয়ায় নদীর জলের বাষ্প অনুভব করলাম। শুনলাম, কিছু একটা জলে আছড়ে পড়ার ঝপাং শব্দ। আমি কি ধীরে ধীরে কারও সুপ্ত, অপূর্ণ ইচ্ছার শিকার হতে চলেছি?

১৪ই মে রাত একটা

শোবার পর আজ কিছুতেই ঘুম এল না। সুতোটার অশরীরী উপস্থিতি আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। নিশীথের ফুলে ওঠা জলে ভেজা মুখটা এই মুহূর্তে যেন আরও বেশি করে মনে পড়ছে। ওর হাতের লাটাইয়ের কালো সুতো তো এতো সহজে শেষ হবার কথা নয়! সরস্বতী নদীর ঘোলাটে জলে সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আমার প্রতিবিম্ব নিশীথের জল-তল স্পর্শের আলোড়নে একই ছন্দে কাঁপছে। নিঃসঙ্গ আমি ধান ক্ষেতের আল ধরে আনমনাভাবে হেঁটে চলেছি। সন্ধ্যের অন্ধকার চেপে বসেছে মাথার ওপর। চোখের সামনে ভাসছে নিশীথের কালো সুতোয় ভরা লাটাইটা। আমি যেন…

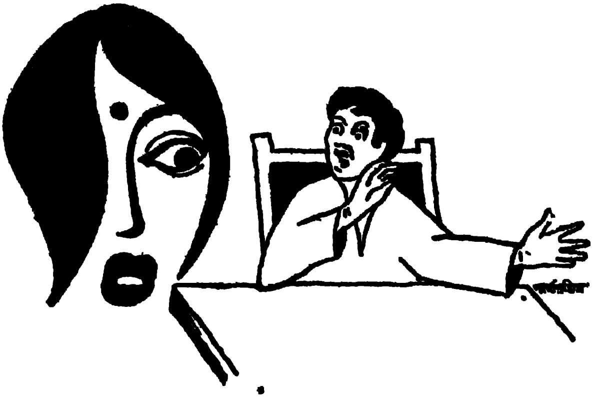
কিসের একটা যেন শব্দ হল। হালকা অথচ স্পষ্ট শব্দ। ঘরের

অন্ধকারের ভেতরে যেন ফুটে উঠল নিশীথের ক্ষত-বিক্ষত চোখের মণিহীন মুখটা। শব্দটা কি ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে? কে যেন আমাকে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াতে বলছে, কানের কাছে জলের নেশা ধরানো কল্লোল, আমার হাত যেন শিথিল হয়ে আসছে, গলায় কিসের যেন অস্পষ্ট উপস্থিতি, বেশ শীত শীত করছে আমার, কই অরুণাতো ঘুম ভেঙে উঠে এল না, একটা সাপিনী শীতল পরিবেশ আমাকে পরতে পরতে ভীষণ ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। নিশীথ, আমি তো তোকে খুন করি নি, নিশীথ, নিশীথ···

[আচমকা এক চিৎকারে নাকি সে রাতে অরুণার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই ও বুঝতে পারে সে চিৎকার স্নুর, তার স্বামী অয়স্কান্তের। পাশের ঘরে এসেই অরুণা আবিষ্কার করল ঘর অন্ধকার। কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে ও যখন আলোর সুইচ জ্বালল, তখন দেখল ভারি অদ্ভুত এক দৃশ্য।

অয়স্কান্ত রুদ্রের বিশাল দেহটা ঘরের সিলিং থেকে শূন্যে ঝুলছে। দেহটা দুলছে, ঠিক পেণ্ডুলামের ধাতব দোলকের মত। তখনই একটা ছোট্ট জিনিস নজরে পড়েছিল অরুণার। ঝুলন্ত দেহ ও সিলিংয়ের মাঝে যোগাযোগকারী অবলম্বন শুধু একটা সরুকালো সুতো!]

॥ অনীশ দেব ॥ জন্ম ২২শে অক্টোবর, ১৯৫১। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার হলেও রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর অনুরাগী এবং এ জাতীয় সাহিত্যের চর্চা করছেন প্রায় বারো বছর। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "নরকে আমিই রাজা" ও সম্প্রতি প্রকাশিত "রক্তে অমানুষ"। রহস্য কাহিনীর পর তাঁর দ্বিতীয় ভালোবাসা বিজ্ঞানসুবাসিত গল্পের প্রতি যা সময় সুযোগ মতো অনেক লিখেছেন এবং নিয়মিত বেতারে পাঠ করে থাকেন। মৌলিক রচনা ছাড়া বিভিন্ন রোমাঞ্চকর গল্প অনুবাদেও লেখকের সুনাম সুবিদিত।



ছোবল

অদ্রীশ বর্ধন

যে টেবিলে বসে এই কাহিনী লিখছি, তার বাঁদিক ঘেঁসে আমার শোবার খাট। খাটের মাথার দিকটা হাত দিয়ে ছুঁতে পারি, এত কাছে। চকচকে পালিশ করা কাঠ। কিন্তু হাত বাড়ালে যেখানে স্পর্শ করে, সেই জায়গটা পালিশ উঠে বিবর্ণ হয়ে গেছে—পালিশ প্রায় নেই বললেই চলে।

পালিশ-ওঠা বিরঙ জায়গাটার দিকে তাকালেই মনটা আমার হু-হু করে ওঠে। আমার জীবনের একটা বিবর্ণ ছবি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। বাইশ বছর কেটেছে সেই ঘটনার পর। খাটটা পালিশ করিয়েছি বার কয়েক ঐ জায়গাটুকু বাদে। ইঞ্চি কয়েক জায়গায় পালিশের চেকনাই লাগিয়ে রঙ ওঠা স্মৃতির পাতায় তো পালিশ লাগাতে পারব না। তার চাইতে বরং যা আছে, তাই থাকুক। বছর বছর ঐ রঙ-ওঠা পালিশটুকুর পানে তাকিয়ে যেন সাত মাসের সেই দুঃসহ দিনগুলিকে মনে করতে পারি। চোখের সামনে যেন টেনে আনতে পারি ক্লান্ত-চক্ষু শ্রান্ত-মুখ একটা রক্ত মাংসের প্রতিমাকে—কালান্তক কর্কটরোগ তিলতিল করে

নিঃশেষিত করে আনছিল যার জীবনীশক্তি। সকালে কলতলা থেকে বেরিয়ে ভিজে কাপড় এনে রাখত খাটের ঐখানটিতে। হাতে শক্তি ছিল না। সাড়ি নিংড়োতেও পারত না। কত বকেছি—শুনেও শুনত না। ক্লান্ত পাদুটো টেনে টেনে ঝুপ করে ভিজে বোঝা নামিয়ে রাখত চকচকে খাটের কোনে। যে খাটে ফুলশয্যার বয়স তখনও পুরো দু'বছর হয়নি।

জল ধরে গদি পচে গিয়েছিল, পালিশ উঠে গিয়েছিল। তারপর দুনিয়ার সমস্ত পালিশ আমার চোখের সামনে থেকে মুছে দিয়ে একদিন সেও চলে গিয়েছিল। আমার স্থূলচক্ষু তাই তাকে আর কোনোদিন দেখেনি। কিন্তু মন উপলব্ধি করেছে। কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। মনে মনে ছবি এঁকেছি ফিকে নীল রঙের ছটায় আবৃত একটি অপরূপ সুন্দরীর। যার অঙ্গে খুঁত ছিল কেবল একটিই। দাঁতে। নীচের পাটির সামনের তিনটি দাঁতে মাঝের ফাঁক দুটি একটু বেশী রকমের। হাসলে দৃষ্টিকটু লাগত। তাই মুখ টিপে হাসত সে। ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গালের টোল দুটো। দু'বছরের বিবাহিত জীবনে দাঁতের এই বিসদৃশ ফাঁক একবারও দেখিনি—দেখেছি তার মৃত্যুর পর। নীচের চোয়ালটি ঝুলে পড়ে মুখটি হাঁ হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম এবং সেই শেষ দেখেছিলাম তিনটি দাঁতের ফাঁকে কাঠি গলে যাওয়ার মত দুটি ফাঁক।

তারপর কেটেছে দীর্ঘ বাইশটি বছর। ঘটনাময় এই জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে একটি উজ্জ্বল ঘটনা হয়ে থেকেছে আমার প্রাণ-প্রতিমার মৃত্যু। বেদনা ভুলতে মদ ধরেছিলাম—কাজ হল না। রক্ষিতা রেখেছিলাম—ব্যর্থ হলাম। সারাদিন তার হাসপাতালে কাটতো। সন্ধ্যা কাটতো আমার সঙ্গে। নামও তার সন্ধ্যা। দৈহিক তাড়নায় যাইনি তার কাছে। শূন্য মনকে ভরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খালি মনকে ভরাট করতে সে পারেনি।

একদিন সব ছেড়ে দিলাম। বাইশটি বছর কিভাবে কাটিয়েছি, তা ঈশ্বর জানেন আর আমি জানি। মাঝের সহস্র ঘটনা বলবার জন্যে এই কাহিনী নয়। সব কাহিনীর শেষের কাহিনীও নয়। শুরুর কাহিনীও নয়। এ এক আশ্চর্য কাহিনী।

আমি ভগবান টগবান মানতাম না ভগবানের তা নিয়ে মাথা-ব্যাথাও ছিল না। কেননা বড় বড় মিঞাকেও শেষ পর্যন্ত আস্তিক হতে হয়েছে। আমি তাদের কাছে কিছুই নই। বাইশ বছরে তাই এমন সব মানুষের সঙ্গ পেলাম যাঁরা ভগবানকে না দেখলেও ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। ত্রিতাপে তাপিত মন শান্তি যদি চাও, সৎসঙ্গে সাধুপ্রসঙ্গে জীবন কাটাও। আমিও আস্তে আস্তে এঁদের মত হতে চেষ্টা করলাম। আর কিছু না পাই, মনে শান্তি পেলাম।

এই সময়ে আলাপ হল কয়েকজন প্রেতচক্রীর সঙ্গে। কথাটা খারাপ শোনায়। বিদেহী হলেই যে প্রেত হবে, এমন কোনো কথা নেই। অদৃশ্য সহায়দের সবাই প্রেত নন। তাঁরা উচ্চস্তরের আত্মা। মানুষের সেবা করছেন অলক্ষ্যে।

আমি তাই প্রেত-চক্র নামকরণটা পছন্দ করি না। ইংরেজীতে যাকে সিয়াঁস বলে, বাংলায় তাকেই বলা হয় প্রেত-আহ্বানের চক্র। পরলোক থেকে সূক্ষ্ম দেহধারীরা আসেন মিডিয়ামের মাধ্যমে। এ যেন রেডিওর নব ঘুরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। মাঝখানে ইথার। রহস্যময় এই ইথারের মধ্যে থেকেই ভেসে আসে কায়াহীনদের ইথিরীয় দেহ। বেশ কয়েক বছর আগে বিলেতের ডেলী এক্সপ্রেস কাগজে খবর বেরিয়েছিল। ডাক্তার কিলনার নামে এক বৈজ্ঞানিক নাকি সূক্ষ্ম শরীরকে সাধারণের নয়নগোচর করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সূক্ষ্ম শরীর থেকে যে রশ্মি বেরোয়, তার স্পন্দন মন্দীভূত করে সূক্ষ্ম শরীরকে তিনি প্রত্যক্ষও করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম "The Human Atmosphere or The Aura made visible by the Chemical Sereen।" তিনি একটি যন্ত্র তৈরী করেছিলেন—তার মধ্যে থাকত বিশেষ ধরনের আরক—সূক্ষ্ম শরীর বহির্ভূত রশ্মিস্পন্দন যার মধ্যে এসে মন্দীভূত হয়ে স্থূল দৃষ্টিতে ধরা দিত।

এই কাহিনীটি আমার জানা ছিল বলেই প্রেতচক্রী বন্ধুদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম খুব সহজেই। নতুন ব্যাপারের স্বাদ পাওয়ার আশায় যেন কয়েকদিন পরলোক-টরলোক নিয়ে আড্ডা মারলাম তাদের সঙ্গে। তারপর এল মহালয়া।

মহালয়ার পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ তর্পণ করার ব্যাপারটা হিন্দু মাত্রেই জানেন। 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপাতু' এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দানকে সংক্ষিপ্ত তর্পণ বলে। প্রেতপক্ষে অর্থাৎ ভাদ্রী কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে মহালয়া অমাবস্যা পর্যন্ত তিল তর্পণ আর শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক—শাস্ত্রের বিধান।

আমার প্রেতচক্রী বন্ধুরা কিন্তু ঐদিনটিকেই প্রেতচক্রের শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করেন। সেদিন পরলোকে সাড়া পড়ে যায়। স্বেচ্ছায় বিদেহী আত্মারা নেমে আসেন উদক গ্রহণ করতে। প্রকৃত প্রেতচক্রীরা তাই এই দিনটিতে মহা সমারোহে আয়োজন করেন বছরের সেরা সিয়াঁসের।

বন্ধুরা বললেন—"তিনকড়িবাবু, আপনিও আসুন। সঙ্গে স্ত্রীর একটা ছবি আনবেন।"

শুনেই মনটা আমার কিরকম হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললাম—"কখন ?"

"সন্ধ্যা ছ'টায়।"

প্রেতচক্রে সেই প্রথম আমি হাজির হলাম। লম্বা টেবিলের এক প্রান্তে অভয়াদেবী স্থির হয়ে বসে শূন্য চোখে চেয়েছিলেন আমাদের সবার দিকে। ঘরটা বেশ বড়। জানলাগুলো বন্ধ। ঘুলঘুলি দিয়ে হাওয়া আসছে—তাই খুব একটা গরম হচ্ছে না। আমরা সবশুদ্ধ বারোজন বসেছি টেবিল ঘিরে। সবাই বয়স্ক—মিডিয়াম ছাড়া। বারোজনের মধ্যে ছ'জন মহিলা।

মিডিয়াম অভয়াদেবীর বয়স কুঁড়িও ছাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ। ফর্সা, রোগাটে গড়ন। নাক, থুৎনি বেশ তীক্ষ্ণ। চোখের দৃষ্টি সূক্ষ্ম। বয়স কম বলেই গাম্ভীর্য নেই। কথায় কথায় মুখ টিপে হাসে। কলেজের মেয়ে। আমরাই এক প্রেতচক্রী বন্ধুর কন্যা। খুব ভালো মিডিয়াম বলে মেয়েকে তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বয়স্ক ছাড়া কাউকে চক্রে আসতে দেন না।

হাসিখুশী মেয়েটাই কিন্তু টেবিলে বসে অন্যরকম হয়ে গেল। উদাস শূন্য চোখে চেয়ে রইল সবার পানে। সত্যিই যেন একটা

ঝোঁপরা আধার—বিদেহীদের আবির্ভাবের ক্ষেত—নিজের সত্তা যেন কিছুই নেই।

নিয়মমাফিক আবাহনের পর কমিয়ে দেওয়া হল ঘরের লাল আলো। রক্ত অন্ধকারে ভাসতে লাগল ধূপের সুগন্ধিত ধোঁয়া। ঘর নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ খটখট আওয়াজ শুনলাম। মিডিয়ামের মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। কিন্তু হাতে ধরা পেন্সিলটা কাঁপছে টেবিলে পাতা কাগজের ওপর। সমস্ত ডানহাতটাই কাঁপছে থরথর করে।

মৃদুকণ্ঠে বললেন অভয়ার বাবা পুলকেশবাবু—আপনার স্ত্রীর ছবিটা সামনে রাখুন।

আমি রাখলাম।

কিছুক্ষণ হাতের কাঁপন অব্যাহত রইল। খট-খট-খট-খট শব্দে পেন্সিলের সরু শিসটা আঘাত করে চলেছে কাগজে—কিন্তু কিছু লিখছে না।

আমি বসেছিলাম অভয়ার বাঁ দিকে—ডানদিকে ওর বাবা। দু'জনেই চোখ বড় বড় করে লাল অন্ধকারের মধ্যে চেয়েছিলাম প্রেতাত্মার লেখা দেখবার আশায়—কিন্তু খুব সূক্ষ্ম মাকড়শার জালের মত হিজিবিজি আঁচড় ছাড়া কিছুই লেখা হচ্ছিল না। অভয়ার ডান হাতটাই কেবল কেঁপে চলেছে। মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে বুকের ওপর। কানের রিং-দুলে লাল আলো চিকচিক করছে, সাদা মুখ লাল নীল কুয়াশায় ঘেরা পাথরের মুখের মত দেখাচ্ছে।

মুখ তুলে দেখলাম, পুলকেশবাবুও বিমূঢ় চোখে পর্যায়ক্রমে দেখছেন মেয়ের মুখ আর হাত। মুখ স্থির। কিন্তু হাত কেঁপে চলেছে বিরাম বিহীনভাবে।

খুব মৃদুকণ্ঠে পুলকেশবাবু বললেন—"আপনি কে এসেছেন, লিখে জানান।"

হাত কেঁপেই চলল। অশরীরী যেন ভীষণ উত্তেজিত।

আপনি কি "স্বর্ণময়ী"? স্বর্ণময়ী আমার বাইশ বছর আগে মৃতা স্ত্রীর নাম। হাতটা সহসা স্থির হয়ে গেল। আমি উদগ্রীব হয়ে

চাইলাম। এবার লেখা হবে। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তার জন্যে আমরা তৈরী ছিলাম না কেউই।

আচম্বিতে পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক ঝটকায় ঘাড় সিধে করে বসল অভয়া।

"অভয়া!" বিস্মিত কণ্ঠে পুলকেশবাবু বললেন—"কি হল?"

অভয়ার দু'চোখের পাতা পুরো খুলে গেল। সটান চাইল আমার পানে। লাল অন্ধকারের মাঝেও শিউরে উঠলাম সেই চাহনি দেখে। চোখের মধ্যে অভয়ার সূক্ষ্ম চাহনি নেই—এ যেন আর কেউ তাকিয়ে আছে। রুক্ষ শক্ত চাহনি।

"অভয়া!" পুলকেশবাবু যেন ককিয়ে উঠলেন।

অভয়া ফিরেও তাকালো না। বাঁ হাত দিয়ে খপ করে আমার ডান হাত চেপে ধরে বললেন—"এবার যাবে কোথায়?"

আমি এমন হকচকিয়ে গেলাম যে চেঁচিয়ে উঠতেও পারলাম না। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলাম অভয়ার অমানুষিক চোখজোড়ার পানে। ভাষা দিয়ে সে চাহনিকে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে কেবল উপলব্ধি করলাম অন্য লোক থেকে যে তাকিয়ে আছে অভয়াব রক্ত-মাংসের চোখের মধ্যে দিয়ে—সে আমাকে চেনে। অলৌকিক শক্তি দিয়ে সে এমন ভাবে হাত খামচে ধরেছে আমার যে আঙুল নাড়ানোর ক্ষমতাও আর নেই। আমি যেন সম্মোহিত হয়ে গেছি। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছি অভয়ার কালো চোখের নিতল চাহনির পানে।—চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম ফ্যাকাশে মুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন পুলকেশবাবু। দু'হাতে মেয়ের দু'কাঁধ ধরে বললেন —"অভয়া! অভয়া!"

ফিরে তাকালো না অভয়া। ডান হাত তুলে পুলকেশবাবুর চিবুক ধরে ঠেলে দিল পেছনে। সে কি মারাত্মক ঠেলা। চেয়ার উলটে দেওয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়লেন পুলকেশবাবু।

তখনও আমার দিকেই চেয়ে অভয়া। চোখের মধ্যে সেই অপার্থিব চাহনি। দাঁতে দাঁত পিষে বলল তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে— "চিনতে কষ্ট হচ্ছে? সন্ধ্যা হলেই যে সন্ধ্যাকে ছাড়া চলত না, মাস

ঘুরতেই যে সন্ধ্যাকে ফেলে পালিয়ে গেলে—চিনতে তাকে কষ্টহচ্ছে?”

সন্ধ্যা! “চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা শ্যামল মুখ। পরনে নার্সের সাদা শাড়ি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যার মধ্যে সঙ্গিনীর অন্বেষণে বৃথা একটি মাস নষ্ট করেছিলাম, এ সেই সন্ধ্যা?

“তুমি?”

“হ্যাঁ আমি—তোমার সন্ধ্যা। নার্স কি প্রেমে পড়তে পারে না? কিন্তু নার্সের প্রেমে পড়া যায় না, তাই না?”

“প্রেমের ভান করতেও পারিনি, সন্ধ্যা। যা চেয়েছিলাম, তা পাইনি,—তাই—”

“কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম, এবার তা পেয়েছি,”—বলেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আসুরিক বলে আমাকে বুকের ওপর টেনে নিল অভয়া এবং দু'হাতে চেপে ধরে কানাডিয়ান ইঞ্জিনের কান ফাটানো তীব্র হুইশলের মত চেঁচিয়ে উঠল আকুল-কণ্ঠে—পেয়েছি!···পেয়েছি!····পেয়েছি!···”

ছোট ঘরটার মধ্যে তখন চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেছে। চেয়ার ছেড়ে সবেগে উঠে দাঁড়িয়েছেন প্রত্যেকেই। ভয় পেয়েছেন সকলেই। পরলোক চর্চা করতে এসে একি বিপত্তি!

শুধু একজন···একজনই স্থির রইলেন এই হট্টগোলের মধ্যে। টলতে টলতে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন পুলকেশবাবু। দেওয়ালে ঝোলানো পরমহংসের ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন অবরুদ্ধ কণ্ঠে—“ঠাকুর···একি করলে·· একি করলে!”····

পুলকেশবাবুর ভাঙা গলার চাপা হাহাকার ছাপিয়ে তখনও চেঁচিয়ে চলেছে অভয়া—“পেয়েছি!···পেয়েছি!····পেয়েছি!”····

অমানুষিক আলিঙ্গনে এবং অজস্র মুখচুম্বনে আমার তখন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও নেই।

সহসা বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠে আমার গলা ছেড়ে দিল অভয়া। কাড়িকাঠের দিকে বিস্ফারিত চাহনি মেলে ধরে পেছিয়ে গেল কয়েক পা। তারপরেই দেওয়াল ধাক্কা খেয়ে সটান আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। আর নড়ল না।

ঘর নিস্তব্ধ। পুলকেশবাবু নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন মেয়ের দিকে। কিন্তু গা ছোঁয়ার আগেই নড়ে উঠল অভয়া। খুব সহজভাবে উঠে বসল এবং হাত তুলে নিরস্ত করল পুলকেশবাবুকে।

পুলকেশবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। চোখে ফুটে উঠতে দেখলাম নিঃসীম আতংক।

কারণটা বুঝলাম পরক্ষণেই।

আমার পানে চাইল অভয়া। চোখে আগেকার সেই চাহনি আর নেই—কিন্তু অভয়ার সূক্ষ্ম চাহনিও ফিরে আসেনি।

অভয়াকে আশ্রয় করেছে আর এক প্রেতাত্মা।

ঠোঁট নড়ে উঠল অভয়ার। মেঝেতে বসে থেকেই বললে মৃদু কণ্ঠে—"তিনু ···তিনকড়ি ·· "

ডাকবার ধরনটা খুব চেনা চেনা লাগল।

অভয়া ফের বললে—আমি তোর মা··· আমি না থাকলে মেয়েটার কি ক্ষতি হত বলত? সন্ধ্যা বড় পাজী আত্মা ··অতৃপ্ত·· ওর মুক্তি নেই।"

"মা!"··· আমার বুকখানা যেন খান খান হয়ে গেল ঐ এক ডাকে।

"তিনু··· বৌমাকে আর ডাকিস নি। সে এখানে নেই। বড় ভালবাসত তোকে—তাই তোর কাছেই আবার ফিরে গেছে।"

"আমার কাছে?"

"হ্যাঁ, বাবা, তোর কাছে ·· তোর সামনেই।"

"আমার সামনে?"

এখনও চিনতে পারলি না? আর এক জন্ম তো···তাই চিনতে পারছিস না ·· কিন্তু চিনিয়ে দিলে বিয়ে করবি? ·· আবার ঘর সংসার করবি "

"মা।"

অভয়া তখন হেসে উঠল। ওকে এসে পর্যন্ত মুখ টিপেই হাসতে দেখেছি"—দাঁত কখনো দেখিনি।

এবার দেখলাম। নিচের পাটির তিনটে দাঁতের মাঝে কাঠি গলে যাওয়ার মত ছুটো ফাঁক।

অদ্রীশ বর্ধন॥ বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য ও রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনায় লেখকের পারদর্শীতা অনস্বীকার্য। লেখকের হিরামনের হাহাকার, মোমের হাত, কংক্রীট বুট ইত্যাদি গ্রন্থসমধিক খ্যাত। গত তিনের দশকের বিশ্বব্যাপী ঘনায়মান, ঝঞ্ঝা, ক্ষোভ আর মান্দাক্রান্ত হতাশার দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করেও বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প ছাড়াও যে বিষয়ে লেখকের অপার কৌতুহল ও অপরিসীম আগ্রহ তা হচ্ছে কল্পনা মিশ্রিত, প্রযুক্তি পৃক্ত রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনীর আলেখ্য রচনা। এই সংকলনে (ছোবল) গল্পটি লেখকের একটি বিশিষ্ট ভৌতিক গল্পের উদাহরণ। লেখক সারপেনটাইন লেনে ১৯৩২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।



হরিতকী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আজ এই পূর্ণিমা রাতে টিউশনি সেরে ফেরার পথে গিরিজা টের পেলেন, তাকে কানাওয়ালায় ধরেছে।

বাঘা যতীন পার্কের পাশ দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে দিব্যি আসছিলেন। শরৎকালের ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, শীত শীত লাগছিল, কোন বাড়ীর বাগান থেকে শিউলি ফুলের গন্ধও ভেসে আসে, সেই সঙ্গে একটা ডাল ফোড়নের গন্ধওলা জায়গাও পার হয়ে এলেন। ক্ষিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। আবুর মা ওবেলা একটা ফুল মার্ক পাওয়া মোচা ঘন্ট রেঁধে রেখেছে, এবেলাও সেটা দেবে, সেই সঙ্গে ঘানির তেল আর কাঁচা লঙ্কা দিলে ডাল সেদ্ধ—ভেবে একটু তাড়াহুড়ো করে হাঁটছেন। বাঘা যতীন পার্ক পেরিয়ে দুনম্বর ভাবগ্রামের রাস্তা পেরিয়ে আদিগন্ত জ্যোৎস্নায় এক নম্বর ভাবগ্রামে· রাস্তায় নেমে পড়তেই টের পেলেন, রাস্তা চিনতে পারছেন না জ্যোৎস্না রাতে মফঃস্বলের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো থাকে না। ত না থাকুক, ফটফটে রাস্তা ঘাট সবই দেখা যাচ্ছে। আমগাছ জামগাছ সবই চেনা যাচ্ছে। কিন্তু কানাওলা ধরলে আর কিছু উপায় থাকে

না। দশবার নিজের বাড়ীর সদর দিয়ে হেঁটে গেলেও বাড়ী চেনা যায় না।

ছোট বেলা থেকে এই কানাওলা ভূতটা প্রায়ই ধরে এসে গিরিজাকে। একা জুত মতো পেলেই সাপটে ধরে, খুব নাকাল করে ছেড়ে দেয়। তার ওপর গিরিজার বয়স এই তিয়াত্তর পেরোলো, এ বয়সে অনেক কিছুই ভোতা মেরে যায়। মাথার মধ্যে সব সময়ে একটা ধন্ধ ভাব।

ভাবগ্রামের এক মাথায় সরকারী গুদাম। পিপে যদি আড়াআড়ি করে আধখানা মাটিতে পোঁতা যায়, তবে যেমন দেখতে হয় গুদামের চেহারা অবিকল সেরকম। লম্বা লম্বা ঘর, টিনের ছাওনি গোল হয়ে নেমে এসেছে। সারি সারি চল্লিশ পঞ্চাশটা গুদাম ঘরের ভিতরে রাস্তাটা ধাঁধা মেরে গেল। কাছে পিঠে লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। রাত্রি বাজে দশটা। চারিদিক ঝিম মেরে গেছে। গিরিজা এদিক সেদিক ঘুরলেন। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, রাস্তা পাচ্ছেন না। গত পনের বছর এই সব রাস্তায় যাতায়াত। তবু পাচ্ছেন না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন, কানাওলা এক কানাভূত, যাকে ধরে তাকে চেনা রাস্তায় ঘুরপাক খাওয়ায় আর আবডালে বসে হি হি করে হাসে, ভূতদের যা স্বভাব। যৌবনকালে গিরিজা যখন বিজ্ঞান পড়তেন তখন বয়ধর্মে আর ভূত ভগবান মানতেন না। এই বুড়ো বয়সে আবার সেই শিশুবেলার ভয়ভীতি ফিরে এসেছে। এখন ভূতও আছে, আর ভগবানও আছে। গিরিজাপতি তাই কানাওয়ালাকে তাড়ানোর জন্য ডাকেন রাম রাম। জয় সচ্চিদানন্দ রঘুপতি রামচন্দ্র রাম হে হরি হে—

কোথায় কি, রাস্তাঘাট সব গুলিয়ে গেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না প্রায় রোদ্দুরের মতো উজ্জ্বল। রাস্তায় নুড়ি পাথরটায় পর্যন্ত ছায়া পড়েছে। গুদামঘরগুলোয় টিনের ছাউনিতে খট খটাং করে শব্দ হয় মাঝে মাঝে, সে ভূতের ঢিল নয়। তিনি জানেন সারাদিনে তেতে থাকা টিন রাতের ঠাণ্ডায় একটু একটু করে সংকুচিত হয়ে আসে, তাই

ঐ শব্দ, জেনেও কিন্তু মন মানে না। চমকে উঠে ভাবেন ভূতের ঢিল নয়তো বাবা। অ্যাঁ।

যে বাড়ীতে টিউশনী করেন সে বাড়ির কর্তা ভবেশ রায় নিজেকে বুড়ো মানুষ ভাবেন। বয়স কিছু না মোটে বাষট্টি। বিরাট অবস্থা। গোটা দুই চা বাগানের মেজর শেয়ার, গোটা ছয়েক লরী, বিধান মার্কেটে ফ্যান্সী দোকান। সুখী মানুষ, প্রায়ই এসে মেয়ের পড়ার ঘরে বসে বসে গিরিজার সঙ্গে আড্ডা দেন। কিন্তু গিরিজার সঙ্গে মতের মিল হয় না। ভবেশ বলেন—বুড়ো বয়সে খাওয়া কমানো উচিত। তাই ভবেশ রায় নিজেও কম খান। একটা মধুপর্কের বাটির মাপের একবাটি ভাত একবেলা, সকাল বিকেলে এক চিমটি করে ছানা, রাতে গোনা দুখানা রুটি। এই খেয়েই নাকি খুব শক্ত আছেন ভবেশ। গিরিজার সেটা ভাবতেই কষ্ট হয়। এত কম খেয়ে বাঁচে নাকি লোকে? তাঁর নিজের তো অনন্ত ক্ষিদে। একগোছা রুটি আর জলের গেলাস দিয়ে বসিযে দিলে এই বয়সে নিদন্ত মুখে টাউ টাউ করে শুধু মাড়িতে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন পলকের মধ্যে।

তবে কি গরীবেরই ক্ষিদে পায় বেশী? আজ রাতে ভাত হবে, 'শালবাড়ির দিকে বিঘে চারেক জমি আছে, বর্গায় চাষ করে। সেখান থেকে পরশুদিনই আধমণ চাল দিয়ে গেছে ভালমানুষ বর্গাদার। কদিন রাতের খাওয়াটা বেশ হচ্ছে। ফোটা ভাতের গন্ধ পাচ্ছেন যেন গিরিজা। কিন্তু কোথায় ভাত?' কেবল অকাজের জ্যোৎস্না চারিদিকে।

আবুর কাজ বলতে দুটো, কালী সাধনা আর বক্‌বক্।

কালী—সাধনা অবশ্য তার নিজের খেয়াল খুশি মতোই করে। ঘরের এক জায়গায় দেওয়াল নোনায় খেয়েছে। সেই দাগধরা জায়গাটার দিকে চেয়ে সারাদিন একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে সে রাম প্রসাদী থেকে যাবতীয় শ্যামা সংগীত সম্পূর্ণ বেসুরে গায়। সাধনার শেষ দিকটায় কালী নামটা আর পুরো উচ্চারণও করতে পারে না, কেবল বলে—কাঃ-কা-কা-সে স্নান করে না, স্নানের বদলে সে রোজ

সকাল বিকেল আধ কলসী করে জল খায়। সেটা হল অন্তস্নান দেহের সব ময়লা ঐ জলের ঠেলায় ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তখন গামছা দিয়ে গা মুছলেই স্নান হয়ে গেল। মাথার চুল জটা হয়ে পিছন দিকে মৌচাকের মতো ঝুলে থাকে। ওদিকে কপালের ওপর দিক যেন টাক পড়ে যাচ্ছে। উকুনের চুলকুনিতেও নখের ডগায় চুল উঠে আসে। তা টাকই পড়ুক, আর জটাই ঝুলুক। আবুকে সুন্দর দেখবার কেউ নেই। বৌ তার সঙ্গে থাকে না। বিয়ের পর বারো বছর কষ্টে সৃষ্টে ছিল তারপর বাপের বাড়ী চলে গেছে। কোথায় একটা চাকরি করে। মাস পয়লা আবার আবুর কাছ থেকেও কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। আবু পেশকারী করে। সাধু সন্ত মানুষ বলে তার রোজগার বেশী নয়।

ইদানিং তাকে হরিতুকীতে পেয়েছে। কেরোসিনওলা রামু বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাইকেলওলা গাড়িতে কেরোসিন বেচে। রামু বলে তার বয়স নাকি নব্বই। ইয়া স্বাস্থ্য, যুবকদের চেয়েও বেশী শক্তি। আবুর আবার সকলের সঙ্গেই ভাব। সারাদিন বক বক করতে হলে লোক বাছাবাছি চলে না। প্রতিদিনই সে কিছুনা কিছু অপরিচিত লোককে আপন করে ফেলে। রামুর সঙ্গে তার ভাব অবশ্য দীর্ঘকালের।

দিন সাতেক রামু তাকে কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস খেতে দিয়েছিল, কচি কচি হরিতকী, বালিতে ভাজা। ভারি তারি খেতে। ভাজা হরিতকী খেয়ে আবু মোহিত হয়ে গেল। রামু বলে—হার খেয়েই এই নব্বই বরিষ উমরে আমার এত তাকৎ।

কোন জ্ঞানই ফ্যালনা নয়। সেই থেকে আবু হরিতকীর—পিছনে লাগছে। গত সাতদিন মানুষ হরিতকীর জীবন যৌবন দায়িনী ক্ষমতার কথা শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেল। তবু আবুর ক্লান্তি নেই। বিধান মার্কেট আর পুরোনো বাজার ঘুরে সে ইতিমধ্যে প্রায় তিন কিলো হরিতকী এনে ফেলেছে। জামার দুপকেট ভর্ত্তি হরিতকী নিয়ে ঘোরে, যাকে তাকে ধরে ধরে খাওয়ায়। নিজে সব সময়ে মুখে হরিতকী নিয়ে ঘুরছে।

সন্ধ্যেবেলায় সে মাণিকরামের ডাক্তারখানায় উঠে বসে পড়ল। ডাক্তারখানায় রুগিটুগি আসে না। মাণিকরামের ঢের পৈতৃক পয়সা আছে, আর আছে ব্রীজ খেলার নেশা। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ তাকে ডাকেনা, বলে ওতো তাস খেলতে খেলতে ডাক্তারি ভুলে গেছে। তবু ডাক্তারখানার আছে নাম কোবাস্তে সন্ধ্যের পর সেখানে ব্রীজের আড্ডা বসে, কিছু উটকো লোক সময় কাটাতে আসে, গল্পগাছা হয়। আবু ডাক্তারখানায় ঢুকতেই কিছু লোক খবরের কাগজের পাতা ভাগ করে ডুব দিল; একজন অন্য ধারে উঠে গেল। চোর দায়ে ধরা পড়ল বেকার কম্পাউণ্ডার সাধন। সে টোকা দিয়ে দিয়ে মশা মেরে টেবিলের ওপর জড়ো করছিল। রোজ সেঞ্চুরী করে। আজও তিরাশিটা হয়েছে এ পর্য্যন্ত। আর সতেরটা বাকী। টেবিলের ওপর মরা মশার একটা ছোট স্তুপ তৈরী হয়েছে! চুরাশিনম্বর মশাটা পন্ পন্ করে কানের কাছ থেকে উড়ে এসে থুতনীতে ধাক্কা খেয়ে বসি বসি করছে। সাধন খুব সাবধানে অনড় হয়ে লক্ষ্য রাখছিল। এমন সময়ে আবু উঠে এসে ঝপকরে বসেই বলতে শুরু করল—হরতুকির যা কাণ্ড দেখলাম সাতদিনে, বলার নয়।

মশাটা বসল না। উড়ে অন্য ধারে চলে গেল। বিরক্ত হয়ে সাধন বলে—বেশী খেওনা আবুদা।

আবু অবাক হয়ে বলে বেশী খাব না। বেশী খাবো না?

—না পরে বিপদে পড়বে।

আবু রেগে গিয়ে বলে—হরতুকির তুই জানিসটা কি শুনি। মুনি ঋষিরা একটা করে পাকা হত্তুকি খেয়ে কতকাল বাঁচত জানিস?

মুনি ঋষির কথা বাদ দাও। তারা না হয় একটা করে খেত। তুমি কিন্তু দশ বারোটা করে চালাচ্ছো। শেষে বিপদে পড়ে যাবে।

যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলবি না। বিরক্ত হয়ে আবু বলে।

দাসীর কথা বাসী হলে কাজে লাগবে। সাধন চুরাশি নম্বর

মশাটিকে গোড়ালির হাড়ের ওপর খতম করে টেবিলের ওপর রাখুন। আর ঘোলটা।

হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে ওঠে আবু মূর্খে বলে কি ?

আবু বলে বুঝলে বাবা, হরিতকী হল অমৃত। এ রেগুলার খেলে একশ দুশো বছর বেঁচে থাকাটা কোন কথাই নয়। বাঁচতে বাঁচতে ঘেন্না ধরে যাবে। তখন মরার জন্য আনচান করে উঠবে কিন্তু মরা কি সহজ ?

ডাক্তারখানা থেকে নেমে রাস্তায় সে মুদী খগেনকে পেয়ে গেল। খগেন তার বাড়ী যাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে সঙ্গে পেয়ে ভারী আহ্লাদ আবুর। হরিতকীর যাবতীয় গুনের কথা কি বলে শেষ করা যায়। এত সস্তা, হাতের কাছের জিনিষ, লোকে তবু গ্রাহ্য করে না। মুর্খ সাধনচন্দ্র কি যে সব বললে হ্যা। এক হপ্তা খেয়ে আবুর নিজের পুরোনো অম্বলের অসুখ নেই। অম্বলের চাকা পেটময় বেড়াত, গলে তরল হয়ে গেছে। বাহান্ন বছর বয়সে এখন হঠাৎ শক্তির জোয়ার এসেছে গতরে।

হঠাৎ আবু খগেনকে বলল দাঁড়াও।

খগেন দাঁড়ায়। রাস্তার পাশে প্রচুর বড় বড় চাঁই পাথর পড়ে আছে, মেরামতের কাজে লাগবে। তারই একটা মাঝারি চাঁই তুলে নিয়ে আবু রাস্তার পাশে মাঠটায় যতদুর সম্ভব ছুঁড়ে দিল,— বলল দেখলে ? গত সাত দিনে কতটা ক্ষমতা বেড়েছে ?

তার দেরী হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের ভিতর দিয়ে সটকাট করতে নেমে গেল খগেন। একা একা, কালীর গান করতে করতে আবু সরকারী গুদামের জঞ্জালে ঢুকে পড়ে।

এই বয়সে খিদেটা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো। হুড় মুড় করে উঠে পড়ে, কাঁপুনী তুলে দেয়। এ বয়সে সব বেগই বড় তড়ি ঘড়ি আসে। সামলানো যায় না। মলমূত্র ত্যাগে একটু, দেরী করেছো কি সব কাপড়ে চোপড়ে হয়ে যাবে। খিদেও তাই। উঠল বাই তো কটক যাই।

গিরিজার চক্ষে জল আসে। পেটটা ডেকে ডেকে কত কথা বলছে ভিখিরির মতো। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কোল কুঁজো হয়ে কোনক্রমে সেটাকে সামালও দেওয়া যাচ্ছে না। রাস্তা ঘাট সব জ্যোৎস্নায় ডুবিয়ে মায়াবী রঙ করে রেখেছে। তিনটে রাস্তায় তিনবার যাওয়ার চেষ্টা করে গিরিজা একই জায়গায় ঘুরে এলেন। কানাও-য়ালা ধরলে এরকমই হওয়ার কথা। চেনা রাস্তায় দশবার ঘুরলেও দিক ভ্রম হবে, নিজের বাসার সদর দিয়ে গেলেও চেনা যাবে না। বয়স তিয়াত্তর, এই বয়সেই ভূতেরা এসে ধরে।

জয় রাম, জয় রাম, জয়—রঘুপতি। গিরিজা বিড়বিড় করতে থাকেনা। টাঙাৎ করে শব্দ হয়। টিনের চালে কে একটা মস্ত ঢিল মারল। এ টিনের শব্দ বলে ভুল হওয়ার নয়। বাস্তবিক ঢিল। টিনের চাল থেকে ছিটকে সামনের রাস্তায় পড়ে ব্যাংবাজির খাপড়ার মাতা লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঘাস জঙ্গলে পড়ল। স্পষ্ট দেখা। চোখে এখনো বেশ দেখেন গিরিজা। ঢিটা পড়তেই তারস্বরে রাম নাম করতে করতে একটা গুদাম ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়েন। বেহায়া ভূত। বুড়ো মানুষকে নিয়ে একি কাণ্ড বাবা! সব জায়গাতেই বুড়ো বুড়ো দেখাল সকলের রসের ভাঁড়ে তুফান জাগে। রাস্তাঘাটে চ্যাংড়ারা কতো পিছুতে লাগে, বাজারের দোকানীরা 'দাদু দাদু' বলে রঙ্গ করে, তো ভূতও বাকী থাকে কেন?

এখন হিম পড়ে বলে ছাতাটা নিয়েই বেরোন। রাতের বেলা টিউশানী সেরে ছাতা মাথায় ফিরে আসেন। তো লোকে পিছুতে লাগে, বৃষ্টি বাদলা বা রোদ নইলে ছাতার মর্ম ওরা বুঝবে কি! বুড়ো হোক; আগে সব ব্যাটা বুড়ো হোক, তখন বুঝবে। ছাতাটা ফেলে এসেছেন রাত্রিরে বাড়িতে।

আর একটা ঢিল গুদাম করে পড়ল কাছে পিঠেই, কোন গুদামের চালে। ঢিল নয়, এখন আধলা কিংবা আম ইঁট ছুঁড়ছে। একটা ছুটো চৌকিদার এখানে ঘোরাফেরা করে রোজ। তাদের ও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্না রাতে বোধ হয় আহ্লাদ হয়েছে খুব

ব্যাটানের, ছিলিমে দম দিয়ে, নয়তো সিদ্ধি চড়িয়ে পড়ে আছে। সরকারী গোয়ালে আর কে ধোঁয়া দেবে। আছেন শুধু রামচন্দ্র। হুদিস্থিতেন। কিছু তবু বুকটা বড় কাঁপছে। ক্ষিদেটা পেটের মধ্যে খেঁকী কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ধমকাচ্ছে তাঁকে।

ছাতাটা হাতে থাকলে একটু সাহস পেতেন। 'ভূত প্রেত যাই হোক। ছাতা লাঠি কিছু হাতে থাকলে যেন একটু জোরবল পাওয়া যায়। ওরা অবশ্য ছাতা কাল ফেরৎ দেবে। তবু—

তাঁর ছেলে আবুটা মানুষ নয়। বৌ বিপদ দেখে ছেলে পুলে নিয়ে পিট্টান দিয়েছে। সারাদিন মাথামুণ্ডু করে বেড়ায়। যৌবন-বয়সে মিলিটারীতে গিয়েছিল মনিপুর ফ্রন্টে। সেখান' থেকে ফিরে ওকে কালীতে পেল। ঘুমের মধ্যে বুবি ট্রাপ, বুবি ট্রাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠত। তারপর নানা ঘাটের জল খেয়ে এখন পেশকার। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন, পেশকারী সোনার চাকরি। পেশকারের মা বেনারসী পরে পায়খানায় যায়, তেল দিয়ে আঁচায়। কোথায় কি? আবু মাস মাইনের অৰ্দ্ধেক তার খাণ্ডার বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে আসে। সেই বৌ মাইনের তারিখে কোর্টের দরজায় মোতায়েন থাকে। উপরিও পায় না কিংবা নেয় না। অপদার্থ, ভ্যাগাবণ্ড।

ভাববেন, তার জোকি। ভুতটার আজ রস উথলে পড়ছে। দমাদম ঢিল মারছে ইদিক সিদিক। ছাতাটা থাকলে কতকটা রক্ষে হত। কেমন কোন্টা মাথায় এসে পড়ে। রাম রাম! যৌবন বয়সে ভূ'তকে মানেননি বলে আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটোকান ধরে বললেন ঘাট হয়েছে বাবা। আর অমন করব না। তোমাদের গড় করি। ভাল করে নিজে কসম করলেন; কাঁদলেনও একটু। বললেন— রাস্তাটা চিনিয়ে দাও বাবাসকল, জ্যোৎস্না একটু ঘুরিয়ে ফেল, চোখ ধাঁধিয়ে যায় বাবা। ক্ষিদের টানে শরীর হজম হয়ে যাচ্ছে।

ঐ বুঝি চৌকিদারের হুঁস হ'ল এতক্ষণে।

—কোন হ্যায় রে? তারপর লাঠি ঠুকবার আওয়াজ। কে যেন

চেঁচিয়ে বলল—উত্তর ভাগ রহা। এ রামরিখ ভাই, পাকড়ো—

খুব চেল্লাচেল্লি আর দৌড়াদৌড়ি লেগে গেল। আশপাশেই। হচ্ছে। গুদামঘরগুলোর জন্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। ভারী ভারী জুতোর শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। ধুপধাপ মাটি চমকাচ্ছে।

একটু নিশ্চিন্ত হন গিরিজা। লোকজন দেখলে ভূত তফাৎ যায়। কিন্তু রাস্তা বেভুল করা কানাওয়ালা সে এখনো ছাড়েনি। কোন্ দিকটায় যাবেন ঠিক ঠাহর পাচ্ছেন না। তবু গুটি গুটি রওনা দিলেন। দেখা যাক্।

বাপ রে! কালো মতন কি একটা ধেয়ে এল! জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা করাল চেহারা। আকাশের দিকে হাততোলা, চুল উড়ছে, আর হা-হা-অট্ট হাসি।

কেঁদে কঁকিয়ে উঠে বসে পড়েন গিরিজা—অস্ফুট গলায় বলতে থাকেন—রাম রাম, রাম রাম—

ভূতটা থমকে দাঁড়ায়।

বলে—কে রে, রামনাম করিস?

গিরিজা সভয়ে বলেন—বুড়ো মানুষ বাবা, মাপ করে দাও। কালীর নাম কর—কালীর নাম কর। কালীর নামে জগৎ উদ্ধার।

...আরে বাবা নাকি?

গিরিজা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান। ছাতাটা ফেলে এসেছেন বলে খুব দুঃখ হচ্ছে। হাতে থাকলে দামড়াটাকে ঘা কতক দিতেন।

ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বলেন—তুই কোথায়—অ্যা?

আবু ঝপ্ করে বাপের হাতটা চেপে ধরে বলে—দৌড়াও চৌকিদাররা টের পেয়ে গেছে।

—কি টের পেয়েছে?

—পরে বলছি। দৌড়োতে না পারো জোর কদমে হাঁটো। নাহক এসে হামলা করবে।

—কিছু করেছিস নাকি?